মাযহাব

পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও ইতিহাস

সংকলন

মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন

সম্পাদনা

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

দামাত বারাকাতুহুম

কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা,
সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের কর্মধারা,
সালাফের যুগ থেকে সর্বযুগের বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত কর্ম ও বাণী
এবং আরবের শায়েখদের আমল ও বক্তব্যের আলোকে

মাযহাব

পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও ইতিহাস

মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন
উসতায, উলূমুল হাদীস বিভাগ, মারকাযুল কুরআন ওয়াস্ সুন্নাহ,
রামপুরা, ঢাকা

সম্পাদনা
খতীবে আযম, মুনাযিরে যামান, তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দামাত বারাকাতুহুম
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদীস : জামিআ নূরে মদীনা শায়েস্তাগঞ্জ

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

মাযহাব

মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন

সম্পাদনা : আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দামাত বারাকাতুহুম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরী, এপ্রিল ২০২৪ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স, ৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-98982-7-6

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, www.wafilife.com, khidmashop.com
✆16297 or 01519521971 ✆ 01799925050 ✆ 01939773354
www.kitabghor.com/merchant/maktabatul-ashraf ✆ 01630-355211

আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ভিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

মূল্য : ছয়শত চল্লিশ টাকা মাত্র

MAZHAB

By: Maulana Muhammad Imran Hossain

Edited By: Allama Nurul Islam Olipuri ﷺ

Price: Tk. 640.00 US$ 9.00

জামিআ নূরে মদীনা শায়েস্তাগঞ্জ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদীস

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ- إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ অর্থাৎ হুকুম মানতে হবে একমাত্র আল্লাহর। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলেনঃ- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর। বলাবাহুল্য যে, হুকুম মানা আর আনুগত্য করা একই কথা। কাজেই প্রথমোক্ত আয়াতাংশ আর শেষোক্ত আয়াতাংশের মর্ম একই। অর্থাৎ সমস্ত মুমিন-মুসলমান একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানার মাধ্যমে তার আনুগত্য করবে।

কিন্তু শেষোক্ত আয়াতাংশের পরপরই আল্লাহ্ বলেনঃ- وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ অর্থাৎ এবং তোমরা আনুগত্য কর রাসূলের। তাই এবার প্রশ্ন দাড়ায় আল্লাহর পরে যদি আবার রাসূলেরও আনুগত্য করতে হয়, তাহলে আনুগত্যটা এককভাবে আল্লাহর জন্য রইল কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব বুঝা-না বুঝার উপর নির্ভর করে আরেকটি প্রশ্নের জবাব বুঝা-না বুঝা। আর তা হল কুরআন-হাদীস মানার পর যদি আবার মাযহাব মানতে হয়, তাহলে শুধু কুরআন-হাদীস মানা রইল কোথায়? প্রথম প্রশ্নের যেই জবাব, দ্বিতীয় প্রশ্নের সেই জবাব।

জবাবের সারমর্ম হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কোন হুকুম করেন না। বরং আল্লাহর হুকুমেরই ব্যাখ্যা করেন মাত্র। তাই রাসূলের হুকুম মানা আল্লাহর হুকুম মানারই নামান্তর। এজন্যই অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

ঠিক তেমনিভাবে মাযহাবের ইমামগণ কুরআন-হাদীসের বিপরীতে কোন হুকুম করেন না। বরং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হুকুম পালনের ব্যবস্থা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেন মাত্র। তাই মাযহাব মানাও কুরআন-হাদীস

মানারই নামান্তর। কিন্তু এই বাস্তবতাটা লা-মাযহাবীরা স্বীকারতো করেই না, বরং মাযহাব মানাকে কুরআন-হাদীসের বিপরীতে কিছু মানার নামান্তর বলে অপপ্রচার চালায়। অথচ দ্বিতীয়োক্ত আয়াতাংশের পরপরই আল্লাহ বলেন, وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ আর তোমরা "উলুল আমর" এর আনুগত্য কর। এখানে "উলুল আমর"-এর এক ব্যাখ্যা হল ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার। আরেক ব্যাখ্যা হল ফেকাহবিদ তথা মুজতাহিদ ইমামগণ।

আমাদের কথা হল "উলুল আমর"-এর অর্থ বা ব্যাখ্যা যাই হোক, এখানে এ কথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি আরও একদল মানুষের আনুগত্যের আদেশ করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। সুতরাং যেসব লা-মাযহাবীরা বলে যে, কুরআন-হাদীসের পরে কোনো মাযহাবের ইমামের আনুগত্য বা তাকলীদ করা শিরক, তাদের প্রতি জিজ্ঞাসা যে, তাহলে কি আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে একদল মানুষের আনুগত্য করার আদেশ করতঃ এমন শিরক করার নির্দেশ দিলেন? এখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, লা-মাযহাবীরা কতো জঘণ্যতম ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী।

এদের এহেন ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করে হবিগঞ্জের মাধবপুর থানাধীন জামিয়া ইসলামিয়া হরষপুর-এর* সুযোগ্য মুহাদ্দিস মাওলানা ইমরান সাহেব "মাযহাব" নামে যে পুস্তকটি রচনা করেছেন, তা আমার দৃষ্টিতে বিষয়ের উপর লিখিত অনেক পুস্তকাদির চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিরপেক্ষ মনে সত্যের সন্ধানে বইটি পড়লে পাঠকের জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে ইনশা আল্লাহ। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে পুস্তকটির বহুল প্রচার, লেখকের সাফল্য এবং পাঠকবর্গের জন্য আলোর দিশা কামনা করি।

নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

(-নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)
২৯/০৭/২০ ইং

---

* বান্দা তখন সেই মাদরাসায় খেদমতরত ছিল। -লেখক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

মানবজীবনের সফলতা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার বিধান মোতাবেক জীবনের সকল কাজ করা। আল্লাহপাক যা কিছু করণীয় বিধান দিয়েছেন সেগুলো যত্নের সাথে সুন্নাহ মোতাবেক আঞ্জাম দেওয়া। আর যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে যত্নের সাথে, সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

এ শিক্ষাই আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম সেভাবে জীবন পরিচালনা করেছেন। এবং এর মাধ্যমে ইহকালেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ পেয়েছেন।

এ ধরনের আল্লাহপ্রিয় সুন্দর জীবনযাপনের জন্য কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। যা অর্জন করা সকল শ্রেণী ও পেশার লোকের জন্য সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ঘোষণা–

فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝

যদি না জানো তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো।

-সূরা নাহল, আয়াত ৪৩

তাই ইসলামের সূচনালগ্ন হতেই এ ধারা চলে আসছে যে, সাধারণ মুসলিমগণ আলিমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে করে দ্বীনের পথে চলেছেন। এটাকেই তাকলীদ বা মাযহাব অনুসরণ বলে। এ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম রচিত কিতাব تقلید کی شرعی حیثیت - যার অনুবাদ আমরা "মাযহাব ও তাকলীদ কী ও কেন?" নামে প্রকাশ করেছি, সে কিতাবের শুরুতে বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ ও আমাদের মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর একটি সুন্দর ভূমিকা আছে। সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি।

মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেবের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন হয় কেন

প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে 'ফিক্‌হ' কাকে বলে। ফিক্‌হ বলা হয়–

১. কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানাবলীর সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপকে।

কেননা ফিকহের মধ্যে তাহারাত (পবিত্রতা) থেকে ফরায়েজ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল) পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসায়েল বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে এক স্থানে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।

২. এবং ইসলামী ইবাদতসমূহের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির সুবিন্যস্ত রূপকে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে শিখিয়েছিলেন; তাঁরা তাবেয়ীগণকে এবং তাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোকদের শিখিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, আমরা প্রতিদিন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, তার তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসআলাসমূহ যদি আপনি হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে হাদীসের একটি দু'টি কিতাব নয়, দশ বিশ কিতাবেও তা পাবেন না। নামাযের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীস যা একশতেরও অধিক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা যদি আপনি এক জায়গায় একত্রও করেন তারপরও এ সংক্রান্ত মাসায়েল জানার জন্য আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে–

(ক) নামাযের কাজসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরি করা। কেননা কোন হাদীসেই স্পষ্টভাবে এই পূর্ণাঙ্গ খসড়া উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) জমাকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা।

(গ) এই হাদীসসমূহের মধ্যে যেসব হাদীসের মর্ম শুধু আরবী ভাষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় না তার সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। কেননা অনেক হাদীস এমন আছে যেখানে ভাষার বিচারে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) কিছু হাদীস এমনও আছে যার বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে, কিন্তু এর দলীল সেই হাদীসে উল্লেখ নেই। শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে এ ধরনের হাদীসসমূহ শনাক্ত করাও জরুরী।

(ঙ) অনেক হাদীসে সাধারণ পাঠকবৃন্দ দেখবেন যে, কোন হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা আছে, কোন হাদীসে না-করার কথা। কোথাও আমীন জোরে বলার কথা এসেছে আবার কোথাও আস্তে বলার কথা। কোন হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে ইমামের পেছনে কুরআন (সূরা ফাতেহা ও অন্য কোন সূরা) পড়তে হয়। আবার কোন হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে ইমামের পেছনে কুরআন পড়তে হয় না। এ ধরনের অনেক বিষয় আছে। এখন এসব বিষয়ে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এবং কোন্ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে—এর ফয়সালা শুধু হাদীসের অনুবাদ পড়ে করা সম্ভব নয়।

(চ) উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে নামাযের মধ্যকার যেসব কাজের কথা জানা গেল তার মধ্যে কোন্ কাজটি ফরয, কোন্‌টি ওয়াজিব, কোন্‌টি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর কোন্‌টি সুন্নাতে যায়েদা-মুস্তাহাব; অনুরূপ যেসব কাজ নামাযে নিষিদ্ধ তার মধ্যে কোন্ কাজটি দ্বারা নামায একদম নষ্ট হয়ে যায়, কোন্ কাজটি দ্বারা নামায নষ্ট না হলেও নামাযের মধ্যে তা মাকরূহ-মাকরূহে তাহরীমী বা মাকরূহে তানযীহী কিংবা অনুত্তম ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণও হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই।

এবার আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন, ফুকাহায়ে কেরাম কত বড় কাজ করেছেন এবং সাধারণ মানুষের কত বড় উপকার করে গেছেন। পাশাপাশি এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, ফিকহ কাকে বলে।

ফুকাহায়ে কেরাম নামায সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্র করে তার আলোকে নামাযের ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ রূপটি সংকলন করেছেন। একজন সাধারণ মানুষ শুধু নয় একজন আলেমও হাদীসের অসংখ্য কিতাব থেকে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্র করার পরও নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপ-রেখা এবং এর মাসায়েল আহরণ করতে উপরোক্ত যে

জটিল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হত, ফুকাহায়ে কেরাম শরীয়তের দলীল-প্রমাণের আলোকে তার সমাধান দিয়ে গেছেন। একইভাবে যাকাতের ব্যাপারে চিন্তা করুন, হজ্জের ব্যাপারে চিন্তা করুন। প্রত্যেকটি অধ্যায়েই এসব শাস্ত্রীয় সমস্যা রয়েছে এবং উম্মাহর ফকীহগণ এসব সমস্যার সাগর পাড়ি দিয়ে কুরআনী বিধি-বিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ উপযুক্ত বিন্যাস ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে পেশ করেছেন। তাই বলা যায়, ফিক্হ হল শরীয়তের হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত ও একস্থানে সংকলিত এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সমষ্টির নাম।

৩. অনুরূপ ফিকহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, ওই সব মাসআলার সুবিন্যস্ত সমষ্টি যা কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই। শরীয়তের নীতিমালা থেকে বা কিয়াসে শরয়ীর মাধ্যমে শরীয়তের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ওই সব মাসআলা আহরণ করার কাজটি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে সকল যুগের ফকীহগণই করে গেছেন। ওই সব মাসআলাকেও ফিকহের মধ্যে উপযুক্ত বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ফিকহের পরিচয় জানার পর এ প্রশ্নটির উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীস থাকা অবস্থায় ফিকহের প্রয়োজন কী? কেননা–

যখন ফিক্হ হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং হাদীস শরীফেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং হাদীস শরীফের হুকুম-আহকামেরই সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ, তাই খোদ হাদীসের জন্যই এবং সহজভাবে সঠিক পন্থায় হাদীস শরীফের অনুসরণের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন। এজন্যেই খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ফুকাহায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আর এজন্যই ফিকহ-বিমুখ ব্যক্তিরা কখনো হাদীসের অনুসারী হতে পারে না। হাদীসের সঠিক অনুসারী তারাই যারা ফকীহগণের নির্দেশনাক্রমে এবং ফিকহের আলোকে হাদীস শরীফের অনুসরণ করেন। হাদীস অনুসরণের এই পদ্ধতিটিই খায়রুল কুরূন (সাহাবী-তাবেয়ীনের যুগ) থেকে চলে আসছে এবং ইসলামের সকল যুগেই মুসলিম জাতি এই পদ্ধতিতেই হাদীস শরীফের অনুসরণ করে ধন্য হয়েছেন। তাই এটিই হল হাদীস অনুসরণের সুন্নাহ-নির্দেশিত পন্থা।

আজকাল হাদীস অনুসরণের নামে ফিকহে ইসলামী এবং ফুকাহায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এটা কখনো হাদীস অনুসরণ নয়, এটা সুন্নতে মুতাওয়ারাছার বিরুদ্ধাচরণ। অন্য ভাষায় বললে, এটা হল হাদীস অনুসরণের একটি বেদআতী বা নব-আবিষ্কৃত পন্থা।

'মাযহাব' কী এবং 'তাকলীদ' কাকে বলে

আপনি যদি ফিকহের পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে এবার আরো একটি বিষয় লক্ষ করুন। আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি যে, কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত সংকলনই হচ্ছে ফিক্হ। এই ফিকহের একাধিক সংকলন বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে বর্তমান কাল পর্যন্ত শুধু চারটি সংকলনই স্থায়িত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই সংকলনগুলো হচ্ছে–

১. 'ফিকহে হানাফী'– যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপনের কাজটি ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ., জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত ১৫০ হিজরী)এর হাতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

২. 'ফিকহে মালেকী'– যার সংকলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইমাম মালেক (রহ., জন্ম ৯৪ হিজরী, মৃত ১৭৯ হিজরী)এর হাতে।

৩. 'ফিকহে শাফেয়ী'– ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (রহ., জন্ম ১৫০ হিজরী, মৃত ২০৪ হিজরী) যার ভিত্তি রেখেছেন।

৪. 'ফিক্হে হাম্বলী'– ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ., জন্ম ১৬৪ হিজরী, মৃত ২৪১ হিজরী) এর ভিত্তি রেখেছেন।

সাধারণ পরিভাষায় ফিকহের প্রত্যেকটি সংকলন 'মাযহাব' নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য এখানে 'মাযহাব' শব্দটির অর্থ 'ফিকহের মাযহাব' তথা ফিকহের নির্দিষ্ট একটি সংকলন। এখানে মাযহাব অর্থ দ্বীন বা আকায়েদ বিষয়ে মতবিরোধকারী কোন 'ফেরকা' নয়। কেননা ফিকহের এই মাযহাবগুলোর প্রতিটিই দ্বীন ইসলাম এবং শরীয়তের অধীন এবং শরীয়ত অনুযায়ী চলারই একাধিক পথ। এই মাযহাবের ইমামগণ সবাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদার উপরই ছিলেন এবং সব ধরনের ভ্রান্ত আকীদা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের অনুসারীরা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের

মত ও পথেরই অনুগামী। তবে বিভিন্ন সময় এমন হয়েছে যে, আকীদাগতভাবে বিভ্রান্ত বেদআতী লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে এসে উপরোক্ত চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাদের বেদআতী আকীদা-বিশ্বাসের সব দায়-দায়িত্বই তাদের; মাযহাবের ইমাম, তাঁদের সংকলিত ফিকহ এবং তাঁদের অনুসারীদের উপর বর্তায় না।

তাকলীদের অর্থ : এই ফিকহী মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের আহকাম জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে সাধারণ পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলে। অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে ফকীহগণের শরণাপন্ন হওয়ার যে আদেশ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করেছেন এবং নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে করেছেন তাদেরই সংকলিত ফিকহ থেকে কুরআন হাদীসের হুকুম জেনে সে অনুযায়ী আমল করাকেই সাধারণ পরিভাষায় 'তাকলীদ' বা 'মাযহাব মানা' কিংবা 'ফিকহ অনুসরণ' করা বলা হয়।

আপনি যদি ফিকহের পরিচয় পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না যে, 'তাকলীদ' বৈধ কি অবৈধ বা ফিকহ অনুযায়ী আমল করার বিধান কী? কিংবা কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসরণ করা ভাল না মন্দ? ফিকহের পরিচয় জানার সাথে সাথেই এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন হাদীস অনুসরণ করার সঠিক, সহজ ও নিরাপদ পথটি হল ফিকহের আলোকে ফুকাহায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই পদ্ধতিই সর্বজন স্বীকৃত ও অনুসৃত।

তাকলীদ-বিরোধীরা কী বলতে চান

মুসলিম উম্মাহর এই সর্বসম্মত কর্মধারার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দলবদ্ধ আওয়াজ ওঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাড়ে বারশো বছর পরে। আর তা-ও এই উপমহাদেশে এবং ইংরেজদের শাসনামলে, যাদের রাজ্য-শাসনের পলিসিই ছিল Devide and rule 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং রাজ্যশাসন কর।'

এই বিরোধী আওয়াজটির হাকীকত বড়ই অস্পষ্ট অথবা সীমাহীন স্ববিরোধিতার এক সমষ্টি। আমি আমাদের দেশের গাইরে মুকাল্লিদ

ভাইদের (যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস নামে পরিচয় দেন) অনেক পুস্তিকা ও লিফলেট পড়েছি, তাদের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেছি, কারো কারো সাথে আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু এসব কিছুর পরও তাদের বিভ্রান্তি বা অসাধুতাই আমার সামনে পরিস্ফুট হয়েছে।

এরা তাকলীদ করা বা মাযহাব মানাকে নাজায়েয, হারাম এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ জায়েয, আলেমদের জন্য নাজায়েয। কেউ বলে, তাকলীদ জায়েয তবে নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ নাজায়েয। আবার কেউ 'মাযহাব মানা ফরয নয়' এটুকু বলে চুপ করে থাকে। ফরয না হলে কী– এ কথাটা আর বলে না।

এখানে আমি এই সব ভ্রান্ত কথাগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে চাই না বা তার প্রয়োজনও নেই। কেননা এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ সমৃদ্ধ, যথোপযুক্ত আলোচনা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেই রয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তাকলীদবিরোধী লোকদের বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে এবং তাদের বেশ কিছু ক্যাসেট শুনে এ বিষয়টিই জানা গেছে যে, তারা–

১. 'তাকলীদে'র পরিচয় দেয় 'অন্ধ অনুসরণ' দ্বারা।

২. তাদের মতে, কারো দলীলবিহীন কথাকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়ার নাম তাকলীদ, তা কুরআন হাদীসের অনুকূলে হোক বা কুরআন হাদীস পরিপন্থী।

৩. তাদের বক্তব্য হল, মুকাল্লিদগণ তাদের ইমামদেরকে 'মাসূম' তথা ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করে। অর্থাৎ তারা যেন ইমামগণকে রাসূলের স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ ধরনের আরো কিছু কথা তারা বলে যার সাথে তাকলীদকারী বা মাযহাব অনুসারীদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা নিজেরাও মুকাল্লিদ, ফিকহে হানাফীর তাকলীদ করি। ওই সব বন্ধুরা তাকলীদের যে অর্থ করেছেন এবং মুকাল্লিদদের অবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ছাড়া আর কাউকে মাসূম-ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করি না। ইমাম আবু হানীফা রহ.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মতি এবং তাঁর শরীয়তের খাদেম মনে করি।

তাঁর ফিকহের অনুসরণ আমরা এজন্যই করি যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের হুকুম-আহকাম জানার জন্য ফকীহগণের শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ.এর কোন কথা যদি শরীয়তের দলীল দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে সেটা হানাফী ফিকহের মধ্যে 'ফতোয়াযোগ্য' বিবেচিত হয় না। তাহলে আমরা কীভাবে কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করে তাঁর তাকলীদ করলাম? আমরা তো কুরআন হাদীসের সত্যিকার অনুসরণের জন্যই, নিজেদের 'কাঁচা বুঝ' বা কোন অযোগ্য লোকের 'কাঁচা বুঝ'এর উপর নির্ভর না করে উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ ইমাম আবু হানীফা রহ.এর ফিকহের অনুসরণ করছি।

মোটকথা, মাযহাব ও ফিকহের হাকীকত সম্পর্কে এই নিবন্ধের শুরুর দিকে আলোচনা করা হয়েছে। তাকলীদ-বিরোধীগণ যদি এই অর্থেই 'তাকলীদ' বা 'ফিকহ'এর বিরোধিতা করে থাকেন তাহলে বাস্তবিকই মুকাল্লিদদের সাথে তাদের বিরোধিতা হতে পারে, কিন্তু তাকলীদ বা মাযহাবের এমন অর্থ বয়ান করা, যে অর্থে তাকলীদ ও মাযহাব ভুল প্রমাণিত হয়, এরপর অন্যায়ভাবে তা মুকাল্লিদদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া– এসব কাজের কোন বৈধতা হতে পারে কি? নাকি তাদের উদ্দেশ্যই হল মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য ছড়ানো। এতে অবশ্য এই বাস্তবতা বিরোধী বয়ান-বক্তৃতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে!

আমরা সেই সব বন্ধুদের খেদমতে আরয করতে চাই, আপনারা তাকলীদ ও ফিকহের সেই পরিচয় নিয়ে একবার ভাবুন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে নিয়ম অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহর বৃহৎ অংশের আমল চলে আসছে, এরপর বলুন, এ ধরনের তাকলীদ বা এই অর্থে মাযহাব মানার ব্যাপারে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি-না? যদি থাকে তাহলে কেন? এটাই হবে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা। শুধু শুধু নিজেদের পক্ষ থেকে একটা মতবাদ তৈরি করে তা কারো কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে এরপর মনের সুখে তার খণ্ডন কার্যে নিমগ্ন হওয়া তো কোন ন্যায়সঙ্গত পন্থা হতে পারে না। আর না এধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া কোন হাদীস অনুসরণকারী মুসলমানের পক্ষে শোভা পায়!

বন্ধুবর্গের খেদমতে শুধু একটি প্রশ্নই করতে চাই, যে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমরা উম্মাহর ফকীহগণের সংকলিত ফিকহের শরণাপন্ন হয়েছি, আপনারা যখন ফিকহের প্রয়োজন বোধ করেন না, তো এই সব সমস্যার সমাধান আপনারা কীভাবে করেন? শুধুই নিজের মত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে? না পরবর্তী যুগের কোন আলেমের 'বুঝ'এর উপর নির্ভর করে? না তৃতীয় কোন পথ অবলম্বন করে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবুন। এরপর ইনসাফের সাথে বলুন, ফিকহের অনুসারীরাই সরল-সঠিক পথের উপর আছেন, না আপনারা?

আর একটি বিষয়েও ভাবুন, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ ব্যক্তি এবং আপনাদের মধ্যে মতপার্থক্যটি হচ্ছে হাদীস অনুসরণের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে। আপনারা এ ব্যাপারে একটি নব-আবিষ্কৃত কর্ম-পন্থা অবলম্বন করতে চান আর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ থাকতে চান সুন্নাহ-নির্দেশিত পন্থার উপরই। হাদীস অনুসরণের মূল কথাটিতে তো কারো কোন দ্বিমত নেই। তাহলে এই গোটা মুসলিম জাতির বিপরীতে আপনারা কীভাবে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' নামে পরিচয় দেন আর তাদেরকে আখ্যা দেন হাদীস অমান্যকারীরূপে? হাদীস অনুসরণের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে যে মতবিরোধ, তাকে আপনারা কোন্ যুক্তিতে খোদ হাদীস অনুসরণের মতবিরোধ সাব্যস্ত করেন? আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ভাবুন এবং কোন হানাফী মাযহাবের অনুসারীকে তওবা করিয়ে গাইরে মুকাল্লিদ বানানোর এই না-জায়েয বা অন্তত অর্থহীন কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে অমুসলিম ও মুশরেকদেরকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু যদি আপনারাও আপনাদের কোন কোন বেইলম অনুসারীর মত হানাফী থেকে গাইরে মুকাল্লিদ হওয়াকে কাফের থেকে মুসলমান হওয়ার সমর্থক মনে করেন তাহলে তো এসব কথা আপনাদেরকে বলাও একটা অর্থহীন পরিশ্রমই হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং ইসলামের এই দুর্দিনে বহুধা বিভক্ত উম্মতকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ভূমিকা এখানে শেষ হয়েছে। "মাযহাব ও তাকলীদ কী ও কেন?" ১১-১৮ পৃষ্ঠা

আমাদের বর্তমান আয়োজন হযরতেরই বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন ছাহেব রচিত গবেষণামূলক কিতাব **"মাযহাব-পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা ও ইতিহাস"**। এটি মাযহাব ও তাকলীদ বিষয়ক অপূর্ব এক কিতাব। কোন পাঠক যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে এটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন তাহলে এ বিষয়ক সকল সংশয় দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক মেহেরবানী করে এ কিতাবটি কবুল করুন। সকলের জন্য উপকারী বানান। আমীন

আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী এ মূল্যবান গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারও দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

তারিখ
১৭ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরী
মোতাবেক ২৭ এপ্রিল ২০২৪ ঈসাব্দ

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
স্বত্বাধিকারী : মাকতাবাতুল আশরাফ
দারুত তাসনীফ : মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্ব কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

মানুষ স্বভাবগতভাবেই অনুসরণপ্রিয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের ফিতরত ও স্বভাবের মধ্যেই গচ্ছিত রেখেছেন অনুসরণের প্রবণতা। মুসাল্লা বিছিয়ে মা নামাযে দাঁড়ায়। অবুঝ শিশুটি মায়ের পাশে এসে মাকে অনুকরণ করে; মায়ের সাথে রুকু করে, সাজদা করে, দু'হাত তুলে দুআ করে, ...।

ফিতরতের ধর্ম ইসলাম বিভিন্নভাবে মানুষকে অনুসরণের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে প্রতিদিন পাঁচবার একজন ইমামের অনুকরণ কর। জিহাদ ফরয করে ইসলাম আদেশ করেছে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে তার আনুগত্য কর। একাধিক ব্যক্তি সফরে রওনা হলে ইসলামের বিধান হলো একজনকে কাফেলার আমীর নির্ধারিণ করে বাকিরা তার নির্দেশ মেনে চল। এমনিভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের আদেশ করেছে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের জন্যে মুজতাহিদ আলেমগণের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা মান্য কর।

যারা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখে না তারা কোনো মুজতাহিদ ইমামের দিক-নির্দেশনা অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করবে—এটাই বিবেকের দাবি। কারণ শরীআত মোতাবেক আমল করার জন্য শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। শরীআতের দলীল হলো চারটি : কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। যারা নিজে নিজে এসব দলীল থেকে বিধি-বিধান আহরণ করতে পারে না তারা আমল করবে কীভাবে?

স্পষ্ট কথা, তারা এমন কোনো মুজতাহিদ ইমামের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করবে, যাঁরা দ্বীনের এসব উৎস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখেন।

মোটকথা, যাদের সরাসরি শরীআতের উৎস থেকে আহকাম আহরণ করার যোগ্যতা নেই, তারা কোনো মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করবে—এটা শরীআত, ফিতরত ও বিবেকের দাবি।

তাই যুগ যুগ ধরে মুসলিমগণ মুজতাহিদ ইমামের তাফসীর ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী শরীআতের বিধান পালন করে আসছেন। **মুজতাহিদের ব্যাখ্যা মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের এই স্বভাবজাত, স্বীকৃত ও অনুসৃত ধারাকেই পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলা হয়। আর মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহর যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তার সামষ্টিক রূপকে 'মাযহাব' বলা হয়। মাযহাব শরীআত বহির্ভূত নতুন কোনো মতবাদ বা চিন্তাধারার নাম নয়; বরং মাযহাব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত বিধি-বিধানের সমষ্টি।**

কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু ভাই বিষয়টির তত্ত্ব ও স্বরূপ অনুধাবন করতে না পেরে মুসলিম উম্মাহর সেই অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হতে চলেছেন। বিজ্ঞ ফকীহের মাযহাব তথা মুজতাহিদ ইমামের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী দ্বীনের বিধান পালন করাকে নাজায়েয, শির্ক ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে উম্মতের মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছেন। সাধারণ মুসলিমদের পেরেশান করছেন। এর ফলে অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনাও ঘটছে।

এসবের প্রেক্ষিতে জামিয়া ইসলামিয়া শামসুল উলূম হাজীবাড়ী, নরসিংদী-এর সুযোগ্য মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবু হুরায়রা কাসেমী দামাত বারাকাতহুম আমাকে মাযহাবের হাকীকত ও স্বরূপ, মাযহাবের গুরুত্ব ও বিধান এবং মাযহাবের ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই লেখার আদেশ করেন। হযরতের আদেশ পালনার্থে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে এ বিষয়ে মেহনত শুরু করি। আল্লাহ তাআলা হযরতকে নেক হায়াত দান করুন এবং পূর্ণ আমন ও আফিয়াতের সাথে উম্মতের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তখন ১৪৩৬ হিজরী। কিছু দিনের মধ্যেই বিষয়-সংক্রান্ত মৌলিক কিছু উপাদান সংগ্রহ হয়ে যায় এবং ছোট্ট পুস্তিকা আকারে সেজে যায়। হযরত মুহতামিম ছাহেবের খেদমতে পেশ করি। তিনি খুশি হন এবং দুআ দেন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

এরপর পুস্তিকাটিতে আরও বিষয় সংযোজিত হয়েছে এবং একাধিক দক্ষ হাতে সম্পাদিত হয়েছে। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ায় খেদমতরত তিনজন তরুণ আলেম : বন্ধুবর মাওলানা আবদুর রহমান (পূর্ণ পুস্তিকা), সুহৃদ বন্ধু মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ (কিয়দংশ) ও প্রিয় দোস্ত মাওলানা আশেক বিল্লাহ তানভীর এবং মারকাযুদ দাওয়ায় উলূমুল হাদীস বিভাগে অধ্যায়নরত প্রিয় ভাই মাওলানা হাসিবুল ইসলাম (দুইজনে পূর্ণ) পুস্তিকাটি নজরে ছানী করেছেন। বান্দা সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সকল প্রকার কল্যাণ দান করুন এবং সব ধরনের অকল্যাণ থেকে নিরাপদে রাখুন। আমীন।

শুকরিয়া আদায় করছি, দেশবরেণ্য আলেম, খতীবে বাঙ্গাল, আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দামাত বারাকাতুহুমের। অতি ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করেছেন, পুস্তিকাটি আগাগোড়া পড়েছেন এবং সম্পাদনা করেছেন। ফোন করে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু প্রশংসা-মন্তব্য শুনিয়েছেন। একটি মন্তব্য হচ্ছে, **'তাকলীদ বিষয়ক যে কয়টি বই-পুস্তক আমার দেখা হয়েছে এর মধ্যে এ পুস্তকটি সবার সেরা'**। এরপর কোনো অনুরোধের অপেক্ষা না করে মূল্যবান অভিমত লিখে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা হযরতের ছিহ্হত ও হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। উম্মতের জন্য বেশি থেকে বেশি খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুস্তিকাটি লেখা থেকে ছাপা পর্যন্ত আরও অনেকের হাত আছে, বিভিন্ন সুহৃদের অবদান আছে। সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

বাংলার রুচিশীল ও অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী, বিশিষ্ট খাদেমে দ্বীন, আল্লামা হাবীবুর রহমান খান ছাহেব দা. বা.-এর যথোচিত কৃতজ্ঞতা অধমের ছোট মুখে কীভাবে আদায় করব। তাঁর উদারতা ও মহত্ত্বের সুবাদে বহুদিন প্রতিজ্ঞার পর আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে বান্দার এই পুস্তিকা। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ও তাঁর মাকতাবাকে ভরপুর কবুল করুন এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অধিক থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে মুহতারাম পাঠকের নিকট আরয করছি, লেখালেখির জগতে সবেমাত্র বান্দার সূচনাপ্রয়াস। তাই ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর জন্য সুহৃদ পাঠক সমীপে সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল।

হে আল্লাহ! নিজ দয়া ও অনুগ্রহে পুস্তিকাটি কবুল করুন এবং আমার আম্মা-আব্বা, আসাতেযায়ে কেরাম ও আমার প্রতি যাদের সামান্যও ইহসান রয়েছে তাদের সকলের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে নিন। আমীন।

هٰذَا، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا ومَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ، وصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত
বান্দা মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন
রবিবার
১৪ যিলক্বদ ১৪৪৪ হিজরী
৪ জুন ২০২৩ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
মাযহাব ও তাকলীদ : পরিচিতি ❖ ২৭-৬৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : তাকলীদের পরিচয় ও স্বরূপ ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সালাফের বক্তব্যে তাকলীদ করা ও মাযহাব মানার হাকীকত ৩৪

মুজতাহিদের রায় ও মাযহাব হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৪

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. (১১৮-১৮১ হিজরী)-এর বক্তব্য ৩৪

ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. (১১৮-২০৬ হিজরী)-এর বক্তব্য ৩৫

সুলাইমান ইবনে মিহরান আমাশ রহ. (১৪৮ হিজরী)-এর বক্তব্য ৩৭

শাফেয়ী রহ. (১৫০-২০৪ হিজরী)-এর বক্তব্য ৩৮

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. (১৩৫-১৯৮ হিজরী)-এর বক্তব্য ৩৯

ঈসা ইবনে আবু বকর আইয়ুবী রহ. (৫৭৬-৬২৪ হিজরী)-এর বক্তব্য ৪০

মাযহাব আল্লাহর আনুগত্যের পদ্ধতি শেখায় ৪১

মিসআর ইবনে কিদাম রহ. (১৫৫ হিজরী)-এর বক্তব্য ৪১

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রহ. (১৯৮ হিজরী)-এর বক্তব্য ৪৩

আবু ইউসুফ রহ. (১৮২ হিজরী)-এর বক্তব্য ৪৪

আলী ইবনুল মাদীনী (২৩৪ হিজরী) রহ.-এর বক্তব্য ৪৭

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী)-এর বক্তব্য ৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মাযহাবের হাকীকত : দৃষ্টান্তের আলোকে ৪৯

কুরআনে কারীম থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত ৪৯

হাদীস শরীফ থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত ৫২

মাযহাব যেভাবে কুরআন-হাদীস উভয়টির ব্যাখ্যা করে ৬১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উম্মাহর প্রতি ফিকহ ও মাযহাবের অবদান ৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুসারে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের বিধান ও প্রমাণ ❖ ৬৯-১৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা	৭১
সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়	৭১
দুটি দলীল	৭১
এক. মুহাদ্দিসগণের অনেকেই হাদীস থেকে বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখেন না	৭১
দুই. দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলির নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব	৭৮
সাহাবায়ে কেরামের যুগেও কি সকলে মুজতাহিদ ছিলেন?	৮২
হুকুম-আহকামের দলীল-প্রমাণ বোঝা কি সবার পক্ষে সম্ভব?	৮৪
তাকলীদ ছাড়া উপায় নেই, তাকলীদ বিরোধিরাও তাকলীদ করেন	৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন মাজীদের আলোকে মাযহাব	৮৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস শরীফের আলোকে মাযহাব	১০০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে মাযহাব	১১৮
আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাযি.-এর নির্দেশ	১১৮
আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি.-এর বক্তব্য	১২২
যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর নির্দেশনা	১২৪
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কর্মপন্থা	১২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে মাযহাব	১২৮
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বক্তব্য	১২৮
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর বক্তব্য	১৩০
মাযহাব-এর ব্যাপারে 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুকার্‌রমা'-এর সিদ্ধান্ত	১৩৩
শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্য	১৩৪
সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব অনুসরণ করা কর্তব্য এতে বিবেকসম্পন্ন কোনো আলেমের দ্বিমত নেই	১৩৭

তৃতীয় অধ্যায়
মাযহাবের ইতিহাস ❖ ১৩৯-২৮১

প্রথম পরিচ্ছেদ : নবীযুগে আমল করার পদ্ধতি ১৪১
সংক্ষিপ্তভাবে মুসলিমবিশ্বের সাধারণ চিত্র ১৪১
দুটি নজির ১৪২
প্রথম নজির : হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসীর আমল ১৪২
দ্বিতীয় নজির : মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীর আমল ১৪৫
অন্যান্য মুসলিম শহরের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশনা ১৪৭
আরও দুটি নজির ১৪৭
সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই তাকলীদ করতেন ১৫০
ইমাম ইবনুল হুমাম রহ.-এর বক্তব্য ১৫১
শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্য ১৫১
সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের নিকট প্রেরিত সাহাবীর তাকলীদ করতেন}
সব ক্ষেত্রেই : একটি দৃষ্টান্ত ১৫২
সালাফী আলেমদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ১৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সাহাবায়ে কেরামের যুগে মাযহাব ১৫৪
কূফানগরীর মাযহাব অনুসরণ ১৫৫
মক্কাবাসীর মাযহাব অনুসরণ ১৫৬
মদীনাবাসীর মাযহাব অনুসরণ ১৫৭
অন্যান্য মুসলিম শহরের মাযহাব অনুসরণ ১৫৯
বসরাবাসীর মাযহাব অনুসরণ ১৬০
দামেশক ও হিম্‌ছবাসীর মাযহাব অনুসরণ ১৬০
শামবাসীর মাযহাব অনুসরণ ১৬২
সমগ্র মুসলিমবিশ্বে মাযহাব অনুসরণ ১৬৪
কখনো কখনো ফকীহ সাহাবীও তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ সাহাবীর}
তাকলীদ করতেন ১৬৫
সাহাবায়ে কেরামের যুগে খুব দৃঢ়তার সাথে মাযহাব মানা হতো ১৬৮
একটি দৃষ্টান্ত ১৬৮
সালাফী আলেমগণের নিকট একটি জিজ্ঞসা ১৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাবেয়ীনযুগে মাযহাব	**১৭১**
আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রহ.-এর বক্তব্য	১৭১
মুহাদ্দিস আবু মুসহির রহ.-এর বক্তব্য	১৭৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খাইরুল কুরূনের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও মাযহাব অনুসরণ করতেন	**১৭৭**
একটি প্রশ্নের উত্তর	১৮২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সালাফের যুগ থেকে অবিসংবাদিত আহলে হাদীসগণের অনুসৃত কর্মধারা	**১৮৪**
আহলে হাদীসের পরিচয়	১৮৫
আহলে হাদীসের কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য	১৮৫
হাদীসশাস্ত্রের ইমাম না হলে আহলে হাদীস হওয়া যায় না	১৮৭
কিছু মন্তব্য	১৮৭
সালাফের যুগে আহলে হাদীস হওয়া আর মাযহাবের অনুসারী হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না	১৯২
সালাফের যুগে মাযহাবের অনুসারী কতিপয় আহলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১৯৩
১. আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. (১৩৫-১৯৮ হিজরী)	১৯৩
২. ইয়াকুব ইবনে শায়বা সাদুসী মালেকী রহ. (১৮২-২৬২ হিজরী)	১৯৪
৩. আহমাদ ইবনে সায়্যার শাফেয়ী রহ. (২৬৮ হিজরী)	১৯৫
৪. মুহাম্মাদ ইবনে নছর মারওয়াযী শাফেয়ী রহ. (২০২-২৯৪ হিজরী)	১৯৬
৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বুশানজী মালেকী রহ. (২০৪-২৯১ হিজরী)	১৯৭
৬. ইবনুল জাব্বাব কুরতুবী মালেকী রহ. (২৪৬-৩২২ হিজরী)	১৯৮
৭. ইবনে আবু হাতেম শাফেয়ী রহ. (২৪০-৩২৭ হিজরী)	১৯৮
৮. আবু বকর ইসমাঈলী শাফেয়ী রহ. (২৭৭-৩৭১ হিজরী)	১৯৯
৯. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ জানযী শাফেয়ী রহ.	২০০
১০. আবু হাতেম ইবনে হিব্বান শাফেয়ী রহ. (৩৫৪ হিজরী)	২০০
১১. ইমাম দারাকুতনী শাফেয়ী রহ. (৩০৬-৩৮৫ হিজরী)	২০০

১২. আবু সুলায়মান খাত্তাবী শাফেয়ী রহ. (৩৮৮ হিজরী) ২০২
১৩. হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী শাফেয়ী রহ. (৩২১-৪০৫ হিজরী) ২০২
১৪. ইবনে আবদুল বার মালেকী রহ. (৩৬৮-৪৬৩ হিজরী) ২০৩
১৫. আবু বকর খতীব বাগদাদী শাফেয়ী রহ. (৩৯২-৪৬৩ হিজরী) ২০৪
১৬. কাযী ইবনে সুক্কারা সারাকুসতী মালেকী রহ. (৫১৪ হিজরী) ২০৫
১৭. আবু আলী জায়্যানী গাস্‌সানী মালেকী রহ. (৪২৭-৪৯৮ হিজরী) ২০৫
১৮. কাযী ইয়ায আবুল ফযল মালেকী রহ. (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী) ২০৬
১৯. ইবনে আসাকির দামেশ্‌কী শাফেয়ী রহ. (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) ২০৬
২০. আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী হাম্বলী রহ. (৫৯৭ হিজরী) ২০৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সালাফের যুগে ইমাম আবু হানীফার অনুসারী কিছুসংখ্যক বিশ্ববরেণ্য আহলে হাদীস মুহাদ্দিস ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২০৮
১. শু‘বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. (৮২-১৬০ হিজরী) ২০৮
২. সুফিয়ান ছাওরী রহ. (৯৭-১৬১ হিজরী) ২১০
৩. মিসআর ইবনে কিদাম রহ. (১৫৫ হিজরী) ২১৬
৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. (১১৮-১৮১ হিজরী) ২১৯
৫. আবু ইউসুফ রহ. (১১৩-১৮২ হিজরী) ২২২
৬. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা রহ. (১৮৩ হিজরী) ২২৫
৭. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. (১৩২-১৮৯ হিজরী) ২২৯
৮. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. (১২০-১৯৮ হিজরী) ২৩২
৯. ইমাম ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ. (১২৯-১৯৭ হিজরী) ২৩৬
১০. ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ. (২০৩ হিজরী) ২৩৮
১১. ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. (১১৮-২০৬ হিজরী) ২৪১
১২. আবু আছেম নাবীল রহ. (১২২-২১২ হিজরী) ২৪৩
১৩. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বলখী রহ. (২১৫ হিজরী) ২৪৬
১৪. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. (১৫৮-২৩৩ হিজরী) ২৪৮
১৫. ইমাম আবু জাফর তহাবী রহ. (২৩৯-৩২১ হিজরী) ২৫১

সপ্তম পরিচ্ছেদ : যুগে যুগে মাযহাবের অনুসারী	**২৫৫**
কতিপয় বরিত আহলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি	২৫৫
ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ.ও মাযহাব অনুসরণ করতেন	২৬০
তাদের কাছে একটি প্রশ্ন	২৬১
অষ্টম পরিচ্ছেদ : হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের লেখকগণ ও তাঁদের মাযহাব	**২৬২**
ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ.	২৬২
অনেকের মতে ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ ছিলেন না : দুটি দলীল	২৬৩
ইমাম বুখারী রহ.-এর মাযহাব	২৬৪
ইমাম বুখারী রহ. প্রথম জীবনে হানাফী ছিলেন	২৬৫
ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম কুশাইরী রহ.	২৬৮
ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশ্‌আছ সিজিস্তানী রহ.	২৬৯
ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা তিরমিযী রহ.	২৬৯
ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব নাসায়ী রহ.	২৬৯
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ কাযভীনী রহ.	২৭০
নবম পরিচ্ছেদ : আরবের আলেমগণের মাযহাব অনুসরণ	**২৭১**
একটি প্রশ্নের উত্তর	২৭৫
তাকলীদের স্তর-বিন্যাস	২৭৮
দশম পরিচ্ছেদ : ইতিহাস থেকে শিক্ষা	**২৮১**

চতুর্থ অধ্যায়
ইজতিহাদ ❖ ২৮২-৩১৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুজতাহিদের পরিচয়	**২৮৩**
মুজতাহিদ হওয়া কি এতই সহজ?	২৮৩
মুজতাহিদ হওয়ার কিছু শর্ত	২৮৪
আহকামে শরইয়্যার উছূল হলো চারটি	২৯০
মুজতাহিদের জন্য নিম্নে যে পরিমাণ হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরি	২৯২
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বক্তব্য	২৯২

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর বক্তব্য ২৯৩
সংশয় ও নিরসন ২৯৪
হাফেযুল হাদীস হলেই কি মুজতাহিদ হয়ে যায়? ২৯৫
চারটি ঘটনা ২৯৬

ছয়টি মন্তব্য ৩০২
ইবনে আবদুল হাদী রহ. বলেছেন, শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ.}
বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন না ৩০২
ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেছেন, আলী ইবনু মাদীনী রহ.}
ফকীহ ছিলেন না ৩০৫
মাসআলা বলা আমাদের সাধ্যে নেই : ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ৩০৭
ঈসা ইবনে আবু বকর রহ. বলেছেন, খতীব বাগদাদী রহ.}
ফকীহ ছিলেন না ৩০৭
ইমাম নাসায়ী রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও}
আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ফকীহ ছিলেন না ৩০৮
ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, আবদুর রায্যাক রহ. ফকীহ ছিলেন না;}
বরং মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ফকীহের সংখ্যা খুবই কম ৩০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কম্পিউটার যখন মুজতাহিদ ৩১১
কম্পিউটার কি কাউকে মুজতাহিদ বানাতে পারে? ৩১১
ওই ভাইদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ৩১৩
একটি মাত্র হাদীস থেকে কয়েক শ' শিক্ষা ৩১৩

পঞ্চম অধ্যায়

সালাফী আলেমদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা ❖ ৩১৮-৩৩০

এক. সাধারণ মানুষ কি আপনাদের তাকলীদ করবে,}
না মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করবে? ৩১৯

দুই. যেসব সাধারণ মানুষ সালাফী আলেমগণের মাযহাব মানে,}
তাদের সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া কী? ৩২০

তিন. সালাফী আলেমগণ তাকলীদ করেন কেন? ৩২২
চার. এ যুগের আহলে হাদীস কি সালাফের যুগেও ছিল? ৩২৪

পাঁচ. ইংরেজ বেনিয়াদের উপনিবেশের পূর্বে কি}
আহলে হাদীস ফিরকার ইতিহাস পাওয়া যায়? ৩২৬
বাপ-দাদার 'ইত্তিবা' কি জায়েয? ৩২৭
ছয়. সালাফী আলেমদের কথা মানব, না আল্লাহর হুকুম মানব? ৩২৯
সাত : আপনাদের আনুগত্য করব, না নবীজীর অনুসরণ করব? ৩২৯
আট. এঁদের সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া কী? ৩২৯
নয়. সালাফের যুগের আহলে হাদীস ইমামগণ কি}
তাকলীদ করে শিরক করেছেন? ৩৩০
দশ. এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, সাধারণ মানুষের জন্য}
তাকলীদ করা আবশ্যক? ৩৩০

ষষ্ঠ অধ্যায়

একটি পুস্তিকার খোলাসা ❖ ৩৩১-৩৪৪

মাযহাব সম্পর্কে ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ.-এর পুস্তিকা ৩৩৩
খায়রুল কুরূনে ইজতিহাদের অবস্থা ৩৩৩
এভাবে চলতে থাকলে দ্বীন আর দ্বীন থাকবে না ৩৩৪
চার মাযহাব আল্লাহ তাআলার বিশেষ করুণা ও রহমত ৩৩৬
সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব মানা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই ৩৩৭
আহাম্মকের প্রশ্নের উত্তর ৩৩৭
আরেকটি প্রশ্নের জবাব ৩৩৯

তৃতীয় প্রশ্ন ৩৩৯
হে দাবিদার মুজতাহিদ! আপনি কি ইলমের প্রাথমিক স্তরে}
পৌঁছতে পেরেছেন? ৩৪১
কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা করার সঠিক পদ্ধতি ৩৪৩

প্রথম অধ্যায়

মাযহাব ও তাকলীদ : পরিচিতি

তাকলীদ করার অর্থ হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও নির্দেশনাবলির উপর আমল করা, ওই তাফসীরের আলোকে, যা ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহ পেশ করেছেন। কেননা, আমাদের নিকট জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন।

–হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাকলীদের পরিচয় ও স্বরূপ

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

(হে নবী!) আমি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।[১]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। হাদীস শরীফের মাধ্যমে কুরআন মাজীদের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কথার মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে এবং তাঁর সামনে সংঘটিত ঘটনাবলির মৌন স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির মাধ্যমে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করেছেন। এখানেই শেষ নয়; তাঁর অবর্তমানে উম্মত যেন সহজে দ্বীনের বিধানাবলি অনুসরণ করতে পারে সে জন্য আলেমদের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। তাই উম্মাহর আলেমগণ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী। হযরত আবুদ্দারদা রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ।[২]

---

১. সূরা নাহ্ল (১৬), আয়াত ৪৪

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৪১; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৮৮; =

প্রতিনিধির কর্তব্য, মূল ব্যক্তির অবর্তমানে তার সব দায়দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম একটি দায়িত্ব হলো, কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মানুষকে দ্বীনের বিধি-বিধান বুঝিয়ে দেওয়া। আর উলামায়ে কেমাম যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব ও প্রতিনিধি, তাই তাদেরও দায়িত্ব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে মানুষের সামনে কুরআনুল কারীমের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পেশ করা। শরীআতের সে দায়িত্ব পালনার্থে তাঁরা শরঈ উসূল ও মূলনীতির আলোকে কুরআন মাজীদের গবেষণা করে আমাদেরকে দ্বীনের বিধি-বিধান বুঝিয়েছেন। আমরা তাঁদের সে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুযায়ী শরীআতের উপর আমল করি। কারণ তাঁদের ইলম ও আমলের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তাঁদের তাকওয়া, তাহারাত এবং ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের ব্যাপারে কারও কোনো আপত্তি নেই। আর সত্যি বলতে কি, তাঁদের ইলম ও প্রজ্ঞার বিস্তৃতি ও গভীরতা আন্দায করার মতো যোগ্যতা কি আমাদের আছে![৩]

= মুসনাদুশ শিহাব, হাদীস নং ৯৭৫; মুসনাদুশ শামিয়্যীন, তবারানী, হাদীস নং ১২৩১; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ১৬৯৬

هذا حديث قوي، له أسانيد وشواهد كثيرة. قال أبو عمر: قال حمزة: وهو حديث حسن غريب. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: قَدْ روي «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» بِأَسَانِيدَ صَالِحَةٍ. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث مسلم... وإسناده جيد. وقال ابن الملقن في البدر المنير: هذا الحديث صحيح. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا.

৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৬৬১-৭২৮হি.) বলেন–

اَلَّذِيْنَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ هَذِهِ الدَّوَاوِينِ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِكَثِيرٍ،... فَكَانَتْ دَوَاوِينُهُمْ صُدُورَهُمْ الَّتِي تَحْوِي أَضْعَافَ مَا فِي هذه الدَّوَاوِينِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ عَلِمَ الْقَضِيَّةَ.

(হাদীস ও সুন্নাহর) এইসব গ্রন্থ সংকলনের পূর্ববর্তী ইমামগণ পরবর্তীদের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক বেশি জানতেন। ...তাঁদের গ্রন্থ তো ছিল তাঁদের সীনা, =

= যাতে এইসব গ্রন্থ থেকে বহুগুণ বেশি হাদীস ও সুন্নাহ সংরক্ষিত ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত কোনো ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না।

–মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/২৩৯

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. (৭৩৬-৭৯৫ হি.) লিখেছেন–

فإن قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصيحيحة، فلتكن همتك حفظ ألفاظ الكتاب والسنة، ثم الوقوف على معانيها بما قال سلف الأمة وأئمتها، ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم وكلام أئمة الأمصار، ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه، والاجتهاد على فهمه ومعرفته.

وأنت إذا بلغت هذه الغاية فلا تظن في نفسك أنك بلغت النهاية، وإنما أنت طالب متعلم من الطلبة المتعلمين. ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت في زمن الإمام أحمد ما كنت حينئذ معدودا من جملة الطالبين. فإن حدثك نفسك بعد ذلك أنك قد انتهيت أو وصلت إلى ما وصل إليه السلف، فبئس ما رأيت.

তুমি যদি আমার নসীহত কবুল কর এবং সঠিক পথের অনুসরণ কর, তাহলে তোমার প্রথম চেষ্টা যেন হয় কুরআন ও হাদীসের আরবী পাঠ মুখস্থ করা। এরপর সালাফে সালেহীন ও উম্মাহর ইমামগণের ব্যাখ্যা অনুসারে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা। তারপর সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুসলিম বিশ্বের ইমামগণের বক্তব্য ও ফতোয়া মুখস্থ করা। আর (তুমি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হলে) তোমার উচিত, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বাণী ও ফতোয়া অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করা এবং তা বোঝার জন্য পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করা।

এতটুকু ইলম অর্জন হয়ে গেলে ভেবো না, ইলমের সর্বোচ্চ আসনে তুমি অধিষ্ঠিত হয়ে গেছ; বরং এখনো তুমি একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থী। এই পরিমাণ ইলম অর্জন করে তুমি যদি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর যমানায় থাকতে তাহলে তোমাকে ছাত্র হিসাবেও গণ্য করা হতো না।

এই সামান্য ইলম অর্জন করে যদি ভাবতে শুরু কর, তুমি ইলমের শীর্ষে উপনীত হয়ে গেছ বা সালাফের পর্যায়ে পৌঁছে গেছ তাহলে জেনে রাখ, তোমার এই চিন্তা অতিশয় নিকৃষ্ট। –আররাদ্দু আলা মান ইত্তাবাআ গায়রাল মাযাহিবিল আরবাআ : মাজমূউ রাসাইলিল হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী ১/৪৭৭-৪৭৮

তো যে পরিমাণ ইলমের অধিকারী হলে আইম্মায়ে কেরামের সময়ে ছাত্র হিসাবেও গণ্য করা হতো না, সে পরিমাণ ইলমই কি আমরা অর্জন করতে পেরেছি! এ যুগে যারা পূর্বসূরী ইমামগণের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা থেকে বিমুখ হওয়ার দাওয়াত দেন এবং নিজেরা ইজতিহাদ করার দাবি করেন, তারাও কি এই যোগ্যতার ধারে কাছে পৌঁছতে পেরেছেন!

সালাফের ইলম ও প্রজ্ঞা এবং ইখলাস ও তাকওয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, শরীআতের দলীল-প্রমাণ তাঁরা ভালো বুঝেছেন এবং সঠিক বুঝেছেন। তাঁরা যে সুন্দর ও উত্তম ব্যাখ্যা করেছেন এরচেয়ে উত্তম ও সুন্দর ব্যাখ্যার কল্পনাও করা যায় না। তাই আদিল্লায়ে শরঈয়্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাঁরা যে বিধি-বিধান আহরণ করেছেন সে অনুসারে আমরা কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার চেষ্টা করি।

ইমামগণ গবেষণা করে যেসব বিধি-বিধান আহরণ করেন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তাকে 'ফিক্‌হ' বলা হয়। আর মুজতাহিদ ইমামের আহরণকৃত বিধানাবলি ও ফিকহের সমষ্টিকে 'মাযহাব' নামে পরিচয় দেওয়া হয়।

মোটকথা, একজন মুজতাহিদ শরীআতের দলীল-প্রমাণ গবেষণা করে যে বিধান আহরণ করেন তাকে বলা হয় 'ফিক্‌হ'। শরীআতের দলীলাদি থেকে আহরিত সেই ফিক্‌হের সুবিন্যস্ত ও সামষ্টিক রূপকে বলা হয় 'মাযহাব'[৪] আর কোনো মুজতাহিদের ফিকহ ও মাযহাব অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের উপর আমল করাকে বলা হয় 'তাকলীদ করা' বা 'মাযহাব মানা'।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০-১৩৬২ হিজরী) বলেন–

> تقلید کی تفسیر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و ارشادات
> پر عمل کرتے ہیں، اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے،
> کیونکہ وہ ہمارے نزدیک درایت وفقہ میں اعلی پایا پر ہیں۔
>
> তাকলীদ করার অর্থ হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও নির্দেশনাবলির উপর আমল করা, ওই তাফসীরের আলোকে, যা ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহ পেশ করেছেন। কেননা, আমাদের নিকট জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন।[৫]

---

৪. তবে, কখনো কখনো এর বিপরীতও হয়। আহরিত বিধানকে মাযহাব এবং বিধি-বিধানের সমষ্টিকে ফিকহ বলা হয়।

৫. আশরাফুল জাওয়াব, পৃ. ১৬২।

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ (হাফিযাহুল্লাহ ওয়ারাআহু) লেখেন–

> 'একজন ইমাম কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যত আহকাম ও বিধান আহরণ করেছেন সেগুলোকে মাযহাব বলে। এভাবে চার ইমামের চার মাযহাব। যারা মুজতাহিদ নয়, আল্লাহ্ যাদেরকে ইজতিহাদের যোগ্যতা দান করেননি তাদের কর্তব্য হলো ইমামের মাযহাব অনুসরণের মাধ্যমে শরীআতের উপর আমল করা।'[৬]

উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক (হাফিযাহুল্লাহ ওয়ারাআহু)-এর বক্তব্য হলো–

> 'তাকলীদের অর্থ : এই ফিকহী মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের আহকাম জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে সাধারণ পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলে। অর্থাৎ দ্বীন ও শরীআতের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণের শরণাপন্ন হওয়ার যে আদেশ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করেছেন এবং নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে করেছেন, তাদেরই সংকলিত ফিকহ্ থেকে কুরআন হাদীসের হুকুম জেনে সে অনুযায়ী আমল করাকেই পরিভাষায় 'তাকলীদ' বা 'মাযহাব মানা' কিংবা 'ফিকহ্ অনুসরণ' করা বলা হয়।'[৭]

সুতরাং তাকলীদ করা বা মাযহাব মানার অর্থ হলো– যারা কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে সরাসরি বিধি-বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখে না তারা কোনো মুজতাহিদ ইমামের ফিক্হ ও ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা। অর্থাৎ ফিকহ্ ও মাযহাব হলো মাধ্যম। একজন মুকাল্লিদ (মাযহাবের অনুসারী) ফিকহ্ ও মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করে।

---

৬. এসো ফিকহ্ শিখি, পৃ. ২

৭. নির্বাচিত প্রবন্ধ-২, পৃ. ৪১৮-৪১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সালাফের বক্তব্যে তাকলীদ করা ও মাযহাব মানার হাকীকত

তাকলীদ করা ও মাযহাব মানার যে হাকীকত ও স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, এ সম্পর্কে সালাফে সালেহীন তথা আমাদের মহান পূর্বসূরী ইমামগণের বক্তব্যও এমনই। তাঁদের বক্তব্যও প্রমাণ করে, ফিকহ ও মাযহাব হলো কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা তথা কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার মাধ্যম। আর তাকলীদ করা বা মাযহাব অনুসরণ করার অর্থ হলো– মাযহাবের ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করা। এ সম্পর্কে সালাফের কিছু বক্তব্য লক্ষ করুন–

মুজতাহিদের রায় ও মাযহাব হাদীসের ব্যাখ্যা

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. (১১৮-১৮১ হিজরী)-এর বক্তব্য

মুসলিম বিশ্বের এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.। ছিলেন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কুরআন হাদীসের যাবতীয় জ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইমাম বুখারী রহ. (২৫৬ হিজরী) লেখেন–

وَهُوَ أَكْثَرُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْمًا فِيْمَا نَعْرِفُ.

অর্থাৎ আমাদের জানামতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ছিলেন তাঁর সমসাময়িক যুগে কুরআন হাদীসের সবচেয়ে বড় আলেম।[৮]

এই যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বানের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য–

لَا تَقُوْلُوْا: رَأْيُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا: إِنَّهُ تَفْسِيْرُ الْحَدِيْثِ.

আবু হানীফা রহ. যা-কিছু বলেন সেগুলোকে তাঁর নিজস্ব রায় বলো না; বরং বল, এসব হলো হাদীসের তাফসীর।[৯]

---

৮. রাফউল ইয়াদাইন, পৃ. ৯৮ (৮৭)

৯. ফাযায়েলে আবু হানীফা, ইবনে আবিল আউওয়াম, পৃ. ১০১ (১৫০); আবু হানীফা ওয়াআসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ২৯; আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ১৩৩

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর যে ফিকহ ও ফতোয়া রয়েছে, তা হাদীস শরীফেরই ব্যাখ্যা। অতএব আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করার অর্থ হলো আবু হানীফা রহ.-এর তাফসীর ও ব্যাখ্যার আলোকে হাদীস শরীফের উপর আমল করা।

ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. (১১৮-২০৬ হিজরী)-এর বক্তব্য

হাদীসশাস্ত্রের দীপ্তিমান মনীষী ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.। ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (২৩৪ হিজরী) বলেন–

مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَحْفَظَ مِنْ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ.

আমি ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে বড় হাফেযুল হাদীস আর কাউকে দেখিনি।[১০]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. (২৩৩ হিজরী) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! ওয়াকী রহ. থেকে বড় হাফেযুল হাদীস আর দেখেনি।' কিন্তু প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া তামিমী রহ. (১৪২-২২৬ হিজরী) বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.-এর হিফযুল হাদীসের পরিমাণ ছিল ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ. থেকেও বেশি।

তিনি বলেন–

يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَحْفَظُ مِنْ وَكِيْعٍ.

ইয়াযীদ ইবনে হারূন ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ. থেকেও বড় হাফেযুল হাদীস।[১১]

---

১০. তারীখে বাগদাদ ১৬/৪৯৩; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫/২২৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩৫৯; তাহযীবুল কামাল ২৩/২৬৭; তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩১

১১. তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫/২২৮; তারীখে বাগদাদ ১৬/৪৯৩; তবাকাতু উলামাইল হাদীস, ইবনে আবদুল হাদী ১/৪৬০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩৫৯; তাহযীবুল কামাল ২৩/২৬৭; তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩১

শুনুন, আইম্মায়ে কেরামের ইজতিহাদী রায় সম্পর্কে এই শ্রেষ্ঠ হাফেযুল হাদীসের বক্তব্য। আবদুল্লাহ ইবনে আবু লাবীদ রহ. বলেন–

> كُنَّا عِنْدَ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ، فَقَالَ : «الْمُغِيْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: حَدِّثْنَا عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَزِيْدُ: يَا أَحْمَقُ! هٰذَا تَفْسِيْرُ أَحَادِيْثِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاذَا تَصْنَعُ بِالْحَدِيْثِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مَعْنَاهُ؟
>
> আমরা একদিন ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.-এর মজলিসে ছিলাম। তিনি 'মুগীরা বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেছেন' বলে ইবরাহীম নাখায়ীর একটি ফতোয়া উল্লেখ করার ইচ্ছা করেছেন। তখন উপস্থিত একলোক বলল, (ইবরাহীমের ফতোয়া নয়,) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তার কথা শুনে ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. বললেন, আহাম্মক! **ইবরাহীমের ফতোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাখ্যা।** অর্থ-মর্ম না বুঝলে শুধু হাদীস দিয়ে তুমি কী করবে?[১২]

ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.-এর বক্তব্য পরিষ্কার, ইবরাহীম নাখায়ী রহ. ও অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের রায় ও ফিকহ তাঁদের নিজস্ব মত নয়; বরং তা হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাখ্যা, যে ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করাকে তাকলীদ করা বা মাযহাব মানা বলা হয়।

ইমাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.-এর বক্তব্য থেকে আরেকটি বিষয় জানা যায়। আর তা হলো– ইমামগণের ফিকহ ও তাফসীর ব্যতীত হাদীস শরীফের অর্থ-মর্ম সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

---

১২. যায়লুল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা, মোল্লা আলী কারী ১/৪৬০ (উৎস তালাশ)

সুলাইমান ইবনে মিহরান আমাশ রহ. (১৪৮ হিজরী)-এর বক্তব্য

ইমাম আবু মুহাম্মাদ সুলাইমান ইবনে মিহরান আমাশ আলকূফী রহ. হলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী, খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং ইলমুল কিরাত ও ইলমুল ফারাইযের ইমাম। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. বলেন–

كَانَ الْأَعْمَشُ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَحْفَظَهُمْ لِلْحَدِيثِ، وَأَعْلَمَهُمْ بِالْفَرَائِضِ.

আমাশ রহ. ছিলেন ইলমুল কিরাতের শ্রেষ্ঠ ইমাম, যুগের সেরা হাফেযুল হাদীস এবং ইলমুল ফারাইয তথা উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনশাস্ত্রে সর্বাধিক পারদর্শী।[১৩]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তাঁর জীবনীআলোচনা শুরু করেছেন এভাবে–

الْإِمَامُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، شَيْخُ الْمُقْرِئِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ.

ইমাম, শায়খুল ইসলাম, ইলমুল কিরাতের ইমামগণের শায়েখ ও মুহাদ্দিসগণের উস্তায।[১৪]

এই মুহাদ্দিসকুল শিরমণি আমাশ রহ.-এর একটি বক্তব্যেও মাযহাবের হাকীকত বিবৃত হয়েছে। বিশ্‌র ইবনে ওয়ালীদ রহ. বলেন, আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, আমাশ রহ. আমাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি সমাধান বলে দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন–

مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هٰذَا؟

এই মাসআলাটি তুমি কোন্ দলীল থেকে গ্রহণ করেছ?

বললাম–

لِحَدِيثٍ حَدَّثْتَنَاهُ أَنْتَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ لَهُ الْحَدِيثَ.

মাসআলাটির দলীল হচ্ছে ওই হাদীস, যা আপনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলে আমি আমাশ রহ.-এর বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করি।

---

১৩. তারীখে ইবনে মাঈন, দূরী, ৩/ ৩৩৮ (১৮৭৯); তারীখে বাগদাদ ১০/৫; মারিফাতু কুর্‌রাইল কিবার, যাহাবী, পৃ. ৫৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/২২৮; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ১/১১৬

১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/২২৮

তখন আমাশ রহ. বললেন–

يَا يَعْقُوْبُ! إِنِّيْ لَأَحْفَظُ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَ أَبَوَاكَ، فَمَا عَرَفْتُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا الْآنَ.

আবু ইউসুফ! তোমার জন্মের পূর্ব থেকেই এ হাদীসটি আমার মুখস্থ। কিন্তু তুমি বলার আগ পর্যন্ত **হাদীসটির তাফসীর আমি বুঝিনি**।[১৫]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. আমাশ রহ.-কে কী বলেছেন? ইজতিহাদ করে আমাশ রহ.-এর বর্ণনাকৃত হাদীসটি থেকে একটি মাসআলা বলেছেন। এটাকেই আমাশ রহ. বলেছেন, তোমার বলা মাসআলাটি আমার বর্ণিত হাদীসের তাফসীর। তুমি এই মাসআলা বলার আগে আমি হাদীসটির তাফসীর বুঝতে পারিনি। তো ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হাদীস থেকে যে মাসআলা আহরণ করেছেন, আমাশ রহ. সেটাকেই হাদীস ব্যাখ্যা, হাদীসের তাফসীর বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাশ রহ.-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে, মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে হাদীস থেকে যেসব বিধি-বিধান আহরণ করেন, যার পারিভাষিক নাম ফিকহ বা মাযহাব, তা হলো হাদীসের তাফসীর। আর সেই তাফসীর ও ফিকহ অনুসারে আমল করার নামই হলো মাযহাব মানা, তাকলীদ করা।

শাফেয়ী রহ. (১৫০-২০৪ হিজরী)-এর বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ী রহ. বিশ্ব-বিশ্রুত ফকীহ ও মুহাদ্দিস, অনুসৃত চার ইমামের একজন এবং অনেক আলেমের মতে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। মাযহাবের স্বরূপ ও পরিচয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য একেবারে পরিষ্কার। তিনি বলেন–

جَمِيْعُ مَا تَقُوْلُهُ الْأَئِمَّةُ شَرْحٌ لِلسُّنَّةِ، وَجَمِيْعُ السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْآنِ.

অর্থাৎ ইমামগণ যা বলেন সবই সুন্নাহর ব্যাখ্যা। আর সুন্নাহর পুরোটাই হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।[১৬]

---

১৫. ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু, ইবনে আবুল আউওয়াম, পৃ. ৩০৩

১৬. আল-ইতকান, সুয়ূতী ৩/৩২১; আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ১৩০।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট। ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নেই যে, আইম্মায়ে কেরামের মত ও বক্তব্যসমূহ হলো কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা। আর তাঁদের সে ব্যাখ্যা ও বক্তব্য অনুসারে আমল করা বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহর উপরই আমল করা।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. (১৩৫-১৯৮ হিজরী)-এর বক্তব্য

হাদীসশাস্ত্রের বরিত এক সম্রাট ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ.। ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (২৩৪ হিজরী) একাধিকবার বলেছেন–

وَاللهِ! لَوْ أُخِذْتُ، فَحُلِّفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ لَحَلَفْتُ بِاللهِ : أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا قَطُّ أَعْلَمَ بِالحَدِيْثِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ.

আল্লাহর কসম! আমাকে যদি হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে তথা কাবাগৃহের সামনে দাঁড় করানো হয় এবং কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলব, আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর চেয়ে বড় হাদীসবিশারদ আমি আর কখনো দেখিনি।[১৭]

হাদীসশাস্ত্রের এই নক্ষত্রপুরুষের বক্তব্যেও পাওয়া যায় যে, ইমামদের রায় ও মত হলো হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা। তিনি মদীনার ফকীহগণের হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে বলেছেন–

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَكَتَبْتُ تَفْسِيْرَ الحَدِيْثِ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَأَتَيْتُ المَدِيْنَةَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي كُتُبِ قَوْمٍ سَمِعْتُ مِنْهُم.

আমি এখন যা বুঝতে পেরেছি, পূর্বে যদি তা বুঝতে পারতাম তাহলে প্রত্যেকটা হাদীসের পাশে এর তাফসীর (ফিকহ) লিখে রাখতাম এবং যাদের হাদীস ও ফিকহ শুনেছি, মদীনায় গিয়ে তাদের কিতাবাদি অধ্যয়ন করতাম।[১৮]

---

১৭. আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৫২; তারীখু আসমাইস সিকাত, পৃ. ১৪৫ (৭৮৭); তাহযীবুল আসমা ১/৩০৫; তাহযীবুল কামাল ১৭/৪৩৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৯৭-১৯৮; তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৮০-২৮১।

১৮. আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৬২; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/২০২; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/১১৫২।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. এই বক্তব্যে 'তাফসীরুল হাদীস' বা হাদীসের তাফসীর দ্বারা উদ্দেশ্য, হাদীস থেকে আহরিত ফিকহ ও বিধি-বিধান। মদীনার ইমামগণ হাদীস শোনানোর সাথে সাথে হাদীস থেকে আহরণকৃত হুকুম-আহকামও শোনাতেন।[১৯]

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. প্রথমদিকে ওইসব তাফসীর ও ফিকহ সংকলনের প্রতি তেমন বেশি মনোযোগ দিতেন না। শুধু হাদীস লেখতেন, হাদীসের ফিকহ ও তাফসীর লেখতেন না। পরবর্তীতে যখন ফিকহের গুরুত্ব বুঝে এসেছে, তখন আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়! প্রথমে যদি ফিকহের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতাম, তাহলে শুধু হাদীস লেখতাম না; বরং হাদীসের সাথে হাদীসের তাফসীর, হাদীস থেকে আহরণকৃত ফিকহও লেখতাম। তো আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. ফুকাহায়ে কেরামের ফিকহ ও ব্যাখ্যাকে 'হাদীসের তাফসীর' নামে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এই বিদ্বান মনীষীর মতে মুজতাহিদের রায় ও ফিকহ হলো হাদীসের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা। আর মুজতাহিদের রায় ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী শরীআতের বিধান পালন করার নামই তো মাযহাব মানা।

ঈসা ইবনে আবু বকর আইয়ুবী রহ. (৫৭৬-৬২৪ হিজরী)-এর বক্তব্য

ইলমুল ফিকহসহ একাধিক শাস্ত্রের ইমাম সুলতান ঈসা ইবনে আবু বকর আইয়ুবী রহ. বলেন, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে–

إِنَّ الْأَئِمَّةَ لَمْ يَأْخُذُوْا إِلَّا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

মুজতাহিদ ইমামগণ যা-কিছু বলেন, তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস থেকেই আহরণ করেন।[২০]

---

১৯. মদীনার যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম মালেক রহ.-এর হাদীসগ্রন্থ মুয়াত্তা মালেক অধ্যয়ন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। ইমাম মালেক রহ. হাদীসের গ্রন্থ মুয়াত্তা মালেকের মধ্যে বহু স্থানে হাদীস বর্ণনা করার সাথে সাথে হাদীস থেকে আহরণকৃত আহকামও উল্লেখ করেছেন। এগুলোই হলো হাদীসের তাফসীর।

২০. আসসাহমুল মুছীব ফীর্‌রাদ্দি আলাল খাতীব, পৃ. ৮৭

অন্যত্র তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীস থেকে আহরণকৃত বিধানাবলিই মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব। তাঁর বক্তব্য হলো–

إِنَّ الْأُمَّةَ قَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ أَئِمَّةَ الْأَمْصَارِ هُمُ الْيَوْمَ الْأَرْبَعَةُ، فَمَتَى جَاءَ عَنْ أَحَدِهِمْ كَلَامٌ، لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَنْقُوْلٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَوْ مَقِيْسٌ عَلَيْهِمَا، أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا.

মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অনুসরণীয় ইমাম হলেন চারজন। সুতরাং তাঁদের কারও থেকে কোনো বিধান জানা গেলে কারও সন্দেহ হয় না যে, বিধানটি কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট হুকুম অথবা কুরআন-হাদীসের উভয়টি বা কোনো একটি থেকে ইজতিহাদ করে আহরিত হুকুম।[২১]

মাযহাব আল্লাহর আনুগত্যের পদ্ধতি শেখায়

মিসআর ইবনে কিদাম রহ. (১৫৫ হিজরী)-এর বক্তব্য

সুফিয়ান ছাওরী রহ. ও শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সেরা মুহাদ্দিস। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। কিন্তু জেনে অবাক হবেন, তাঁদের ইলম মাপার মীযান বা তুলাদণ্ড ছিলেন মিসআন ইবনে কিদাম রহ.। শু'বা ও সুফিয়ানের মধ্যে হাদীসের বিষয়ে কোনো মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁরা যে মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হতেন, তিনি হলেন মিসআর ইবনে কিদাম রহ.। ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জাওহারী রহ. বলেন–

كَانَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ إِذَا اخْتَلَفَا قَالَا : اذْهَبَا بِنَا إِلَى الْمِيزَانِ مِسْعَرٍ.

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ ও সুফিয়ান ছাওরীর মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে তাঁরা বলতেন, চলুন, বিষয়টির সমাধানের জন্য আমাদের দাঁড়িপাল্লা— মিসআরের কাছে যাই।[২২]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২২. আল-মুহাদ্দিসুল ফাসেল, পৃ. ৩৯৫; তাহযীবুল আসমা ওয়াসসিফাত, নববী ২/৮৯; শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৪৪৭; তাহযীবুল কামাল ৮/৪২২; তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮

শু‘বা ও সুফিয়ানের ইলম মাপার মীযান ও পাল্লা মিসআর ইবনে কিদাম রহ.-এর একটি বক্তব্যেও ফুটে ওঠেছে মাযহাবের স্বরূপ ও পরিচিতি। তাঁর মতে মুজতাহিদ হলো সেতুবন্ধন। মুজতাহিদের রায় ও মাযহাবের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে শেখে, বান্দা ও রবের মধ্যে সম্পর্ক হয়। ইসরাঈল ইবনে ইউনুস রহ. বলেন, মিসআর রহ. বলতেন–

مَنْ جَعَلَ أَبَا حَنِيْفَةَ إِمَامًا فِيْمَا بَينه وَبَينَ اللهِ، رَجَوْتُ أَنْ لَا يَخَافَ، وَلَا يَكُوْن فَرَّطَ فِي الِاحْتِيَاط لِنَفسِهِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার নিজের মধ্যে আবু হানীফাকে রাখবে, আশা করি, তার কোনো ভয় নেই এবং সে (দ্বীনের বিধি-বিধান পালন করার ক্ষেত্রে) সতর্কতা অবলম্বনে কোনো ত্রুটি করেনি।[২৩]

বলার অপেক্ষা রাখে না, আল্লাহ ও নিজের মধ্যে আবু হানীফা রহ.-কে রাখার অর্থ হলো, আবু হানীফার শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করা।

মিসআর রহ.-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, কোনো ইমামের তাকলীদ করার অর্থ ওই ইমামের আনুগত্য করা নয়; বরং তাঁকে মাধ্যম বানানো, তাঁর শিক্ষা ও মাযহাবের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান জানা, এরপর সে অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

মিসআর রহ.-এর বক্তব্য থেকে এ-ও বুঝে আসে যে, মুজতাহিদের ব্যাখ্যা ও মাযহাব অনুসারে আমল করাই আমাদের জন্য নিরাপদ। তিনি বলেছেন, যে আবু হানীফার ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমল করবে, সে শরীআতের বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

মিসআর রহ.-এর মতো আরেকটি মন্তব্য পাওয়া যায় ‘মারওয়া’ শহরের কাযী তাওবা ইবনে সা‘দ ইবনে উসমান মারওয়াযী রহ. থেকেও। আবদুল

---

২৩. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআসহাবিহি, ছয়মারী, পৃ. ৯; তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৯; আল-আনসাব, সামআনী ৬/৬৫; তাবঈযুছ ছহীফা, সুয়ূতী, পৃ. ১১৬; আবু হানীফা ওয়াআসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৩৭।

আযীয ইবনে আবু রিযমা মারওয়াযী রহ. বলেন, কাযী তাওবা ইবনে সা'দ বিচারকার্য পরিচালনার সময় আবু হানীফা রহ.-এর মত অনুসারে ফায়সালা করতেন। তাঁর মত ছাড়া অন্য কারও মত গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন–

حَسْبِيْ هُوَ بَيْنِيْ وَبَين رَبِّي.

আমি আর আমার রবের মধ্যে আবু হানীফাই যথেষ্ট।[২৪]

আবু হানীফা রহ.-কে বান্দা ও রবের মধ্যে রাখার অর্থ হচ্ছে, আবু হানীফা রহ.-এর রায় ও শিক্ষা অনুসারে রবের আনুগত্য করা, তাঁর ফিকহ ও মাযহাব অনুযায়ী রবের বিধি-বিধান পালন করা। সুতরাং ইমামের তাকলীদ করার অর্থ হলো, তাঁর রায় ও ফিকহের আলোকে আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারি করা।

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রহ. (১৯৮ হিজরী)-এর বক্তব্য

মুসলিমবিশ্বের বরেণ্য ও বিখ্যাত এক মনীষী হলেন সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রহ.। বিশেষত হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের সুউচ্চ সিংহাসন দখল করেছিলেন পাকাপোক্তভাবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (২৪১ হিজরী) বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَنِ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

সুন্নাহ সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না থেকে অধিক পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি।[২৫]

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. বলেন–

لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِتَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

কুরআনের তাফসীর বিষয়ে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রহ. থেকে বড় পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।[২৬]

---

২৪. যায়লুল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা, মোল্লা আলী কারী ১/৪৫৬।
২৫. আল-জারহু ওয়াততাদীল ১/৩৩।
২৬. আল-জারহু ওয়াততাদীল ১/৩৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৪৫৮।

এই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরের একটি বক্তব্য থেকে মাযহাবের স্বরূপ স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন–

أَرْفَعُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مَنْزِلَةً مَنْ كَانَ بَيْنَ اللهِ وَعِبَادِهِ وَهُمُ الرُّسُلُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ.

আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন তারা, যারা অবস্থান করেন আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের মাঝখানে। আর তারা হলেন রাসূলগণ এবং তাঁদের পর আলেমগণ।[২৭]

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রহ.-এর বক্তব্য পরিষ্কার যে, উলামায়ে কেরাম হলেন মাধ্যম। তাঁরা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অবস্থান করেন। আল্লাহর বিধিনিষেধ ব্যাখ্যা করে দেন। তাঁদের রায় ও নির্দেশনার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর বন্দেগি করতে শেখে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির পদ্ধতি জানে। এই হলো তাকলীদ করা বা মাযহাব মানার হাকীকত। অর্থাৎ বান্দা আপন রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উলামায়ে কেরামকে মাধ্যম বানাবে, তাঁদের ফিকহ ও রায় অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করবে।

আবু ইউসুফ রহ. (১৮২ হিজরী)-এর বক্তব্য

ইসলামী জ্ঞানআকাশের দীপ্তোজ্জ্বল ও প্রথিতযশা এক প্রতিভা ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আনছারী রহ.। ছিলেন কাযিল কুযাত তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিচারপতি। হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, মাগাযী ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ওযীর ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী রহ. বলেন–

قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ، وَأَقَلُّ مَا فِيهِ الْفِقْهُ، وَقَدْ مَلَأَ بِفِقْهِهِ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.

আবু ইউসুফ আমাদের নিকট আগমন করেন। দেখি, তাঁর মধ্যে যেসব বিদ্যার সমাহার ঘটেছিল এর মধ্যে সবচেয়ে কম হলো ফিকহ। অথচ এই ফিকহের মাধ্যমেই সারা দুনিয়া পূর্ণ করে দিয়েছেন!![২৮]

২৭. সিফাতুস সাফওয়া, ইবনুল জাওযী ২/১৫৫; মিরআতুয যামান ফী তাওয়ারিখিল আয়ান, সিবতে ইবনুল জাওযী ১৩/২৮৭; আল-মাজমূ শারহুল মুহায্‌যাব (মুকাদ্দিমা) ১/১২৪।

২৮. মানাকিবু আবী হানীফা ওয়াছাহিবাইহি, যাহাবী পৃ. ৬৩

আবু ইউসুফ রহ. ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর হাদীসশাস্ত্রের প্রথম উস্তায। আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে–

أَبُوْ يُوْسُفَ أَبْصَرُ النَّاسِ بِالْآثَارِ.

অর্থাৎ আবু ইউসুফ রহ. ছিলেন হাদীস ও আছার সম্পর্কে (সে যুগের) সকল মুহাদ্দিস থেকে অধিক পারদর্শী।[২৯]

ইমাম আবু সা'দ সামআনী রহ. (৫০৬-৫৬২ হিজরী) লেখেন–

لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِيْ زَمَانِهِ، وَكَانَ النِّهَايَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْحُكْمِ وَالرِّئَاسَةِ وَالْقَدْرِ.

অর্থাৎ সে যুগে তাঁর থেকে কুরআন-হাদীসের বড় কোনো আলেম ছিলেন না। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিচারকার্য এবং (ইলমী) নেতৃত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত।[৩০]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৭৪৮ হিজরী) বলেন–

بَلَغَ أَبُوْ يُوْسُفَ مِنْ رِئَاسَةِ الْعِلْمِ مَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ আবু ইউসুফ রহ. কুরআন-হাদীসের ইলমী নেতৃত্বে এত উর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন যে, এর উপরে আর কোনো স্তর নেই।[৩১]

মাযহাব সম্পর্কে এই শীর্ষস্থানীয় আলেমেরও একটি সারগর্ভ বক্তব্য আছে, যাতে মাযহাবের পরিচয় ও হাকীকত অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

কাযী ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম রহ. বলেন–

كَانَ أَبُوْ يُوْسُفَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَجَابَ فِيْهَا، وَقَالَ: هٰذَا قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَمَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ.

ইমাম আবু ইফসুফ রহ.-এর নিকট কোনো মাসআলা জানতে চাইলে তিনি এর সমাধান পেশ করতেন এবং বলতেন, এটা আবু হানীফার মত। এরপর বলতেন, **যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং নিজের মধ্যে আবু হানীফাকে রাখবে, সে আপন দ্বীনের বিধান পালন করার ক্ষেত্রে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।**[৩২]

---

২৯. আল-আনসাব, সামআনী ৩/৪৯৭; আততালীকুল মুমাজ্জাদ পৃ. ২৯; আবু হানীফা ওয়াআসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৯৭

৩০. আল-আনসাব ৪/৪১৩; আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৯৬

৩১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/৪৭১

৩২. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, ছায়মারী, পৃ. ৮৩

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য স্পষ্ট যে, আবু হানীফা রহ. ও অন্যান্য ইমামগণের অবস্থান হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে। আইম্মায়ে কেরাম আল্লাহপ্রদত্ত বুঝ ও মেধা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেন, এরপর তা বান্দার কাছে পৌঁছে দেন। তাঁরা হলেন আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মাধ্যম। সহজ কথায়, মুজতাহিদ ইমামগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আল্লাহর বিধি-বিধান সাধারণ মানুষের সামনে পেশ করেন। সাধারণ মানুষ সে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করে। এটাই হলো মাযহাবের হাকীকত।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর আরেকটি বক্তব্য লক্ষ করুন। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম। তা সত্ত্বেও আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। আবার ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকার কারণে প্রত্যেকটি মাসআলার দালীল তালাশ করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন। আর যেসব মাসআলায় দলীল পেতেন না, সেসবের ক্ষেত্রে সরাসরি আবু হানীফার তাকলীদ করতেন। তিনি বলেন–

> اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَعْمَلْ إِلَّا بِمَا عَرَفْتُهُ مِنْ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَمَا لَا أَعْرِفُهُ مِنْهُمَا جَعَلْتُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِيْهِ أَبَا حَنِيْفَةَ، لِعِلْمِيْ بِهِ.
>
> হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি কেবল ওই বিষয়েই আমল করেছি, যা আমি আপনার কিতাব এবং আপনার নবীর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। আর যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারিনি **সেসব ক্ষেত্রে আপনার ও আমার মধ্যে আবু হানীফাকে রেখেছি**। কেননা, তাঁর ব্যাপারে আমার জানা আছে।[৩৩]

এই বক্তব্যেও পরিষ্কার এসেছে, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ইজতিহাদী বিষয়ে আবু হানীফাকে মাধ্যম বানিয়েছেন, তাঁর মত অনুযায়ী আমল করেছেন। এটাই মাযহাব। যাদের ইজতিহাদের

৩৩. আসসাহমুল মুছীব ফির্‌রাদ্দি আলাল খতীব, পৃ. ৬৩, ৫৭-৫৮

যোগ্যতা নেই, তারা কোনো ইমামকে মাধ্যম বানাবে। অর্থাৎ তাঁর ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুসারে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম পালন করবে।

আলী ইবনুল মাদীনী (২৩৪ হিজরী) রহ.-এর বক্তব্য

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ইলালুল হাদীসশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি ইমাম আহমাদ রহ.-এর তাকলীদ করতেন এবং বলতেন–

اِتَّخَذْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ إِمَامًا فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَقْوٰى عَلٰى مَا يَقْوٰى أَبُو عَبْدِ اللهِ؟

আমি আমার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছি। কেননা ইমাম আহমদ যেভাবে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখেন আর কে এমনভাবে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখে?[৩৪]

আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্য পরিষ্কার যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আহমাদ রহ.-কে মাধ্যম বানিয়েছেন। তার ব্যাখ্যা ও ফিকহের আলোকে আল্লাহর বিধান মান্য করেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী)-এর বক্তব্য

বর্তমানের সালাফী ভাইগণ যেসব আলেমের নাম খুব ব্যবহার করে থাকেন, সে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.। আসুন, জেনে নিই, মাযহাব ও আইম্মায়ে কেরাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী? তিনি বলেন–

> أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ وَسَائِلُ وَطُرُقٌ وأَدِلَّةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الرَّسُوْل، يُبَلِّغُوْنَهُمْ مَا قَالَهُ، وَيُفَهِّمُوْنَهُم مُرَادَهُ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِمْ وَاسْتِطَاعَتِهِمْ.
>
> অর্থাৎ উম্মাহর অনুসৃত ইমামগণ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন পথ ও পন্থা এবং একাধিক সূত্র ও পথপ্রদর্শক। ইমামগণ সাধারণ মানুষের কাছে

---

৩৪. কিতাবুল মাজরুহীন, ইবনে হিব্বান (মুকাদ্দিমা) ১/৫৩

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পৌঁছে দেন এবং সাধ্য মোতাবেক ইজতিহাদ করে নবীজীর কথার মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেন।[৩৫]

বোঝা গেল, ইমাম আবু হানীফা রহ.সহ উম্মাহর অন্যান্য ইমামগণ ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত করে মানুষকে যে হুকুম-আহকাম জানিয়ে গেছেন, তা মূলত কুরআন-হাদীসেরই ব্যাখ্যা। কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যে তাফসীর তাঁদের বুঝে এসেছে, উম্মতকে তাঁরা সে ব্যাখ্যা ও তাফসীর মোতাবেক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। উম্মত তাঁদের সেই ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুসরণ করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে আসছে। এটাই হলো তাকলীদ করা বা মাযহাব মানা।

❋ ❋ ❋

---

৩৫. মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/২২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাযহাবের হাকীকত : দৃষ্টান্তের আলোকে

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আশা করি মাযহাবের পরিচয় ও হাকীকত স্পষ্ট হয়েছে। তবে উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যেকোনো বিষয় অধিক স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। তাই মাযহাবের পরিচয়টা আরও সহজে বোঝার জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে :

কুরআনে কারীম থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত

প্রথম দৃষ্টান্ত : আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায়, তাদের সে স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে (ইদ্দত পালন করবে)।[৩৬]

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَالّٰٓـِٔىْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতু আসার কোনো আশা নেই, তোমাদের যদি (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহ হয়, তবে (জেনে রাখো) তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। এবং এখনো পর্যন্ত যারা ঋতুমতীই হয়নি, তাদেরও (ইদ্দত এটাই)। **আর যারা গর্ভবতী, তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ**

---

৩৬. সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৩৪

হলো তাদের সন্তান প্রসব। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধান করে দেন।[৩৭]

যে নারী গর্ভবর্তী এবং তার স্বামী ইনতেকাল করেছে তার ইদ্দত পালনের বিধান সম্পর্কে আয়াতদুটি বাহ্যত পরস্পরবিরোধী।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, আর দ্বিতীয় আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে, গর্ভবতী (হামেলা) নারীর সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ইদ্দতের মধ্যে থাকবে। জটিলতা হলো– কোনো নারী যদি গর্ভবতী হয় এবং তার স্বামী মারা যায় তখন সে কীভাবে ইদ্দত পালন করবে? স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার জন্য মাস গণনা করে ইদ্দত পালন করা প্রথম আয়াতের নির্দেশ, আর গর্ভবতী হওয়ার কারণে প্রসবের ইদ্দত পালন করা দ্বিতীয় আয়াতের নির্দেশ। এখন এই মহিলা ইদ্দতের জন্য কোন্ মেয়াদ গ্রহণ করবে? মাস গণনা করে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, নাকি প্রসবের অপেক্ষায় থাকবে এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতের মধ্যে অবস্থান করবে?

ইমাম আবু হানীফা রহ. শরীআতের অন্যান্য দলীলের আলোকে আয়াত দুটির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রথম আয়াতের সম্পর্ক হলো হামেলা নয় এমন নারী সম্পর্কে, আর দ্বিতীয় আয়াতের সম্পর্ক হামেলা নারীর সম্পর্কে। যে নারীর গর্ভে সন্তান নেই তার যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে সে প্রথম আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক মাস গণনা করে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু যে নারী হামেলা, যার গর্ভে সন্তান আছে, তার যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে সে দ্বিতীয় আয়াতের বিধান অনুসারে প্রসবের মেয়াদ অনুযায়ী ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর মৃত্যুর পর যেদিন তার সন্তান প্রসব হবে, সেদিন তার ইদ্দত শেষ হবে। তাই প্রথম আয়াতের বিধানটি ব্যাপাকভাবে যদিও হামেলা নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু সে তাতে শামিল নয়। তার বিধান হলো দ্বিতীয় আয়াতে।

এ হলো এই দুইখানা আয়াত সম্পর্কে আবু হানীফা রহ.-এর ইজতিহাদ ও বিশ্লেষণ। আর এ ব্যাখ্যাই হলো আয়াতদু'টির ক্ষেত্রে আবু হানীফার

---

৩৭. সূরা তালাক (৬৫), আয়াত ৪

ফিকহ। আমরা তার সে ফিকহ ও বিশ্লেষণ অনুসারে আয়াতদ্বয়ের উপর আমল করি। এভাবে আবু হানীফার ব্যাখ্যা ও ফিকহ অনুযায়ী কুরআনের বিধান পালন করার নামই আবু হানীফার তাকলীদ করা বা তাঁর মাযহাব মানা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ

যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতীক্ষায় রাখবে (ইদ্দত পালন করবে)।[৩৮]

'কুরু' শব্দের দুই অর্থ : (১) হায়েয, ঋতুস্রাব। (২) তুহর তথা দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময়। এই আয়াতে কোন্ অর্থ উদ্দেশ্য, কুরআনেও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি এবং হাদীসেও তা নির্ধারণ করা হয়নি। ইমাম আবু হানীফা রহ. একাধিক সাহাবীর বক্তব্য ও শরীআতের অন্যান্য দলীলকে সামনে রেখে তাফসীর করেছেন, আয়াতটিতে কুরু দ্বারা উদ্দেশ্য হায়েয। এই তাফসীর হলো আয়াতটির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার ফিকহ। আর আবু হানীফা রহ.-এর সে ফিহক ও তাফসীর অনুযায়ী এই আয়াতের উপর আমল করার নাম হলো তাঁর তাকলীদ করা বা তাঁর মাযহাব মানা।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : হাজীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ

আর তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেলো তখন শিকার কর।[৩৯]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা হাজীদেরকে ইহরামের পর শিকার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কোনো বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করলে তা পালন করা জরুরি হয়ে যায়। ইহরাম খোলার পর শিকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয়, হজ্জব্রত সমাপ্ত হলে হাজীদের উপর প্রাণী শিকার করা আবশ্যক।

কিন্তু আইম্মায়ে কেরাম শরীআতের উসূল ও মূলনীতির আলোকে আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশের ব্যাখ্যা করেছেন, এই আদেশটি বাধ্যতামূলক নয়,

---

৩৮. সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২৮

৩৯. সূরা মায়েদা (৫) আয়াত ২

বরং অনুমতিমূলক। অর্থাৎ হজ্জের ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ ছিল। হজ্জ ও ইহরাম শেষ হলে সে নিষেধাজ্ঞা আর বাকি থাকবে না। তখন শিকার করা মুবাহ। কেউ ইচ্ছা হলে শিকার করতে পারবে, না করলে কোনো অসুবিধা নেই। এতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। ইমামগণের এই ব্যাখ্যা হলো আয়াতটির ব্যাখ্যা ও ফিক্হ। আর তাঁদের সে ফিকহ ও ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের বিধান মান্য করাকে বলা হয় তাকলীদ করা।

হাদীস শরীফ থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত

প্রথম দৃষ্টান্ত : উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

যে সূরা ফাতেহা পড়বে না, তার নামায হবে না।[৪০]

হাদীসটি থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায বাতিল হয়ে যাবে, এই নামাযের কোনো ধর্তব্য নেই। তাই ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অন্য হাদীসে এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। আবু মূসা আশআরী রাযি. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا.

তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে, ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম যখন কেরাত পড়বে তোমরা তখন নীরব থাকবে।[৪১]

আরেক হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

---

৪০. সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৪

৪১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৯৭২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৯৭৩।

ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরা তখন তাকবীর বলবে। ইমাম যখন পাঠ করবে, তোমরা তখন চুপ থাকবে।[৪২]

প্রথম হাদীসের বিপরীত এই দুই হাদীসে ইমাম কেরাত পড়ার সময় মুক্তাদিকে কেরাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তদ্রূপ, কুরআনে কারীমের নির্দেশ হলো–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

যখন কুরআন পাঠ করা হয়, মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।[৪৩]

আয়াতেও কুরআন পাঠ করার সময় চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইমাম যখন সূরা ফাতেহা পাঠ করতে মুক্তাদি চুপ থাকবে, কেরাত পড়বে না।

তো কুরআনের আয়াত এবং আবু মূসা আশআরী রাযি. ও আবু হুরায়রা রাযি.-এর হাদীসদুটি থেকে বোঝা যায়, ইমাম কেরাত পড়ার সময় মুক্তাদি চুপ থাকবে, কেরাত পড়বে না। আর উবাদা ইবনে সামেত রাযি.-এর হাদীস থেকে বুঝে আসে, ইমাম কেরাত পড়লেও মুক্তাদিকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। বাহ্যত দেখা যাচ্ছে, প্রথমোক্ত হাদীসটি কুরআনের আয়াত এবং শেষোক্ত হাদীসদুটির সাথে সাংঘর্ষিক।

আবু হানীফা রহ. বাহ্যিক বৈপরীত্যপূর্ণ দলীলগুলোর মাঝে সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেন, অন্য হাদীসে এসেছে–

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

যার ইমাম আছে, তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত।[৪৪]

---

৪২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৭২১৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬০৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৯২১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৪৬

৪৩. সূরা আরাফ (৭), আয়াত ২০৪

৪৪. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৮০০, ৩৮২৩; মুসনাদে আহমাদ, ১৪৬৪৩; আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ১০৫০; মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী : ফতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম ১/৩৪৬ =

আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্য হলো, হাদীসটিতে বলা হয়েছে, জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে ইমামই মুক্তাদির পক্ষ থেকে তার কেরাত আদায় করে নেন। তাই ইমামের পেছনে মুক্তাদিকে আর সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে না। কারণ, ইমামের পাঠই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।

আবু হানীফা রহ. এই হাদীস এবং আরও কিছু দলীলের আলোকে কুরআনের আয়াত ও উল্লিখিত হাদীসসমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, প্রথম হাদীসটি ইমাম ও মুনফারিদ (একা নামায আদায়কারী)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর কুরআনের আয়াত এবং শেষোক্ত হাদীসদুটি মুক্তাদির সাথে সম্পৃক্ত। তাই প্রথম হাদীসের বিধান অনুসারে ইমাম ও মুনফারিদ নিজে সূরা ফাতেহা পড়বে এবং কুরআনের আয়াত ও পরের হাদীসদুটির হুকুম অনুযায়ী মুক্তাদি নিজে সূরা ফাতেহা পড়বে না; বরং নিশ্চুপ থাকবে। তার পক্ষ থেকে ইমাম সূরা ফাতেহা পড়বে।

সুতরাং 'সূরা ফাতেহা না পড়লে সালাত হবে না' হাদীসটির মর্ম হলো– মুসল্লী যদি নিজে কেরাত না পড়ে এবং তার পক্ষ থেকেও কেরাত না পড়া হয়, তাহলে তার সালাত হবে না। জামাতের নামাযে মুসল্লীর পক্ষ থেকে ইমাম কেরাত আদায় করে নেন। তাই মুসল্লীকে আর কেরার পড়তে হবে না।

এই ব্যাখ্যা হলো– উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ ও রায়। আর সেই রায় ও ফিকহের আলোকে এসব হাদীসের উপর আমল করা হলো আবু হানীফার তাকলীদ করা বা মাযহাব মানা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : 'রাফয়ে ইয়াদাইন' মানে নামাযের মধ্যে কান পর্যন্ত হাত ওঠানো। নামাযের মধ্যে কয় জায়গায় রাফয়ে ইয়াদাইন করা হবে, এ সম্পর্কে হরেক রকমের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী। হাদীস শরীফে একবার থেকে শুরু করে নামাযের

= হাদীসটির সনদ সহীহ। বহু মুহাদ্দিস এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক ওঠা-নামায় রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা পাওয়া যায়। কয়েকটি সুরত লক্ষ করুন–

১. রাফয়ে ইয়াদাইন না করা, অর্থাৎ শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা, অন্য কোথাও হাত না ওঠানো।
দ্রষ্টব্য : জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫৭[৪৫]; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৪৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১০৫৮

২. দুই জায়গায় তথা তাহরীমার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময়।
দ্রষ্টব্য : সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৬৬[৪৬]; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৪২; মুয়াত্তা মালেক, হাদীস ২০১

৩. তিন জায়গায় তথা উল্লিখিত দুই স্থানে এবং রুকুতে যাওয়ার সময়।
দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৬, ৭৩৭[৪৭]; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯০, ৩৯১

৪. চার জায়গায়, অর্থাৎ উক্ত তিন স্থান এবং দুই রাকাত শেষ করে তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়ানোর সময়।
দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৯[৪৮]; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৪৪; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০৪, ৩৪২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৬২, ৮৬৪

---

৪৫. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

৪৬. روى ابن ماجه عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ.

৪৭. روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

৪৮. روى البخاري عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫. সাজদায় যাওয়ার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা।
দ্রষ্টব্য : সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৬০[৪৯]; মুজামে আওসাত, তবারানী, হাদীস ১৬; সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ১১২১
অথচ কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, সাজদায় যাওয়ার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন না করার কথা।
দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৮[৫০]; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১০৮৮

৬. সাজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা।
দ্রষ্টব্য : সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭২৩[৫১], ৭৪০; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১৪৩, ১০৮৫, ১০৮৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ২৪৪৯; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৩৭৫২

---

৪৯. روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ.
وروى الطبراني عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ، وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.
وروى الدارقطني عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ.

৫০. روى البخاري عن عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

৫১. روى أبو داود عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ " إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
روى النسائي: عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

এর বিপরীত কোনো কোনো হাদীসের বক্তব্য হলো, ওই সময় রাফয়ে ইয়াদাইন না করা।
দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯০[৫২]

৭. নামাযের প্রত্যেক ওঠানামায় রাফয়ে ইয়াদাইন করা।
দ্রষ্টব্য : শারহু মুশকিলিল আছার, তহাবী, হাদীস ৫৮৩১[৫৩]

এভাবে রাফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অগ্রগণ্য মত হলো– হাদীসে উল্লিখিত সব সুরতই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তিনি একসময় এক জায়গায় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন, অন্য সময় আরেক জায়গায় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। কখনো কম ক্ষেত্রে হাত তুলতেন, কখনো বেশি ক্ষেত্রে হাত তুলতেন। কোনো সময় এক স্থানে হাত ওঠাতেন, আরেক সময় সেই স্থানে হাত ওঠাতেন না। তাই সব সুরতই জায়েয। তবে, এইসব পদ্ধতির মধ্যে উত্তম হলো প্রথম পদ্ধতি : রাফয়ে ইয়াদাইন না করা অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হাত না ওঠানো।

কারণ এটিই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সময়ের আমল। আর অন্যান্য পদ্ধতি হলো কোনো কোনো সময়ের আমল। এর দলীল হলো, নবীজীর ইন্তেকালের পর অনেক সাহাবায়ে কেরাম রাফয়ে ইয়াদাইন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হাসান বছরী রহ.-কে রাফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

---

৫২. روى مسلم عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

وقد مرَّ في التعليق السابق رواية البخاري: وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

৫৩. روى الطحاوي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের আমল সম্পর্কে বলেছেন–

فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ.

তাঁদের কেউ রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, কেউ তা বর্জন করেছেন।[৫৪]

নবীজীর পর যারা রাফয়ে ইয়াদাইন বর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন উমর ফারূক রাযি., আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। তাঁরা নবীজীকে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেও দেখেছেন, না করতেও দেখেছেন।[৫৫] এরপর না করার আমল গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁরা লক্ষ করে দেখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো রাফয়ে ইয়াদাইন করলেও অধিকাংশ সময় করতেন না।

---

৫৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭২৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৮৬২; আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম ৪/৯১-৯২; আততামহীদ ৯/২২৭

৫৫. এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, তাঁরা হয়তো নবীজীর রাফয়ে ইয়াদাইন করা দেখেননি। না, এমন বলার অবকাশ নেই। কেননা, তাঁরা হলেন বিজ্ঞ ও প্রবীণ সাহাবী, যাঁদের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হলো, তাঁরা তাঁর সাথের কাতারে নামাযে দাঁড়াবে, যেন নবীজী যেভাবে নামায পড়েন তাঁরা তা শিখতে পারেন। দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৭৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৯৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭২৫৮; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯৫

অন্য হাদীসে এসেছে, এসব সাহাবীদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা আমার পেছনে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে। দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৭৪; জামে তিরমিযী, হাদীস ২২৮

রাফয়ে ইয়াদাইন একটি প্রকাশ্য আমল। যে-ই নবীজীর নামাযের প্রতি লক্ষ করবে তার চোখেই তা ভেসে ওঠবে। এই সকল সাহাবী নামায ফরয হওয়ার পর থেকে নবীজীর ইনতেকাল পর্যন্ত নামায শেখার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর নামায পর্যবেক্ষণ করেছেন। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই, তাঁরা নবীজীর রাফয়ে ইয়াদাইন করার আমলটি দেখেছেন। দেখুন না, আলী রা. থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। দ্রষ্টব্য : সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৪৪; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৬৪

কিন্তু আলী রাযি. নিজে তা বর্জন করেছেন। দ্রষ্টব্য : মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, আছার ২৪৫৭; শারহু মাআনিল আছার, তহাবী, হাদীস ১৩৫৩; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/৮০

যেহেতু নবীজীর নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করার চেয়ে না করার আমল ছিলো বেশি[৫৬], তাই উমর রাযি., আলী রাযি. ও ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মতো বড় বড় সাহাবী রাফয়ে ইয়াদাইনের আমল তরক করেছেন এবং না করার আমল গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে রাফয়ে ইয়াদাইন করার আমল খুলাফায়ে রাশেদীন, ইবনে মাসউদ রাযি. বা তাঁদের স্তরের কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। তাই হানাফী মাযহাবের বক্তব্য হলো, রাফয়ে ইয়াদাইন করা জায়েয হলেও, তা না করাই উত্তম।

এ হলো রাফয়ে ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যা। আর এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত হাদীসসমূহের আমল করার নামই মাযহাব মানা বা তাকলীদ করা।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার আছে, যাবৎ না তারা বিচ্ছেদ হবে। তারা যদি সত্য বলে এবং (পণ্য ও মূল্যের দোষ) স্পষ্ট করে দেয় তাহলে বেচাকেনায় বরকত হবে, আর যদি মিথ্যা বলে এবং (দোষ) গোপন রাখে তাহলে কেনাবেচার বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।[৫৭]

হাদীসটিতে বলা হয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ না বিচ্ছেদ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু পরস্পর বিচ্ছেদ হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল করার এখতিয়ার বাকি থাকবে না। এখানে 'বিচ্ছেদ হওয়া'র দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এর মধ্যে দুই অর্থের সম্ভাবনা আছে :

---

৫৬. বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী রহ., আমের শা'বীর মতে যিনি হলেন মক্কা, মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, তিনি বলেছেন, নবীজী একবার রাফয়ে ইয়াদাইন করে থাকলে অন্তত পঞ্চাশবার তা করেননি। দ্রষ্টব্য : শারহু মাআনিল আছার, হাদীস ১৩৫১; শারহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ৫৮২৬

৫৭. সহীহ বুখারী, হাদীস ২১১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৩২

এক. কথার দ্বারা বিচ্ছেদ হওয়া। অর্থাৎ প্রস্তাব প্রদান ও প্রস্তাব গ্রহণের পর ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাওয়া। একজন প্রস্তাব করেছে, অপরজন গ্রহণ করেছে, এরপর তারা অন্য কথা শুরু করেছে। এভাবে চুক্তির কথা শেষ করে অন্য কথায় চলে যাওয়া। এই অর্থ গ্রহণ করলে হাদীসটির উদ্দেশ্য হবে, ক্রয়বিক্রয়ের পর যতক্ষণ না অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তি রহিত করা যাবে। কিন্তু যদি অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়ে যায়, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা কারও জন্য এই চুক্তি রহিত করার অধিকার থাকবে না।

দুই. শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ একজনের প্রস্তাব এবং অন্যজনের গ্রহণের পর যে মজলিসে চুক্তি হয়েছে ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন বা উভয়ে সে মজলিস থেকে সরে অন্যত্র চলে যাওয়া। এই অর্থ অনুযায়ী হাদীসটির মর্ম হবে, কেনাবেচা চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার মজলিসে বসে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের জন্য চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু কেউ যদি সেখান থেকে ওঠে যায়, তাহলে আর কারও জন্য এ অধিকার বলবৎ থাকবে না।

এখন এই হাদীসে 'বিচ্ছেদ হওয়া'র দুই সম্ভাবনা থেকে কোনটা উদ্দেশ্য? আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বিচ্ছেদ হওয়া, না স্থান ত্যাগ করে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া? হাদীসটি এ সম্পর্কে নীরব। ইমাম আবু হানীফা রহ. শরীআতের অন্যান্য দলীলের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে বিচ্ছেদ হওয়ার দ্বারা শারীরিক বিচ্ছেদ নয়, কথাবার্তার বিচ্ছেদ উদ্দেশ্য। তাই চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পর ক্রেতা বা বিক্রেতা যদি অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু করে দেয়, তাহলে চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এখন আর কেউ তা রহিত করতে পারবে না, যদিও উভয়ে চুক্তি সম্পন্ন করার স্থানেই বসে থাকে।

এ হলো হাদীসটি সম্পর্কে আবু হানীফা রহ.-এর বিশ্লেষণ। আর এ বিশ্লেষণই তাঁর ফিকহ, তাঁর মাযহাব।

অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, হাদীসটিতে শারীরিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য। তাই বেচাকেনার পর যতক্ষণ চুক্তির মসলিসে বসে থাকবে, ততক্ষণ চুক্তি বাতিল করার এখতেয়ার থাকবে, যদিও তারা ভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু করে দেয়।

এ হলো হাদীসটি সম্পর্কে শাফেয়ী রহ.-এর রায়। আর এ রায়ই তাঁর ফিকহ, তাঁর মাযহাব।

মোটকথা, এভাবে কোনো মুজতাহিদের ব্যাখ্যা ও ফিকহ অনুসারে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করাই হলো তাকলীদ করা।

মাযহাব যেভাবে কুরআন-হাদীস উভয়টির ব্যাখ্যা করে

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং 'রিবা' তথা সুদকে হারাম করেছেন।[৫৮]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে রিবা হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। রিবা অর্থ : বেশি, বৃদ্ধি, অতিরিক্ত। আয়াতটিতে 'রিবা' বলে কী বোঝানো হয়েছে? কোন্ বেশি, কোন্ অতিরিক্ত হারাম করা হয়েছে? তা স্পষ্ট নয়। এই আয়াত বা অন্য কোনো আয়াতে রিবা বা অতিরিক্ত বলে কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এর ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় হাদীস শরীফে। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا.

সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা যাবে, ওযন করে, সমান সমান হলে। রুপার বিনিময়ে রুপা বিক্রি করা যাবে, ওযন করে, সমান সমান হলে। যে বেশি দিল বা বেশি নিল সে রিবা করল।[৫৯]

---

৫৮. সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৭৫

৫৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৮

উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বলেন, আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.

সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বেচা-কেনা করতে হলে সমান সমান ও হাতে-হাতে (নগদ) করতে হবে। যে বেশি দিল বা বেশি নিল সে রিবা করল। রিবা গ্রহণকারী ও রিবা দানকারী (গুনাহের ক্ষেত্রে) উভয়ই সমান।[৬০]

এই ধরনের অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে মোট ছয়টা জিনিসের মধ্যে রিবা হওয়ার কথা এসেছে। অথচ কুরআনে বর্ণিত রিবা তো শুধু ছয় জিনিসের মধ্যে সীমিত নয়। তাহলে এসব হাদীসের উদ্দেশ্য কী? এবং রিবার ইল্লত (কারণ) কী, যার আলোকে স্পষ্ট হবে যে, এসব জিনিসের মধ্যে রিবা হবে আর ওইসব জিনিসের মধ্যে রিবা হবে না? হাদীস শরীফে তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। তাই বিরা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে এখতেলাফ হয়েছে। সুতরাং হাদীস শরীফও বিরা-এর উদ্দেশ্য ও পরিচয় পূর্ণরূপে স্পষ্ট করেনি। তবে এসব হাদীসে রিবার আলোচনা এমনভাবে করা হয়েছে যে, মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে তা থেকে রিবা-এর উছূল ও মূলনীতি বের করতে পারেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর গবেষণা অনুসারে এসব হাদীসের উদ্দেশ্য হলো– পণ্য ও মূল্য যদি এক প্রকারের এক ধরনের বস্তু হয় এবং কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাহলে রিবা হবে। তিনি বলেন, হাদীসের মধ্যে সোনার পরিবর্তে সোনা, রুপার পরিবর্তে রুপা, গমের পরিবর্তে গম, জবের পরিবর্তে জব, লবণের পরিবর্তে লবণ ও খেজুরের পরিবর্তে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক শ্রেণির জিনিস একটার বদলে

৬০. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৭

অন্যটা বিক্রি নিষেধ করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, রিবা হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, এক ধরনের জিনিস বিক্রি করা।

দ্বিতীয়ত, হাদীস শরীফে যে ছয় জিনিসের কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে সোনা ও রূপা হলো ওযনীদ্রব্য, আর বাকি চার জিনিস হলো পরিমাপদ্রব্য। অর্থাৎ নবীজীর যমানায় সোনারূপার লেনদেন হতো ওযন করে, আর বাকিগুলোর লেনদেন করা হতো পরিমাপযন্ত্রে ওঠিয়ে। বোঝা গেল, রিবা হয় এমনসব জিনিসের মধ্যে যা ওযন বা পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ রিবার দ্বিতীয় শর্ত হলো, লেনদেনের বস্তু ওযনী বা পরিমাপদ্রব্য হওয়া।

সুতরাং রিবা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতিয়মান হয়, যেখানে উল্লিখিত দুই শর্ত পাওয়া যাবে, সেখানে কমবেশি করে বেচাকেনা করলে রিবা হবে। পণ্য ও মূল্য যদি এক জাতের জিনিস হয় এবং তা পরিমাপযোগ্য বা ওযনযোগ্য হয় তাহলে হেরফের করে লেনদেন করলে রিবা হবে। তাই ২ মন ধানের পরিবর্তে ৩ মন ধান বিক্রি করলে রিবা হবে।

আর যদি দুই শর্তের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে তথা চুক্তিদ্রব্য যদি এক প্রকারের বস্তু না হয় কিংবা মূল্য ও পণ্যের কোনো একটি ওযনী ও পরিমাপদ্রব্য না হয়, তাহলে হেরফের করে লেনদেন করা যাবে। রিবা হবে না। অতএব ২ বিগা জমির বিনিময়ে ৩ বিগা জমি বিক্রি করলে বিরা হবে না। ১০ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ১২ গজ কাপড় বিক্রি করলে হারাম হবে না।

এভাবে আবু হানীফা রহ. কুরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধকৃত রিবার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা হলো তাঁর ফিকহ। আর তাঁর এ ব্যাখ্যা ও ফিকহের আলোকে কুরআন হাদীসে নিষিদ্ধ রিবা থেকে বেঁচে থাকার নাম হলো তাকলীদ করা বা মাযহাব অনুসরণ করা। সুতরাং তাকলীদ করার অর্থ হলো– মুজতাহিদের ফিকহ ও নির্দেশনার আলোকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উম্মাহর প্রতি ফিকহ ও মাযহাবের অবদান

মুজতাহিদগণের মাযহাব বহু দিক থেকে উম্মাহর খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এখানে সহজ কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. বহু আহকাম কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, কিন্তু এসব বিধান একাধিক কিতাবে, বরং একই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলোকে একত্র করে সুন্দর কাঠামো তৈরি করা সাধারণ মানুষের জন্য দুরূহ বিষয়। মাযহাবের ইমাম ইজতিহাদ, গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেসব বিষয়কে সাজিয়ে সুবিন্যস্তরূপে উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি।

আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত নামাযের মাসআলাসমূহ আপনি নিজে যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংগ্রহ করতে চান, তাহলে আপনাকে এর জন্য একদুটি বা দশ বিশটি নয়, বরং শত কিতাবের শরণাপন্ন হতে হবে এবং সেগুলোকে খুব গভীর ও নিখুঁতভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন করে দলীল একত্র করার পর নামাযের পূর্ণ রূপটি তৈয়ার করতে আপনাকে আরও অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হবে। এত সাধনার পরও হয়তো নামাযের রূপটি এত সুন্দর করে উপস্থিত করতে পারবেন না যেমন সুন্দরভাবে আপনি পেয়ে যাবেন মাযহাবের ছোট্ট একটি পুস্তিকায়। এভাবে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিষয়াবলির বিন্যস্তকরণ ও পূর্ণ কাঠামো গঠনকরণের ক্ষেত্রে আমরা মাযহাবের দ্বারস্থ হই।

২. কুরআন-সুন্নাহয় সাধারণত শুধু বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। এসবের স্তর নির্ণীত হয়নি। কোনো আমল আদায়ের জন্য সে আমলের বিভিন্ন অংশকে ফরয, ওয়জিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা, সুন্নাতে যায়েদা, মুস্তাহাব, মুবাহ

এবং হারাম, মাকরূহে তাহরীমী, মাকরূহে তানযীহী ইত্যাদি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এসবের বিবরণ আসেনি। মাযহাবের কল্যাণে বিধি-বিধানের এই শ্রেণিবিন্যাস আমরা সহজেই জানতে পারি।

ছোট্ট ও সহজ একটি উদাহরণ পেশ করছি, হাদীস শরীফে এসেছে, নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরিমার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সানা' পড়তেন। কিন্তু সানা পড়ার হুকুম কী? ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, না মুবাহ? কেউ ভুলে সানা না পড়লে তার নামাযের কী অবস্থা হবে? নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, না কিছুটা ত্রুটির সাথে আদায় হয়ে যাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এর দায়িত্ব তিনি উলামায়ে কেরামের কাঁধে অর্পণ করেছেন। তাঁরা ইজতিহাদ ও গবেষণা করে এর হুকুম বলে দিয়েছেন।

তদ্রূপ, নামাযের অধিকাংশ বিষয়ই এমন, হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে এসবের পর্যায় নির্ণয় করে দেওয়া হয়নি যে, কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নত আর কোনটি মুস্তাহাব বা মুবাহ। এসব নির্ধারণের জন্য মুজতাহিদ ইমামের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

৩. এমন আমলের সংখ্যাও প্রচুর, শরীআত যেগুলো পালন করার নির্দেশ প্রদান করেছে; কিন্তু তা আদায় করার পূর্ণ রূপরেখা কুরআন হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ হয়নি।

যেমন কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে রুকু করা, সাজদা করার কথা এসেছে, কিন্তু কতটুকু সময় ঝুঁকে থাকলে রুকু আদায় হবে, কী পরিমাণ সময় মাটিতে মাথা রাখলে সাজদা সঠিক হবে, আর সর্বনিম্ন কতটুকু না করলে রুকু ও সাজদা আদায় হবে না– কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে এসব বিষয়ের পরিষ্কার বিবরণ উল্লিখিত হয়নি। তা নির্ণয় করার জিম্মাদারিও ইমামগণের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

তাঁরা ইজতিহাদ করে বিধানাবলি পালন করার পূর্ণ রূপরেখা ও সীমা-পরিসীমা বাতলে দিয়েছেন। ফলে খুব সহজে আমরা এসব আমল আদায় করতে পারছি।

৪. যেসব আয়াত ও হাদীসে একাধিক উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা আছে, সেখানে কোন মর্ম সঠিক বা অগ্রগণ্য, শুধু আরবী ভাষার ব্যুৎপত্তি দ্বারা তা নির্ধারণ করা সম্ভব না, বরং সেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন পড়ে।

যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ.

যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতীক্ষায় রাখবে (ইদ্দত পালন করবে)।[৬১]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে 'কুরু' শব্দের দুই অর্থ : হায়েয ও তোহর। এই আয়াতে কোন্ অর্থ উদ্দেশ্য, কুরআন হাদীসেও তা নির্ধারিত নেই এবং শুধু ভাষার পাণ্ডিত্য দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মুজতাহিদ ইমামগণ শরীআতের অন্যান্য দলীলের আলোকে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এখন আমাদের জন্য আমল করা সহজ হয়ে গেছে।

এই হাদীসটিও উল্লিখিত হয়েছে যে–

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার আছে, যাবৎ না তারা বিচ্ছেদ হবে। তারা যদি সত্য বলে এবং (পণ্য ও মূল্যের দোষ) স্পষ্ট করে দেয় তাহলে বেচাকেনায় বরকত হবে, আর যদি মিথ্যা বলে এবং (দোষ) গোপন রাখে তাহলে কেনাবেচার বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।[৬২]

সেখানে বলা হয়েছে, হাদীসটিতে 'বিচ্ছেদ হওয়া'র দুই অর্থ হতে পারে। কথার দ্বারা বিচ্ছেদ হওয়া এবং শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এখন এই দুই সম্ভাবনা থেকে কোনটা উদ্দেশ্য? আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বিচ্ছেদ হওয়া নাকি স্থান ত্যাগ করে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া? হাদীস শরীফ এ সম্পর্কে নীরব। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে এর সমাধান পেশ করেছেন।

---

৬১. সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২৮

৬২. সহীহ বুখারী, হাদীস ২১১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৩২

এ ধরনের আয়াত ও হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞ ইমামের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

৫. যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে কোন্‌টার উপর এবং কীভাবে আমল করা হবে—তা নির্ধারণ করা বড় জটিল ব্যাপার। মাযহাব এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

কোনো হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা আছে, কোনো হাদীসে আছে না-করার কথা। এক হাদীসে আমীন জোরে বলার কথা পাওয়া যায়, অন্য হাদীসে আমীন আস্তে বলার কথা। কোথাও ইমামের পিছনে মুক্তাদির কেরাত পড়ার কথা এসেছে, আবার কোথাও এসেছে না পড়ার কথা।

এ ধরনের অনেক বিষয় আছে। এখন এসব স্থানে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে এবং কোন্ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে—হাদীস শরীফে এগুলোর স্পষ্ট কোনো ফায়সালা পাওয়া যায় না। এসবের মীমাংসা দিতে পারেন কেবল মুজতাহিদ ইমামগণ।

৬. কুরআন ও হাদীসে এমন বিষয়ও কম না, যাতে দুই ধরনের বিধান বর্ণিত হয়েছে, যার একটা রহিত (মানসূখ), আরেকটা রহিতকারী (নাসেখ)। এখানে কোনটা মানসূখ, কোনটা নাসিখ—তা নির্ণয় করা এবং বাস্তবেই দুই বিধানের একটা মানসূখ কি না—এর তাহকীক করা দরকার। এই কঠিন দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া সাধারণ মানুষের জন্য অসম্ভব। এ ক্ষেত্রেও মাযহাব আমাদেরকে সুন্দর নির্দেশনা প্রদান করে।

৭. শরীআত যেসব আমলের নির্দেশ করেছে এবং রূপরেখা পেশ করেছে এর বিপরীত কোন্ কাজ করলে আমলটি বাতিল বলে গণ্য হবে, আর কোন কাজের দ্বারা আমলটা বাতিল হবে না, ত্রুটিপূর্ণ হবে। ত্রুটিযুক্ত হলে কীভাবে এর ক্ষতিপূরণ করা হবে—এসব বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও পরিষ্কার খসড়া কুরআন-সুন্নাহর 'নসূস' (সুস্পষ্ট পাঠ ও বক্তব্য)-এ পাওয়া যায় না। কোন কোন কারণে নামায বাতিল হবে, কোন কোন কাজের পর সাহু সাজদা করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে, নামাযের কী কী কাজ মাকরূহ, আর কী কী কাজ মুবাহ, এসবের পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত বিবরণ কুরআন হাদীসের

নুসূসে আপনি পাবেন না। এর জন্য ইমামের তাকলীদ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

৮. যেসব নব-উদ্ভাবিত বিষয় কুরআন-সুন্নাহয় বিবৃত হয়নি সেসবের সমাধানের জন্য 'নুসূসে' উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত উসূল, ইলাল ও মাকাসিদের শরণাপন্ন হতে হয়। এই কঠিন ও জটিল কাজটি তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রেও মাযহাব উম্মাহকে সাহায্য করে যাচ্ছে।

এখানে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ও বোধগম্য কিছু বিষয় পেশ করা হলো। এসব ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে শরীআত অনুসারে আমল করার জন্য ফিকহী মাযহাবগুলো কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উম্মাহর খেদমত করে যাচ্ছে।

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, মাযহাব আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত অন্য কারও আনুগত্যের কথা বলে না। বরং মাযহাবের কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান পালন করার ক্ষেত্রে উম্মাহকে সহোযোগিতা করা।

❋ ❋ ❋

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুসারে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণের বিধান ও প্রমাণ

দলীলসহ মাসআলা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু নিজে নিজে বিধান বোঝা তাদের পক্ষে অসম্ভব, তাই তাদের জন্য তাকলীদ ব্যতীত আর কোনো পথ নেই।

-শায়েখ ছালেহ আলউসাইমীন রহ.

প্রথম পরিচ্ছেদ
মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা

সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম জানা সবার পক্ষে সম্ভব নয়

কুরআন মাজীদের বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীস প্রমাণ করে, আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর রাসূলের। আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত অন্য কারও আনুগত্য করা যাবে না। তবে, এ বিষয়টা তো সকলেরই জানা আছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হলে তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়াদি জানতে হবে। পছন্দের বিষয়গুলো জেনে তা পালন করবে আর অপছন্দের বিষয়গুলো জেনে তা থেকে বিরত থাকবে। কোন্ কাজ শরীআতের কাম্য আর কোনটা কাম্য নয়—তা না জানলে আমল করবে কীভাবে?

কিন্তু নিজে নিজে কুরআন-হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করা, কোন্ কাজে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি আর কোন কাজে তাঁদের অসন্তুষ্টি তা নির্ণয় করা এবং এগুলোর উপর আমল করার জন্য সুন্দর কাঠামো দাঁড় করানো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এটি একটি বাস্তব ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। তা বোঝানোর জন্য দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এরপরও কুরআন ও হাদীস থেকে দুটি দলীল পেশ করছি।

দুটি দলীল

এক. মুহাদ্দিসগণের অনেকেই হাদীস থেকে বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখেন না

হাদীস শরীফ প্রমাণ করে, যারা হাফিযুল হাদীস হয়েছেন, নবীজীর হাদীস মুখস্থ করেছেন, তাদেরও অনেকেই ফকীহ নন, ইজতিহাদ করে নিজের হেফযকৃত হাদীস থেকে বিধান আহরণ করার ক্ষমতা রাখেন না। এ সম্পর্কে দুটি হাদীস–

প্রথম হাদীস : যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَه، حَتّٰى يُبَلِّغَه غَيْرَه، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

(قال الترمذي: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ)

অর্থাৎ আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে সজীবতা দান করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেছে। এরপর মুখস্থ করেছে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কারণ ফিক্হের অনেক বাহক তার চেয়ে বড় ফকীহের নিকট তা পৌঁছে দেয় এবং ফিক্হের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়।[৬৩]

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

(قال المنذري في الترغيب: رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن)

আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে সজীবতা দান করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে। এরপর কণ্ঠস্থ করেছে (এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে)। কারণ ফিকহের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়।[৬৪]

হাদীসদুটি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে, অনেক মুহাদ্দিসের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকে না।

উভয় হাদীসের ভাষ্য—ফিকহের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়। 'ফিকহ' ব্যাপক ও গভীর অর্থবোধক একটি শব্দ। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরণকৃত যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য, রুচি-স্বভাব, চিন্তা-চেতনা, আদব-আখলাক এবং সব ধরনের আমল, ইবাদত ও আকীদা-বিশ্বাসই ফিকহের অন্তর্ভুক্ত। এই ফিকহের অন্যতম উৎস হাদীস শরীফ। তাই হাদীসের জন্য ফিকহ শব্দ

---

৬৩. জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৬; মুসনাদে তয়ালিসী, হাদীস ৬১৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৫৯০; সুনানে দারেমী (ফতহুল মান্নান), হাদীস ২৪০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৭ ও ৬৮০

৬৪. মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৩৪১৬

ব্যবহার করেছেন এবং 'ফিকহ' বলে হাদীস এবং 'ফিকহের বাহক' বলে হাদীস বহনকারী তথা মুহাদ্দিস বুঝিয়েছেন।

সুতরাং উভয় হাদীসে 'ফিকহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস এবং 'ফিকহের বাহক' দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাদ্দিস। আর ফকীহ হলেন ওই মুহাদ্দিস, যিনি গবেষণা করে কুরআন ও হাদীস থেকে ফিকহ আহরণ করার যোগ্যতা রাখেন তথা মুজতাহিদ। অতএব رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ এর অর্থ হলো– অনেক মুহাদ্দিস মুজতাহিদ নয়।

ইমাম হুসাইন ইবনে মাহমুদ মুযহিরী রহ. (৭২৭ হিজরী) বলেন–

> يَعْنِيْ: قَدْ يَكُوْنُ بَعْضُ النَّاسِ يَسْمَعُ حَدِيْثًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَيَحْفَظُ لَفْظَ الْحَدِيْثِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ، وَيَرْوِيْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ لِشَخْصٍ يَعْلَمُ مَعْنَى ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ.
>
> হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো, কখনো এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অথবা সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে একটি হাদীস শুনেছেন এবং হাদীসের শব্দবাক্য মুখস্থ করেন। অথচ তিনি হাদীসের মর্ম জানেন না। কিন্তু তিনি সে হাদীসই পরবর্তী সময়ে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেন, যিনি হাদীসটির মর্ম-উদ্দেশ্য বুঝেন।[৬৫]

বোঝা গেল, হাদীসের চর্চাকারী মুহাদ্দিসগণ দুই শ্রেণির :

এক. যারা হাদীসের পারদর্শিতার পাশাপাশি ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞ। ইজতিহাদ করে তারা হাদীস থেকে ফিকহ আহরণ করতে পারেন।

দুই. যারা হাদীসশাস্ত্রের তো ইমাম, কিন্তু ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেননি। গবেষণা করে তারা হাদীস থেকে ফিকহ আহরণ করার যোগ্যতা

---

৬৫. আল-মাফাতীহ ফী শারহিল মাছাবীহ ১/৩২৩

রাখেন না। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ছনআনী রহ. (১১৮২ হিজরী) বলেন–

فِيْهِ أَنَّ حُفَّاظَ الْحَدِيْثِ فَقِيْهٌ وَغَيْرُ فَقِيْهٍ

হাদীসটি প্রমাণ করে, মুহাদ্দিসগণের কেউ ফকীহ্, কেউ ফকীহ্ নন।[৬৬]

সুতরাং এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মুহাদ্দিসগণের সবাই মুজতাহিদ নন। অনেকেই হাদীসের ইমাম হলেও ফিকহের ক্ষেত্রে পারদর্শী নন। আল্লামা আবদুর রউফ মুনাভী (৯৫২-১০৩১ হিজরী) রহ. বলেন–

أَيْ غَيْرُ مُسْتَنْبِطِ عِلْمِ الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيْقِ الْإِسْتِدْلَالِ، بَلْ يَحْمِلُ الرِّوَايَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ اسْتِدْلَالٌ.

হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেক মুহাদ্দিস এমন আছেন, যাঁরা শুধু হাদীস বর্ণনা করেন, হাদীস থেকে বিধান আহরণ করতে পারেন না।[৬৭]

সুতরাং এ দুটি হাদীস স্পষ্ট ঘোষণা করছে, সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, হাদীস অর্জনকারী অনেক মুহাদ্দিস আছেন যারা মুজতাহিদ নন, নিজে নিজে ইজতিহাদ করে কুরআন ও হাদীস থেকে ফিকহ ও আহকাম আহরণ করতে পারেন না। ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ. (৩৯২-৪৬৩ হিজরী) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন–

فَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَافِظًا، وَلَا يَكُونُ فِيهِ فَقِيهًا.

হাদীসখানিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন, অনেক সময় এমন লোকও মুহাদ্দিস হন, যে হাদীস মুখস্থ করেছে, কিন্তু হাদীস থেকে ফিকহ আহরণ করতে পারে না।[৬৮]

---

৬৬. আততানভীর শারহুল জামিইছ ছগীর ১০/৫০৪ (শামেলা সংস্করণ)
৬৭. ফয়যুল কাদীর ৪/১৭, ৪৪০৯
৬৮. আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/১৪৬

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে কুরকুল রহ. (৫৬৯ হিজরী) বলেছেন–

تَسْلِيْمُ التَّأْوِيْلِ لِأَهْلِ الْفَهْمِ وَالْفِقْهِ لَازِمٌ، فَهُمْ أَحَقُّ بِالتَّأْوِيْلِ، وَأَهْدٰى إِلَى السَّبِيْلِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়টি ফকীহদের জন্য ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। কারণ তারা হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্য সবার চেয়ে ভালো বুঝেন এবং এ বিষয়ে তারা সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। এর দলীল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস– 'ফিক্হের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয় এবং ফিক্হের অনেক বাহক তার চেয়ে বড় ফকীহের নিকট তা পৌঁছে দেয়।'[৬৯]

দ্বিতীয় হাদীস : আবু মূসা আশআরী রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন এর দৃষ্টান্ত হলো– যমীনে প্রতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়।

কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর, যা বৃষ্টির পানি শুষে নেয় এবং প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা ও তরুলতা উৎপাদন করে।

---

৬৯. মাতালিউল আনওয়ার আলা ছিহাহিল আছার ১/১৫৩ (শামেলা সংস্করণ)

আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। ফলে তা দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষকে উপকৃত করেন; তারা নিজেরা পান করে, (পশুকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমি আছে, যা একেবারে শক্ত ও মসৃণ; তা না পানি আটকে রাখে, আর না ঘাসপাতা উৎপাদন করে।

এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে 'ফিক্‌হ' (গভীর ও সঠিক জ্ঞান) অর্জন করে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা দিয়ে সে উপকৃত হয়। সে নিজে ইলম শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়নি এবং আমাকে আল্লাহ তাআলা যে হেদায়েত দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা কবুল করেনি।[৭০]

ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ. বলেন–

قَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ مَرَاتِبَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهِينَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُذَّ مِنْهَا شَيْءٌ، فَالْأَرْضُ الطَّيِّبَةُ هِيَ مِثْلُ الْفَقِيهِ الضَّابِطِ لِمَا رَوٰى، الْفَهِمُ لِلْمَعَانِي، الْمُحْسِنُ لِرَدِّ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالْأَجَادِبُ الْمُمْسِكَةُ لِلْمَاءِ الَّتِي يَسْتَقِي مِنْهَا النَّاسُ، هِيَ مِثْلُ الطَّائِفَةِ الَّتِي حَفِظَتْ مَا سَمِعَتْ فَقَطْ، وَضَبَطَتْهُ، وَأَمْسَكَتْهُ، حَتَّى أَدَّتْهُ إِلَى غَيْرِهَا مَحْفُوظًا غَيْرَ مُغَيَّرٍ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِقْهٌ تَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلَا فَهْمٌ بِالرَّدِّ الْمَذْكُورِ وَكَيْفِيَّتِهِ.

وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَ، وَلَا ضَبَطَ، فَلَيْسَ مِثْلَ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ، وَلَا مِثْلَ الْأَجَادِبِ، بَلْ هُوَ مَحْرُومٌ، وَمِثْلُهُ مِثْلُ الْقِيعَانِ، الَّتِي لَا تُنْبِتُ كَلَأً، وَلَا تُمْسِكُ مَاءً.

৭০. সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৮২

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে ফকীহ ও ও ফিকহ শিক্ষার্থীদের সকল স্তরের বিবরণ পেশ করেছেন। কোনো স্তর বাদ দেননি।

উর্বর ভূমি হলো– ওই ফকীহের দৃষ্টান্ত, যিনি হাদীস ভালো করে আয়ত্ত করেছেন, হাদীসের অর্থ-মর্ম উত্তম রূপে বুঝেছেন এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান কুরআন-সুন্নাহ থেকে বের করতে পারেন।

পানি সংরক্ষণকারী শক্ত জমি হলো– ওই মুহাদ্দিসের উদাহরণ, যিনি হাদীস মুখস্থ করেছেন, 'যবত' ও হেফাযত করেছেন, এরপর কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে ফকীহ নন, হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখেন না।

আর যে হাদীস হেফয করেনি, হাদীস শেখেনি, সে উর্বর ভূমির মতোও নয় এবং পানি সংরক্ষণকারী কঠিন ভূমির মতোও নয়। সে মাহরূম, হতভাগা। তার উদাহরণ হলো ওই যমিনের মতো, যা একেবারে কঠিন ও সমতল, না পানি আটকে রাখে, আর না ঘাসপাতা উৎপাদন করে।[৭১]

হাদীসের মধ্যে মুহাদ্দিসগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক প্রকারের মুহাদ্দিস হলেন ফকীহ, যারা ইজতিহাদ করে হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করতে পারেন। আরেক প্রকারের মুহাদ্দিস ফকীহ নন, তাদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন হয়নি। নিজে নিজে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম ইস্তিম্বাত করার যোগ্যতা রাখেন না।

এই হাদীস এবং উপরের দুই হাদীস সব হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন, যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন–

---

৭১. আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ১/২৩৩

مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

মুহাদ্দিসগণের মাঝে ফিক্‌হ (ইজতিহাদের যোগ্যতা) খুব কমই পাওয়া যায়।[৭২]

সুতরাং সাধারণ মানুষ যে ইজতিহাদ করতে পারবে না—তা তো বলাই বাহুল্য। আর যারা ইজতিহাদ করতে পারে না তাদের জন্য যে মুজতাহিদের ফিকহ ও মাযহাব অনুসরণ না করে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা সম্ভব নয়, তা কি দলীল-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন আছে?

দুই. দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলির নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা আলেমগণ ব্যতীত কেউ বুঝে না।[৭৩]

আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আলেম নয় তারা কুরআনুল কারীমে বর্ণিত দৃষ্টান্তবলি ভালো করে বুঝে না। অথচ দৃষ্টান্ত বোঝা সবার জন্য সহজ। সাধারণ মানুষ যখন এমন সহজ বিষয় ভালো করে বুঝে না, তখন ইজতিহাদ ও গবেষণার মতো কঠিন ও জটিল বিষয় যে তারা বুঝবে না—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং ইজতিহাদ করে কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম ইস্তিম্বাত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই হলো সংক্ষিপ্ত কথা। এবার বিস্তারিত শুনুন।

কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রদান এবং অতীতের পাপিষ্ঠ জাতিগুলোর উপর আপতিত শাস্তির বিবরণ দানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো– উপদেশ গ্রহণ করা; কুফুর শিরক বর্জন করা, পাপাচার থেকে তাওবা ইস্তিগফার করা এবং ঈমান ও আমলে সালেহ গ্রহণের শিক্ষা অর্জন করা।

---

৭২. তবাকাতুল হানাবিলা, ইবনে আবী ইয়ালা ১/৩২৯

৭৩. সূরা আনকাবুত (২৯), আয়াত ৪৩

কুরআন মাজীদে বিবৃত অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলি থেকে এই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য সহজ। সূরা কামারের শুরুতে নূহ আলাইহিস সালামের গোত্র, আদ ও সামূদ জাতি এবং লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, এই চার কওমের আলোচনা করা হয়েছে। এদের অবাধ্যতা ও শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জাতির আলোচনার পর ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

নিশ্চয় আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?[৭৪]

এতে প্রমাণ হয়, উপমা ও ঘটনা বোঝা এবং ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সর্বস্তরের মানুষের জন্য সহজ। অপরদিকে সূরা আনকাবুতে বর্ণিত হয়েছে নূহ, ইবরাহীম, লূত, শুআইব ও মূসা আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত, তাঁদের সাথে সম্প্রদায়ের লোকদের আচরণ, এসব সম্প্রদায় এবং আদ ও সামূদ জাতির প্রতি আল্লাহর শাস্তির বিবরণ। আরও বিবৃত হয়েছে বাতিল উপাস্যগুলোর শক্তির স্বরূপ বোঝানোর জন্য মাকড়সার জালের উপমা। এসব বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এই সব দৃষ্টান্ত আলেমগণ ব্যতীত কেউ বুঝে না। ইরশাদ করেছেন–

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা আলেমগণ ব্যতীত কেউ বুঝে না।[৭৫]

এখানে বলা হয়েছে দৃষ্টান্তসমূহ আলেমগণ ব্যতীত কেউ বুঝে না। এ কথার অর্থ কী? আবু মুহাম্মাদ মাক্কী ইবনে আবু তালেব কাইসী রহ. (৪৩৭ হিজরী) বলেন–

وَمَا يَعْقِلُ الصَّوَابَ لِمَا ضُرِبَ لَهُ مِنَ الْأَمْثَالِ

উপমাবলির সঠিক উদ্দেশ্য তারা বুঝে না।[৭৬]

---

৭৪. সূরা কামার, আয়াত (৫৪), আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০
৭৫. সূরা আনকাবুত (২৯), আয়াত ৪৩
৭৬. আলহিদায়াহ ইলা বুলূগিন নিহায়াহ ৬/৩৫৪৯

এই আয়াতে বলা হয়েছে, উপমা ও ঘটনার গভীর তত্ত্ব-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা সবার পক্ষে সহজ নয়। ঘটনা ও দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা যদিও প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য সহজ, কিন্তু বুঝ ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সাধারণ মানুষ ঘটনাবলির গভীর উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, এগুলোর যথাযথ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। অর্থাৎ ঘটনাবলির মূল উদ্দেশ্য বোঝার জন্য যে পরিমাণ বুঝ ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যারা আলেম নয় তাদের এই পরিমাণ বুঝজ্ঞান নেই।

আর এ স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, ইজতিহাদ করে আহকাম আহরণের চেয়ে বিভিন্ন দৃষ্টান্তাবলির উদ্দেশ্য বোঝা সহজ। দৃষ্টান্ত ও ঘটনা বোঝার তুলনায় ইজতিহাদ করে বিধান আহরণ করা অনেক অনেক কঠিন। আর আয়াতের দাবি হলো, যারা আলেম নয় তারা এই সহজ বিষয়াদিই ভালো করে বুঝে না। তো তারা যেখানে ঘটনা ও দৃষ্টান্তেরই যথার্থ উদ্দেশ্য ও গভীর রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়, সেখানে কীভাবে তারা গবেষণা করে বিধি-বিধান আহরণের মতো ভারী ও জটিল কাজ আঞ্জাম দেবে?

সুতরাং আয়াতটি থেকে যেমন বুঝে আসে, বিভিন্ন দৃষ্টান্তের আসল লক্ষ্য ও রহস্য বোঝার যথাযথ যোগ্যতা সাধারণের নেই, তেমনি আরও উত্তমরূপে বুঝে আসে যে, ইজতিহাদ ও গবেষণার মতো দুরূহ দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতাও তাদের নেই।

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বললে, আয়াতটির عِبَارَةُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, সাধারণ মানুষ দৃষ্টান্তের সঠিক ও যথাযথ উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, আর دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সাধারণ মানুষ ইজতিহাদ করে বিধান আহরণের যোগ্যতা রাখে না। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, পিতা-মাতার কোনো একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে

তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।[৭৭]

এই আয়াতে পিতা-মাতাকে 'উফ্' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যেখানে তাদের সামনে উফ্ বলা নিষেধ, সেখানে তাদেরকে গাল-মন্দ করা, প্রহার করা যে নিষিদ্ধ তা তো আরও স্পষ্ট। শাস্ত্রীয় পরিভাষা হচ্ছে, এই আয়াতের عِبَارَةُ النَّصِّ থেকে প্রমাণিত হয়, পিতা-মাতাকে উফ্ বলা হারাম, আর دَلَالَةُ النَّصِّ থেকে প্রতীয়মান হয়, তাদেরকে প্রহার করা, গালমন্দ করা হারাম।

মোটকথা, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ আয়াতটি প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষ আল্লাহ তাআলার বর্ণনাকৃত উদারহণ ও ঘটনাগুলোর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না এবং আরও উত্তমভাবে প্রমাণ করে যে, আলেমগণ ব্যতীত অন্যরা আহকাম আহরণ করার জন্য ইজতিহাদ করতে পারে না। তাই শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন–

কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তু দুই প্রকার। অনেক আয়াত এমন, যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নসীহত করেছেন যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। আখেরাতের ফিকির দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। এই ধরনের আয়াত থেকে একজন সাধারণ মানুষও শুধু অনুবাদ দেখেই নসীহত গ্রহণ করতে পারবে।

এরপর তিনি বলেন–

> لیکن دوسرے مضامین وہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے احکام وامثال بیان فرمائے ہیں۔ ان احکام کے متعلق خود اللہ تعالی نے فرمادیا: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾ یعنی ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدہ کے لئے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہیں جو علم والے ہیں۔
>
> কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বিষয় হলো– ওইসব আয়াত, আল্লাহ তাআলা যাতে বিধি-বিধান ও দৃষ্টান্তাবলি বর্ণনা

৭৭. সূরা বনী ইসরাইল (১৭), আয়াত ২৩

করেছেন। এই আহকাম সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে–

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝

অর্থাৎ মানুষের উপকারের জন্য আমি এইসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু এসব বুঝে কেবল তারা, যাদের ইলম আছে।[৭৮]

সারকথা, এই আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয়, যারা বিজ্ঞ আলেম নয়, তারা ইজতিহাদ করে আহকাম ইস্তেম্বাত করতে পারে না। সুতরাং তাদের জন্য মুজতাহিদের মাযহাব ও ফিকহ অনুসরণ না করে কোনো উপায় নেই। মুজতাহিদের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা ব্যতীত কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান পালন করতে তারা কিছুতেই সক্ষম নয়।

সাহাবায়ে কেরামের যুগেও কি সকলে মুজতাহিদ ছিলেন?

সর্বকালেই অবস্থা এমন ছিল যে, কিছু লোক ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, গবেষণা করার যোগ্যতা রাখতেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠই এমন, যাদের জ্ঞান ছিল না, ইজতিহাদ করার যোগ্যতা ছিল না। এ এক স্বীকৃত ও বাস্তব সত্য। কারও পক্ষে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগ তো আমাদের সামনেই। ইলমের উর্বরতম কাল হলো সাহাবায়ে কেরামের যুগ। সে যুগেও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ফকীহ তেমন পাওয়া যেত না। ইমাম ঈসা ইবনে আবু বকর সুলতান শারাফুদ্দীন আইয়ুবী রহ. (৫৭৬-৬২৪ হিজরী) বলেন–

مِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ جَمِيْعَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُوْنُوْا فُقَهَاءَ، وَمَا كَانَ الْفُقَهَاءُ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ.

স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, সাহাবীদের মধ্যে সবাই ফকীহ ছিলেন না। ফকীহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যকই।[৭৯]

---

৭৮. খুতুবাতে দাওরায়ে হিন্দ, পৃ. ২৪৯-২৫০

৭৯. আসসাহমুল মুছীব ফিররাদ্দি আলাল খাতীব, পৃ. ৭৫

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. (৭৯০-৮৬১ হিজরী) বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলেছেন। তিনি বলেন–

> لَا تَبْلُغُ عِدَّةُ الْمُجْتَهِدِينَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ، كَالْخُلَفَاءِ، وَالْعَبَادِلَةِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَلِيلٍ، وَالْبَاقُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَفْتُونَ مِنْهُمْ.
>
> সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন তাঁদের সংখ্যা বিশের অধিক হবে না। যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি., মুআয ইবনে জাবাল রাযি., আনাস রাযি., আবু হুরায়রা রাযি., আর অল্প কয়েকজন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের শরণাপন্ন হতেন, তাঁদের থেকে ফতোয়া জেনে সে মোতাবেক আমল করতেন।[৮০]

সৌদি আরবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউসাইমীন রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হিজরী) লিখেছেন–

> وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِيْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ لَايَسْتَطِيْعُ الْوُصُوْلَ إِلَى الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ لِجَهْلِهِ، أَوْ قُصُوْرِهِ.
>
> কোনো সন্দেহ নেই, সাহাবীদের যুগে এমন মানুষ ছিলেন যারা আলেম না হওয়ার কারণে অথবা (আলেম হলেও) বিধান আহরণের যোগ্যতা না অর্জনের কারণে নিজে নিজে শরীআতের বিধান জানতে সক্ষম ছিলেন না।[৮১]

মোটকথা, কোনো জ্ঞানবান ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, সব যমানাই এমন মানুষ ছিল যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল না।

---

৮০. ফতহুল কাদীর ৩/৪৫৩

৮১. ফাতায়া নূর আলাদ্ দারবি ২/২২০

বরং সর্বকালেই সাধারণ মানুষের তুলনায় মুজতাহিদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এখন প্রশ্ন হলো, যারা কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি বিধি-বিধান আহরণ করতে পারে না, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে কীভাবে?

জবাব পরিষ্কার, সাহাবাযুগে যেমনভাবে যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিলা না তারা মুজতাহিদ সাহাবীর শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতেন তেমনি সর্বযুগের সাধারণ মানুষ বিজ্ঞ আলেমের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা মোতাবেকই কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করবে। তাদের জন্য মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যা ও তাফসীর ব্যতীত কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার আর কোনো উপায় নেই। সাহাবাযুগ থেকে চলেআসা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের এই স্বীকৃত ও স্বভাবসিদ্ধ পথই 'তাকলীদ' নামে অভিহিত হয়েছে এবং এরই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত পরিভাষা 'মাযহাব' অনুসরণ করা। আরবের প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ উসাইমীন হাম্বলী রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হিজরী) লেখেন–

> وَوَظِيْفَةُ هٰذَا أَنْ يَّسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَسُؤَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الْأَخْذَ بِمَا قَالُوْا، وَالْأَخْذُ بِمَا قَالُوْا هُوَ التَّقْلِيْدُ.
>
> অর্থাৎ যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই, তার কর্তব্য— আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করে সে অনুপাতে আমল করা। আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করার দাবি হলো, সে অনুযায়ী আমল করা। আর আহলে ইলমের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার নামই হলো তাকলীদ।[৮২]

হুকুম-আহকামের দলীল-প্রমাণ বোঝা কি সবার পক্ষে সম্ভব?

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, শরয়ী আহকামের দলীলাদি বোঝা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুয়ের সামনে দলীল উল্লেখ করা আর না করা উভয়ই সমান। তাদের সামনে আরবের কারও একটি বক্তব্য পেশ করে যদি বলা হয়, এটি সহীহ হাদীস, এতে

৮২. ফাতায়া নূর আলাদ দারবি ২/২০০

নবীজী এই কথা বলেছেন বা কোনো যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করে যদি এটাকে সহীহ্ আখ্যায়িত করা হয় অথবা দাবি প্রমাণিত হয় না এমন হাদীস দিয়ে যদি দলীল পেশ করা হয় কিংবা এ ধরনের অন্য কোনোভাবে যদি দলীলাদি পরিবেশন করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝবে না। তারা ধরতে পারবে না যে, তাদের সামনে বাস্তব দলীল পেশ করা হয়েছে নাকি জাল কথা দিয়ে দলীল দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ বিধান আহরণের উসূল ও নীতিমালা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাদের সামনে দলীল নিয়ে পর্যালোচনা করা অরণ্যে রোদন বৈ কিছুই না। এ ধরনের মানুষের জন্য দলীল জানতে চাওয়া ধৃষ্টতা। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সম্পর্কে রোগীর প্রশ্ন করা যে, এ রোগের এই ওষুধ দিলেন কেন? এর কারণ কী? ওই খাবার খেতে নিষেধ করার রহস্য কী? ইত্যাদি বিষয় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ? ডাক্তার এসব জটিল বিষয়াদি তাকে কীভাবে বোঝাবে! তার যে বোঝারই যোগ্যতা নেই!

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র বোঝার চেয়ে বিধি-বিধানের দলীল বোঝা তো আরও অনেক বেশি কঠিন। সুতরাং সাধারণের জন্য দলীল চাওয়া অনেক বড় বোকামি, এটা তার অজ্ঞতারই আরও একটি দলীল। তাই এ ধরনের মানুষ যে আলেমের ইলম ও দ্বীনদারির উপর পূর্ণ আস্থা থাকবে, তার থেকে বিধান জেনে জেনে আমল করবে। কিন্তু বিধানের দলীল সম্পর্কে জানতে চাইবে না।

এই স্তরের সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ করেই কোনো কোনো আলেম তাকলীদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে– 'তাকলীদ হলো– দলীল ছাড়া কোনো ইমামের কথা মেনে নেওয়া।'

অর্থাৎ কোনো আলেমের কাছে দ্বীনের কোনো মাসআলা জানতে চাওয়া হলো। তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে ইস্তেম্বাত করে দলীলের উল্লেখ ব্যতীত মাসআলাটি বলে দেবেন। সাধারণ মানুষ তার ব্যাখ্যা মতো শরীআতের বিধানটি পালন করবে। এটাই হলো সাধারণ মানুষের তাকলীদ। শায়েখ ছালেহ আলউসাইমীন রহ. (১৪২১ হিজরী) বলেন–

إِنَّ الْعَامِيَّ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِأَدِلَّتِهِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيْدُ

দলীলসহ মাসআলা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে নয়। যেহেতু নিজে নিজে বিধান বোঝা তাদের পক্ষে অসম্ভব, তাই তাদের জন্য তাকলীদ ব্যতীত আর কোনো পথ নেই।[৮৩]

হাঁ, যাঁরা দলীলাদি বোঝার যোগ্যতা রাখেন, তারা ইমামের কথার দলীল তালাশ করবেন, দলীল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন—এতে কারও কোনো আপত্তি নেই।

তাকলীদ ছাড়া উপায় নেই, তাকলীদ বিরোধিরাও তাকলীদ করেন

সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। সালাফীদের মধ্যে অন্যূন নিরানব্বই ভাগ হলো সাধারণ মানুষ। তারা আমল করবে কীভাবে?

তাদের জন্য দুইটার একটা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞ ইমামগণের ফিকহ ও নির্দেশনা গ্রহণ করবে, না হয় বর্তমানের দাবিদার মুজতাহিদদের শিক্ষা ও মাযহাব অনুযায়ী আমল করে। এছাড়া তো তাদের জন্য আমল করার আর কোনো রাস্তা নেই।

এমনকি সালাফীদের মধ্যে যারা মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করেন, তারাও তাকলীদ করেন এবং তাদের তাকলীদ করার ক্ষেত্রও অনেক। সামনে সে ফিরিস্তি উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। এখানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস যফর আহমাদ উসমানী রহ. (১৩৯৪ হিজরী)-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে। উসমানী রহ. বলেন–

إِنَّ مَنْ يَدَّعِي الْعَمَلَ بِصَحِيْحِ الْحَدِيْثِ وَتَرْكَ تَقْلِيْدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْأَحْكَامِ، وَيُبَالِغُ فِي ذَمِّ التَّقْلِيْدِ وَالْاِجْتِهَادِ وَأَهْلِهِمَا: لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ هٰذَا التَّقْلِيْدِ، وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ مَحِيْدٌ، فَإِنَّ دَعْوَاهُ الصِّحَّةَ

৮৩. আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৮

وَالْحُسْنَ فِي حَدِيْثٍ لَا تَتَأَتّٰى وَلَا تَتَمَشّٰى بِدُوْنِ تَقْلِيْدِهٖ رَأْيَ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي ذٰلِكَ. فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ تَقْلِيْدِهِمْ وَتَقْلِيْدِ الْمُجْتَهِدِيْنَ؟ حَتّٰى كَانَ هٰذَا شِرْكًا مَذْمُوْمًا دُوْنَ ذٰلِكَ! فَاللهُ يَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ.

যারা সহীহ হাদীসের উপর আমল করার দাবি করে, ইমামগণের তাকলীদ বর্জন করার আহ্বান করে এবং তাকলীদ, ইজতিহাদ, মুকাল্লিদ ও মুজতাহিদের তীব্র নিন্দা করে তারাও তাকলীদ করে—তাকলীদ ছাড়া তাদেরও কোনো নিস্তার নেই। কেননা, কোনো হাদীসকে সহীহ বা হাসান আখ্যা দেওয়া তাদের জন্য সম্ভব নয় মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাকলীদ না করে। প্রশ্ন হলো, মুহাদ্দিসের তাকলীদ করা আর মুজতাহিদের তাকলীদ করার মধ্যে কী পার্থক্য আছে, যে মুজতাহিদের তাকলীদ করলে শিরক হবে, কিন্তু মুহাদ্দিসের তাকলীদ করলে শিরক হবে না? আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়েত দান করুন এবং তাদের হালত দুরুস্ত করে দিন।[৮৪]

* * *

৮৪. কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস (টীকা), পৃ. ৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কুরআন মাজীদের আলোকে মাযহাব

মাযহাব অনুসরণের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়। এখানে চারটি আয়াত উল্লেখ করা হলো–

প্রথম আয়াত : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

সুতরাং তোমরা নিজেরা যদি না জানো, তবে আহলে ইলমদেরকে জিজ্ঞেস কর।[৮৫]

এই আয়াত তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট দলীল। এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা জানে না তারা যেন আহ্‌লে ইলমদের (বিজ্ঞ আলেমদেরকে) জিজ্ঞেস করে করে আমল করে। আর কাউকে জিজ্ঞেস করে তার শিক্ষা ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করার নামই হলো তাকলীদ করা। কোনো ইমামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার অর্থ ওই ইমামের মাযহাব মানা। আলোচ্য আয়াতটি দ্বারা বহু আলেম মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন।

সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেম, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউসাইমীন রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হিজরী) লেখেন, তাকলীদের ক্ষেত্র হলো দুইটা :

اَلْأَوَّلُ: أَنْ يَّكُوْنَ الْمُقَلِّدُ عَامِيًّا لَا يَسْتَطِيْعُ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ فَفَرْضُهُ التَّقْلِيْدُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে, সাধারণ মানুষ, যারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণ করতে সক্ষম নয়। তাদের জন্য তাকলীদ করা ফরয। দলীল উক্ত আয়াত।[৮৬]

---

৮৫. সূরা নাহল (১৬), আয়াত ৪৩; সূরা আম্বিয়া (২১), আয়াত ৭

৮৬. আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৭

অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতটি প্রমাণ করে, যারা ইজতিহাদ করে, হুকুম-আহকাম আহরণ করতে পারে না, তাদের জন্য তাকলীদ করা ফরয।

সৌদি আরবের আরেকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম হলেন শায়খ আবু বকর জাবের জাযাইরী রহ. (১৪৩৯ হিজরী)। তিনি এই আয়াতের তাফসীরে লেখেন–

وَفِي الْآيَةِ دَلِيْلٌ عَلى وُجُوْبِ تَقْلِيْدِ الْعَامَّةِ الْعُلَمَاءَ، إِذْ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَوُجُوْبِ الْعَمَلِ بِمَا يُفْتُوْنَهُمْ بِه وَيُعَلِّمُوْنَهُمْ بِه.

অর্থাৎ এ আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের মাযহাব অনুসরণ করা এবং আলেমগণের ফতোয়া ও শিক্ষা মোতাবেক আমল করা আবশ্যক। কারণ (আয়াতে ‘আহলুয যিক্র’কে জিজ্ঞেস করে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর) আলেমগণই হলেন আহলুয যিক্র।[৮৭]

ইমাম আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. (৩৬৮-৪৬৩ হিজরী) বলেন–

وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا، وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُونَ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَعْمٰى لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيدِ غَيْرِه مِمَّنْ يَثِقُ بِمَيْزِه بِالْقِبْلَةِ، إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ. فَكَذٰلِكَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا بَصَرَ بِمَعْنَى مَا يَدِينُ بِه لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيْدِ عَالِمِه.

এ ব্যাপারে আলেমগণের কারও দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য আলেমদের তাকলীদ করা এবং উক্ত আয়াতে যাদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন উলামায়ে কেরাম।

এতেও আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে, কিবলার দিক নির্ধারণের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়লে বিশ্বস্ত চক্ষুষ্মানের তাকলীদ করা (তার কথা মানা) অন্ধ মুসল্লীর জন্য আবশ্যক।

৮৭. আইসারুত তাফাসীর পৃ.৭৭০

তদ্রূপ, যার ইলম নেই, কুরআন-সুন্নাহর বুঝ নেই, তার জন্য আলেমের তাকলীদ করাও অপরিহার্য।[৮৮]

দ্বিতীয় আয়াত : আল্লাহ তাআলা বলেন−

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۠

হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে 'উলুল আমর'। তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই উত্তম এবং এর পরিণাম উৎকৃষ্টতর।[৮৯]

এই আয়াত থেকেও মাযহাব মানার আবশ্যিকতা বুঝে আসে। আয়াতটিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পর 'উলুল আমর'-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'উলুল আমর' হলেন দুই শ্রেণির মানুষ। বিজ্ঞ আলেমগণ ও শাসকবৃন্দ। তবে, কারও কারও মতে উলুল আমর হলেন শুধু উলামায়ে কেরাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. (৬৮ হিজরী) বলেন−

قَوْلَهُ «وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانِيَ دِينِهِمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ.

---

৮৮. জামিউ বয়ানিল ইলম ২/১১৪; আযওয়াউল বয়ান ৭/৩১২; আসারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ৯১

৮৯. সূরা নিসা (৪), আয়াত ৫৯

উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুত্তাকী আলেমগণ, যাঁরা মানুষকে দ্বীনের বিষয়াদি শিক্ষা দেন এবং ভালো কাজের আদেশ করেন ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আল্লাহ্ তাআলা মুসলিমদের উপর তাদের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক করেছেন।[৯০]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (৬০৬ হিজরী) বলেন–

وَالْمُرَادُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الْعُلَمَاءُ فِي أَصَحِّ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ الْمُلُوكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَنْعَكِسُ.

বিশুদ্ধতম মত অনুসারে উলুল আমর হলেন উলামায়ে কেরাম। কেননা, শাসকবর্গেরও কর্তব্য (ধর্মীয় বিষয়ে) উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা। এর বিপরীত উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব নয় (ধর্মের ক্ষেত্রে) শাসকবৃন্দের অনুসরণ করা।[৯১]

ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী (৪৬৮-৫৪৩ হিজরী) রহ. বলেন, উলুল আমর সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে।

এরপর দ্বিতীয় মতটি সম্পর্কে তিনি বলেন–

الثَّانِي هُمُ الْعُلَمَاءُ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ.

দ্বিতীয় মত হচ্ছে, উলূল আমর হলেন উলামায়ে কেরাম। আর এটাই অধিকাংশ তাবেয়ীনের বক্তব্য।[৯২]

তো উলুল আমরের ব্যাখ্যায় দুইটা মাযহাব আছে। কোনো কোনো আলেম যদিও একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অগ্রগণ্য মত হলো– উলুল আমর দ্বারা শাসকবর্গ ও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম উভয় শ্রেণিই উদ্দেশ্য। আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকগণের

---

৯০. তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ৩/৯৮৯ (৫৫৩৪); তাফসীরে ইবনুল মুনযির ২/৭৬৫ (১৯২৯)

৯১. তাফসীরে কাবীর ১/৪০০ (সূরা বাকারা, ৩১ নং আয়াতের তাফসীর)

৯২. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/৪৫২

আনুগত্য করবে, আর দ্বীনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করবে। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. বলেন–

وَالصَّحِيحُ عِنْدِي: أَنَّهُمْ الْأُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ جَمِيعًا، أَمَّا الْأُمَرَاءُ فَلِأَنَّ أَصْلَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَالْحُكْمَ إِلَيْهِمْ. وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَلِأَنَّ سُؤَالَهُمْ وَاجِبٌ مُتَعَيِّنٌ عَلَى الْخَلْقِ، وَجَوَابُهُمْ لَازِمٌ، وَامْتِثَالُ فَتْوَاهُمْ وَاجِبٌ.

আমার মতে সঠিক কথা হলো, উলুল আমর দ্বারা নেতৃবর্গ এবং উলামায়ে কেরাম উভয় শ্রেণি উদ্দেশ্য। নেতৃবর্গ এ জন্য উদ্দেশ্য যে, মূল কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতা তো তাদেরই হাতে এবং উলামায়ে কেরাম এ জন্য উদ্দেশ্য যে, সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করা, আর তাঁদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া। তখন সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক আলেমগণের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা।[৯৩]

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. (৩০৫-৩৭০ হিজরী) বলেন–

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مُرَادِينَ بِالْآيَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُهُمْ جَمِيعًا. لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ يَلُونَ أَمْرَ تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا وَقِتَالِ الْعَدُوِّ، وَالْعُلَمَاءَ يَلُونَ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَمَا يَجُوزُ مِمَّا لَا يَجُوزُ. فَأَمَرَ النَّاسَ بِطَاعَتِهِمْ وَالْقَبُولِ مِنْهُمْ مَا عَدَلَ الْأُمَرَاءُ وَالْحُكَّامُ، وَكَانَ الْعُلَمَاءُ عُدُولًا مَرْضِيِّينَ مَوْثُوقًا بِدِينِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ.

উলুল আমর দ্বারা শাসকশ্রেণি ও আলেমগণ উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারে। শাসকবৃন্দ সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধ-জিহাদ করা ও দুশমনের মোকাবেলা করার দায়িত্ব পালন করবেন আর উলামায়ে কেরাম দ্বীনের হেফাযত ও বিধি-বিধান

৯৩. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/৪৫২

শিক্ষাদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন। আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষকে উভয়শ্রেণির আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকবর্গ দ্বীন অনুসারে পরিচালনা করবেন এবং উলামায়ে কেরাম থাকবেন ন্যায়পরায়ণ, সন্তুষ্টভাজন এবং ধার্মিকতা ও আমানতদারিতে বিশ্বস্ত।[৯৪]

ইমাম ইবনে কাছীর রহ. (৭৭৪ হিজরী) বলেন–

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ.

অগ্রগণ্য মত হচ্ছে, এই আয়াতে উলুল আমরের মধ্যে শাসকগোষ্ঠী ও উলামায়ে কেরাম উভয় শ্রেণিই অন্তর্ভুক্ত।[৯৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৬৬১-৭২৮ হিজরী) বলেন–

أُوْلُوْ الْأَمْرِ صِنْفَانِ: اَلْأُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ.

উলুল আমর হলেন দুই শ্রেণির মানুষ : শাসকবর্গ ও উলামায়ে কেরাম।[৯৬]

যাই হোক, উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি উলুল আমর তথা আরও দুই শ্রেণির মানুষের আনুগত্য করারও হুকুম করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণির আনুগত্য করা, যতক্ষণ তারা শরীআত অনুসারে ফায়সালা করেন, আর ধর্মের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম তথা মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণ করা।

এভাবে এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞ আলেমগণের আনুগত্য করা অতীব জরুরি। এ সম্পর্কে বহু ইমামের উদ্ধৃতি পেশ করা যাবে। কিন্তু, এতে করে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই এখানে শুধু দুইজন আলেমের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি, সালাফী ভাইয়েরাও যাদের গবেষণার খুব কদর করেন।

---

৯৪. আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস ৩/১৭৭

৯৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৩০৩

৯৬. মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/৩৮৮

এক. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী) বলেছেন, এই আয়াত মাযহাবের ইমামগণের অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছে। তাঁর বক্তব্য হলো–

هٰؤُلَاءِ أُوْلُوْ الْأَمْرِ الَّذِيْنَ أَمَرَ اللهُ بِطَاعَتِهِمْ فِيْ قَوْلِهِ: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ মাযহাবের ইমামগল হলেন উলুল আমর। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৭]

দুই. আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. (৬৯১-৭৫১ হিজরী) মুজতাহিদ ইমামগণের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

وَطَاعَتُهُمْ أَفْرَضُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ بِنَصِّ الْكِتَابِ: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থাৎ পিতা-মাতার আনুগত্যের চেয়েও বড় ফরয ইমামগণের আনুগত্য করা। কেননা কুরআনুল কারীমের পরিষ্কার নির্দেশ— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর।'[৯৮]

তৃতীয় আয়াত : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۝۱۲۲

সুতরাং তাদের (মুসলিমদের) প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের 'তাফাক্কুহ' (গভীর প্রজ্ঞা) অর্জনের চেষ্টা করে এবং এবং যখন ফিরে আসবে তখন তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে? ফলে তারা (গোনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।[৯৯]

---

৯৭. মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/২০
৯৮. ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ১/১৪
৯৯. সূরা তাওবা (৯), আয়াত ১২২

এ আয়াত থেকে তাকলীদের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কিছু লোক যেন তাফাক্কুহ তথা দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করে। এ থেকে বুঝে আসে, দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করা তথা ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া সব মুসলিমের জন্য জরুরি নয়; বরং একটা বড় সম্প্রদায় থেকে কিছু লোক তাফাক্কুহ অর্জন করবে। তারা ফিরে এসে কওমের লোকদের দ্বীনের বিধি-বিধান শেখাবে। কওমের লোকেরা তা গ্রহণ করে দ্বীনের উপর আমল করবে।

অতএব ফকীহগণের কর্তব্য, সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া আর সাধারণ মানুষের দায়িত্ব, ধর্মের উপর চলার জন্য ফকীহদের শিক্ষা গ্রহণ করা।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. (৩০৫-৩৭০ হিজরী) লেখেন–

فَأَوْجَبَ الْحَذَرَ بِإِنْذَارِهِمْ، وَأَلْزَمَ الْمُنْذَرِيْنَ قَبُوْلَ قَوْلِهِمْ.

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন ফকীহদের সতর্কবাণী শুনে সতর্ক হওয়া এবং তাঁদের দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা।[১০০]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিজরী) রহ.ও একই কথা বলেছেন–

فَأَوْجَبَ الْحَذَرَ بِإِنْذَارِهِمْ وَأَلْزَمَ الْمُنْذَرِينَ قَبُولَ قَوْلِهِمْ

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন ফকীহদের সতর্কবাণী শুনে সতর্ক হওয়া এবং তাঁদের দিক-নির্দেশনা কবুল করা।[১০১]

মোটকথা, এই আয়াত নির্দেশ দিয়েছে– প্রত্যেক কওমের কিছু লোক ফকীহ হও, আর বাকিরা ফকীহদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ কর। তাকলীদ কি এছাড়া অন্য কিছু? কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার জন্য কোনো ফকীহের শিক্ষা ও নির্দেশনা গ্রহণ করার নামই তো তাকলীদ।

---

১০০. আহকামুল কুরআন ৩/১৮২-১৮৩

১০১. তাফসীরে কাবীর ১০/১৫৩ (সূরা নিসা, ৮৩ নং আয়াতের তাফসীর)

চতুর্থ আয়াত : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیْطٰنَ اِلَّا قَلِیْلًا ۝

তাদের (সাধারণ মুসলিমদের) কাছে যখন শান্তির বা ভীতির কোনো সংবাদ আসে, তারা (যাচাই না করেই) তা প্রচার করে বেড়ায়। অথচ বিষয়টি যদি তারা রাসূল ও উলুল আমরের নিকট পেশ করত তাহলে তাদের মধ্যে যারা 'ইস্তেম্বাত' করতে পারে তারা বিষয়টি (র যথার্থতা) জানতে পারত। (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হতো, তবে তোমরা অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে, অল্পসংখ্যক ছাড়া।[১০২]

এই আয়াত মুজতাহিদের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার পক্ষে শক্তিশালী দলীল। এতে বলা হয়েছে, যাদের ইস্তেম্বাত করার যোগ্যতা আছে তারা ইস্তেম্বাত করে সমস্যার সমাধান পেশ করবেন, আর অন্যরা সে অনুযায়ী আমল করবে। এটাই তো তাকলীদ। সহজে বোঝার জন্য বিষয়টি একটু খুলে বলছি।

আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের পটভূমি) হলো– মদীনার মুনাফিকরা যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গুজব রটাত। সহজ সরল মুসলিমরা তাদের কথা বিশ্বাস করে এসবের প্রচারণা করা শুরু করে দিত। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতো। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে মুমিনদেরকে এহেন কর্ম থেকে বারণ করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে তাদের কাছে কোনো খবর পৌঁছালে তারা যেন তা প্রচার না করে; বরং রাসূল ও উলুল আমরের[১০৩] নিকট বিষয়টি পৌঁছে দেয়।

---

১০২. সূরা নিসা (৪), আয়াত ৮৩

১০৩. এই আয়াতেও উলুল আমর দ্বারা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এবং শাসকবর্গ উভয় শ্রেণি উদ্দেশ্য। ইমাম ইবনে আবী হাতেম রহ. (৩২৭হি.) বলেন– উলুল আমর সম্পর্কে =

উলুল আমরের নিকট পৌঁছালে তারা কী করবে? আয়াতটিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উলুল আমরের নিকট উপস্থিত হলে তাদের মধ্যে যাদের 'ইস্তেম্বাত' করার যোগ্যতা আছে তারা ইস্তেম্বাত করবে। অর্থাৎ বিষয়টির যথার্থতা যাচাই করবে এবং মূল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে।

তো আয়াতে নতুন কোনো খবর এলে এর বাস্তবতা যাচাই করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যাদের ইস্তেম্বাতের যোগ্যতা আছে। ইস্তেম্বাত কাকে বলে? আবুল কাসেম রাগেব ইস্পাহানী রহ. (৫০২ হিজরী) বলেন–

> اَلْإِسْتِنْبَاطُ: اِسْتِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ أَصْلِهِ، كَاسْتِنْبَاطِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ، وَالْجَوْهَرِ مِنَ الْمَعْدِنِ.
>
> ইস্তেম্বাত হলো, কোনো বস্তুকে তার উৎস থেকে বের করা। যেমন কূপ থেকে পানি তোলা এবং খনি থেকে মণি উত্তোলন করা।[১০৪]

'যাদের ইস্তেম্বাত করার যোগ্যতা আছে' এ কথার উদ্দেশ্য কী? আবু জাফর নাহ্হাস রহ. (৩৩৮ হিজরী) বলেন–

> اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ: أَيْ يَسْتَخْرِجُوْنَهُ بِالْمَسْأَلَةِ.
>
> যারা ইস্তেম্বাত করতে পারে– এর দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা অনুসন্ধান করে ঘটনার মূল রহস্য বের করার যোগ্যতা রাখেন।[১০৫]

ইবনে জারীর তবারী রহ. (৩১০ হিজরী) বলেন–

> اَلَّذِينَ يَبْحَثُونَ عَنْهُ وَيَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْهُمْ.
>
> এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উলুল আমরদের মধ্যে যারা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করার ক্ষমতা রাখেন।[১০৬]

= দুটি মত রয়েছে : শাসকগোষ্ঠী ও উলামায়ে কেরাম। –দ্রষ্টব্য : তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ৩/১০১৫

আবু বকর জাস্সাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন–

يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْوُلَاةِ؛ لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

উলুল আমর দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম ও শাসকবৃন্দ উভয়ই উদ্দেশ্য। কেননা, উলুল আমর শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। –আহমাকুল কুরআন ২/২৬৯

১০৪. তাফসীরে রাগেব ইস্পাহানী ২/১৩৫১

১০৫. ইরাবুল কুরআন ১/২৭৭

১০৬. তফসীরে তবারী ৭/২৫৫

সুতরাং আয়াতে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এর খোলাসা হলো–

১. নতুন কোনো খবরাবর শোনা গেলে সাথে সাথেই তা প্রচার করা শুরু করবে না।

২. সংবাদটা রাসূল ও উলুল আমরের সামনে পেশ করবে।

৩. তাদের মধ্যে যারা ইস্তেম্বাত তথা অনুসন্ধান করে তত্ত্ব উদ্ঘাটনের ক্ষমতা রাখেন, তারা ঘটনার যথার্থতা নিয়ে গবেষণা করবেন।

৪. ইস্তেম্বাতের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাচাই-বাচাইয়ের পর যে দিক-নির্দেশনা দান করেন, সাধারণ মানুষ তা মেনে চলবে।

আয়াতটি সামাজিক শৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও 'তাদের মধ্যে যারা ইস্তেম্বাত করতে পারে' আয়াতের এ অংশ থেকে একটা বিষয় বুঝে আসে যে, ইস্তেম্বাত করা তথা কোনো বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে সঠিক সমাধান বের করার যোগ্যতা সবার নেই। কিছু লোক থাকবে, যাদের ইস্তেম্বাতের যোগ্যতা থাকবে। তারা মুসলিমদের সমস্যাবলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন এবং সঠিক সমাধান বের করার চেষ্টা করবেন। আর বাকিরা তাদের নির্দেশনা মোতাবেক আমল করবে।

সহজ কথায়, এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কিছু মানুষ ইস্তেম্বাত করবে আর অন্যরা তাদের তাকলীদ করবে, তাদের কথা মতো আমল করবে। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. (৩৭০ হিজরী) বলেন–

فَقَدْ حَوَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَعَانِيَ، مِنْهَا: أَنَّ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بَلْ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا: أَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ اسْتِنْبَاطَهُ وَالتَّوَصُّلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِرَدِّهِ إِلَى نَظَائِرِهِ مِنْ الْمَنْصُوصِ، وَمِنْهَا: أَنَّ الْعَامِّيَّ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ...

অর্থাৎ আয়াতটি কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করে :

১. এমন বহু বিষয় আছে যেগুলোর সমাধান 'মানসূস' না। অর্থাৎ এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য নেই। বরং মানসূস থেকে বের করতে হয়।

২. আলেমদের কর্তব্য, মানসূস আহকাম থেকে ইস্তেম্বাত করে নব-উদ্ভাবিত ঘটনাবলির সমাধান বের করা।

৩. সাধারণ মানুষের দায়িত্ব, এসব নির্দেশনার ক্ষেত্রে আলেমদের তাকলীদ করা।...[১০৭]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (৮৪৯-৯১১ হিজরী) 'আল-ইকলীল' কিতাবে লেখেন−

> وَتَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ الْإِرْجَافِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الرُّجُوْعَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْفُتْيَا.
>
> এ আয়াত প্রমাণ করে, মুসলিমদের মাঝে গুজব ছড়ানো হারাম এবং আহকাম জানার জন্য আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক[১০৮]

এসব আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত দ্বারা তাকলীদের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা, বরং আবশ্যকীয়তা প্রমাণিত হয়।

❀ ❀ ❀

---

১০৭ আহকামুল কুরআন ৩/১৮৩

১০৮ মাহাসিনুত তাবীল, কাসেমী ৩/২৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হাদীস শরীফের আলোকে মাযহাব

মাযহাব অনুসরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বহু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এখানে আটটি হাদীস পেশ করা হলো।

প্রথম হাদীস

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَه إِلى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِيْ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِى، لَا آلُوْ. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِيْ رَسُوْلَ اللهِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন, তোমার কাছে কোনো মোকদ্দমা আসলে কীভাবে ফায়সালা করবে?

মুআয রাযি. বললেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী ফায়সালা করব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যদি বিষয়টির ফায়সালা কুরআনে না থাকে?

মুআয রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী মীমাংসা করব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহয় বিষয়টি না পাওয়া যায়?

মুআয রাযি. বললেন, তাহলে আমি নিজের রায় অনুযায়ী ইজতিহাদ করব। ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করবো না।

মুআয রাযি. বলেন, আমার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর শোকর, তিনি আপন রাসূলের পক্ষ হতে প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যা তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে।[১০৯]

হাদীসটি মুজতাহিদের মাযহাব অনুসারে আমল করার বৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল। মুআয রাযি.কে ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় খুঁজে পাবে না সেসব বিষয়ে কীভাবে ফায়সালা করবে? তিনি উত্তর দিয়েছেন, আমি নিজ রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে ফায়সালা করব। মুআয রাযি.-এর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করেছেন।

সুতরাং মুআয রাযি. কুরআন হাদীস থেকে যেমন ফায়সালা করবেন, ইজতিহাদ করেও ফায়সালা করবেন। তাঁর শিক্ষা ও ফায়সালা গ্রহণ করা ইয়েমেনবাসীর জন্য আবশ্যক। সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে উল্লেখকৃত ফায়সালা গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক, তেমনি কুরআন হাদীস থেকে ইজতিহাদ করে পেশকৃত সমাধানও গ্রহণ করা আবশ্যক। আর কারও ইজতিহাদী রায় মোতাবেক আমল করার নামই তো মাযহাব মানা।

---

১০৯ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২০০৭, ২২০৬১, ২২১০০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯২, ৩৫৯৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৩২৭, ১৩৭৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ২৩৪৪২; আলমুনতাখাব মিন মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ১২৪; মুসনাদে তয়ালিসী, হাদীস ৫৬০; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৪

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, মুজতাহিদের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট, বরং আনন্দিত। হাদীসটিতে স্পষ্ট এসেছে, মুআয রাযি.-এর ইজতিহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি প্রকাশ করেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশেই মুআয রাযি. ইয়েমেনবাসীর ইমাম, আর ইয়েমেনবাসী মুআয রাযি.-এর মুকাল্লিদ।[১১০]

সনদ পর্যালোচনা

হাদীসটির সনদ শক্তিশালী ও দলীলযোগ্য। অনেক ইমাম হাদীসটি সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ বাযদাভী রহ. (৪৮২ হিজরী) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন–

وَهٰذَا نَصٌّ صَحِيحٌ.

হাদীসটি সহীহ।[১১১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী) আহলে হাদীস ভাইদের আস্থাভাজন আলেমদের শীর্ষ তালিকায়। তিনি বলেন–

وَهٰذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

(প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ সে দেশে প্রচলিত মাযহাব অনুযায়ী আমল করবে)

১১০. প্রকাশ থাকা আবশ্যক, ইয়েমেনবাসীর তাকলীদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রা.কে অনুসরণীয় ইমাম সাব্যস্ত করে এ কথাও শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে দেশে যার মাযহাব চালু হবে, সে দেশবাসীকে তার মাযহাবই অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং এ হাদীসের শিক্ষামতে বাংলাদেশে যেহেতু হানাফী মাযহাব চালু আছে, তাই এ দেশবাসীকে হানাফী মাযহাবই অনুসরণ করতে হবে। –সম্পাদক

মুহতারাম সম্পাদক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম হাদীসটির অধীনে এখানে যে শিক্ষাটির কথা উল্লেখ করেছেন, তা সালাফ ও খালাফ তথা আমাদের মহান পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেক ইমামের বক্তব্য। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

১১১. কানযুল ওছূল ইলা মারিফাতিল উছূল (উছূলুল বাযদাভী), পৃ. ৫৫৯

মুসনাদ ও সুনানের হাদীসগ্রন্থসমূহে এই হাদীসটি জায়্যিদ (উত্তম) সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১১২]

হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসের ইমাম ইবনে কাসীর রহ. (৭০১-৭৭৪ হিজরী) বলেছেন–

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

মুসনাদ ও সুনানের হাদীসগ্রন্থসমূহে এই হাদীস জায়্যিদ সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১১৩]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৭৪৮ হিজরী) বলেন–

إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.

হাদীসটির সনদ 'সালেহ'।[১১৪]

এবং মুখতাসারুল ইলাম গ্রন্থে যাহাবী রহ. আরও বলেছেন–

هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه صحيح.

হাদীসটির সনদ হাসান এবং এতে উল্লিখিত বক্তব্যটি সহীহ।[১১৫]

শায়েখ ছালেহ উসাইমীন রহ., যিনি সৌদি আরবের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম এবং আহলে হাদীস ভাইয়েরাও যাঁর খুব কদর করেন, তিনি লেখেন–

تَكَلَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلٰى هَذَا الْحَدِيْثِ وَضَعَّفَهُ، وَلٰكِنَّ الْمُؤَلِّفَ يَرٰى أَنَّ إِسْنَادَهُ جَيِّدٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

কোনো কোনো আলেম এই হাদীসকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু ইবনে তাইমিয়ার নিকট হাদীসটির সনদ 'জায়্যিদ' (দলীলযোগ্য)। আর এ মতই অগ্রগণ্য।[১১৬]

---

১১২ মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪; মুকাদ্দিমাতুত তাফসীর (শরহু মুকাদ্দিমাতিত তাফসীর-এর মূলপাঠ) পৃ. ২৫৪

১১৩ তাফসীরে ইবনে কাসীর, (ভূমিকা) ১/৩৫

১১৪ সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/৪৭২

১১৫. আলমুওয়াফাকাত, শাতেবী-এর টীকা (দারু ইবনে আফ্‌ফান, সৌদি আবর, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হিজরী) ৮/৪২৪

১১৬. শরহু মুকাদ্দিমাতুত তাফসীর, পৃ. ২৫৫

হাদীসটিকে আরও যারা সহীহ বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম ও কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো–

এক. আবুল আব্বাস ইবনুল কাস রহ. (৩৩৫ হিজরী)।[১১৭]

দুই. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত উরফে খতীব বাগদাদী রহ. (৩৯২-৪৬৩ হিজরী)।[১১৮]

তিন. আবুল আমালী আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ জুয়াইনী উরফে ইমামুল হারামাইন রহ. (৪১৯-৪৭৮ হিজরী)।[১১৯]

চার. ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আন্দালুসী উরফে ইবনুল আরাবী রহ. (৪৬৮-৫৪৩ হিজরী)।[১২০]

পাঁচ. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব উরফে ইবনুল কাইয়িম রহ. (৭৫১ হিজরী)।[১২১]

মোটকথা, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। এই হাদীসের সনদ ও মতন তথা সূত্র ও বক্তব্যে কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য হওয়ার শক্তিশালী আরও অনেক দলীল আছে। সামনে এ কিতাবের পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসটির ব্যাপারে যাদের কোনো ধরনের সন্দেহ হয়, পরিশিষ্টের আলোচনা দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

দ্বিতীয় হাদীস

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

---

১১৭. দ্রষ্টব্য : আততালখীসুল হাবীর ৪/১৮২
১১৮. দ্রষ্টব্য : আলফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ১/৫৫৭-৫৫৮
১১৯. দ্রষ্টব্য : আলবুরহান ফী উছূলিল ফিকহ ২/৭৭২ (৭২০)
১২০. দ্রষ্টব্য : আরিযাতুল আহওয়াযী ৬/৭২-৭৩
১২১. দ্রষ্টব্য : ইলামুল মুআক্কিঈন ১/৪০২-৪০৪

মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল এর ব্যতিক্রম। (এগুলো মৃত্যুর পরও বন্ধ হয় না, চলতে থাকে।)

এক. সদাকায়ে জারিয়া।

দুই. এমন ইলম, যার দ্বারা উপকৃত হতে থাকে।

তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করতে থাকে।[১২২]

এই হাদীস তাকলীদের বৈধতা প্রমাণ করে। কারণ হাদীসটিতে বলা হয়েছে, মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি আমল চলতে থাকে। একটি হলো ওই ইলম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ হলো– সে ইলম অনুযায়ী মানুষের আমল চলতে থাকা। আর কারও ইলম অনুযায়ী আমল করার নামই তো তাকলীদ। অন্য হাদীসে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু কাতাদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِيْ يَبْلُغُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

মৃত্যুর পর মানুষ যা রেখে যায় তার মধ্যে উত্তম হলো– তিনটি বস্তু : (১) নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। (২) সদাকায়ে জারিয়া, যার সাওয়াব তার কাছে পৌঁছাতে থাকে। এবং (৩) **এমন ইলম, যে অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর আমল চলতে থাকে।**[১২৩]

হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী মুনযিরী রহ. (৫৮১-৬৫৬ হিজরী) বলেন–

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১২৪]

---

১২২. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮৮০; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৩৭৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৬৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩০১৬

১২৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪১; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস (১০৮৬৩), সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৩, ৪৯০২

১২৪. আততারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস ১২৪; ফয়যুল কাদীর ৩/৪৯০ (৪০৮৪)

এই হাদীসে ওই ইলমের প্রসংশা করা হয়েছে, আলেমের মৃত্যুর পর যার উপর আমল চলতে থাকে। ইলম দ্বারা কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত সব ধরনের ইলমই উদ্দেশ্য। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, সবই ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

وَالْمُرَادُ بِهِ: الْعِلْمُ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ عِلْمُ التَّفْسِيرِ أَيْضًا وَالْحَدِيثُ وَالْفِقْهُ وَأُصُولُهُ.

ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য শরীআতের ইলম। এর মধ্যে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও উছূলে ফিকহ সবই শামিল।[১২৫]

ইমাম হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ মুযহিরী রহ. (৭২৭ হিজরী) বলেন–

وَالثَّانِي: «الْعِلْمُ الَّذِيْ يُنْتَفَعُ بِهِ» يَعْنِيْ: يُعَلِّمُ أَحَدًا أَوْ جَمَاعَةً مَسْأَلَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ، فَيَعْمَلُوْنَ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَيُعَلِّمُوْنَهَا غَيْرَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَحْصُلُ لَهُ بِذٰلِكَ ثَوَابٌ.

(হাদীসটিতে যে তিনটি বিষয়ে প্রসংশা করা হয়েছে এর) দ্বিতীয়টি হলো উপকারী ইলম। অর্থাৎ কেউ মানুষকে শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল শেখাল। তারা এর উপর আমল করতে থাকল এবং অন্যদের শিক্ষা দিল। এসব আমলের সওয়াব আলেমের আমলনামায় যুক্ত হবে।[১২৬]

সুতরাং হাদীসটি প্রমাণ করে, কোনো আলেমের রেখে যাওয়া ফিকহ ও ইলম অনুযায়ী আমল করা নিন্দনীয় নয়; বরং প্রশংসনীয়। আর কারও ইলম ও ফিকহ অনুযায়ী আমল করার অর্থ হলো তার মাযহাব অনুসারে আমল করা।

---

১২৫. শারহু মাছাবীহিস সুন্নাহ, ইবনুল মালাক ১/১৯৩; মিরকাতুল মাফাতীহ, মোল্লা আলী কারী ১/২৬৯

১২৬. আল-মাফাতীহ ফী শারহিল মাছাবীহ ১/৩০৩

তৃতীয় হাদীস

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু মূসা আশআরী রাযি. বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً. فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন এর দৃষ্টান্ত হলো– যমীনে প্রতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়।

কোনো কোনো ভূমি থাকে উর্বর, যা বৃষ্টির পানি শুষে নেয় এবং প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা ও তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। ফলে তা দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষকে উপকৃত করেন; তারা নিজেরা পান করে, (পশুকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো জমি আছে, যা একেবারে শক্ত ও মসৃণ; তা না পানি আটকে রাখে, আর না ঘাসপাতা উৎপাদন করে।

এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে 'ফিক্হ' (গভীর ও সঠিক জ্ঞান) অর্জন করে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা দিয়ে সে উপকৃত হয়। সে নিজে ইলম শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়নি এবং আমাকে আল্লাহ তাআলা যে হেদায়েত দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা কবুল করেনি।[১২৭]

---

১২৭. সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৮২

হাদীসটির ব্যাখ্যা খতীব বাগদাদী রহ.-এর এই বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে–

قَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ مَرَاتِبَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهِينَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُذَّ مِنْهَا شَيْءٌ، فَالْأَرْضُ الطَّيِّبَةُ هِيَ مِثْلُ الْفَقِيهِ الضابطِ لِمَا رَوٰى، الْفَهِمُ لِلْمَعَانِي، الْمُحْسِنُ لَرَدَّ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالْأَجَادِبُ الْمُمْسِكَةُ لِلْمَاءِ الَّتِي يَسْتَقِي مِنْهَا النَّاسُ، هِيَ مِثْلُ الطَّائِفَةِ الَّتِي حَفِظَتْ مَا سَمِعَتْ فَقَطْ، وَضَبَطَتْهُ، وَأَمْسَكَتْهُ، حَتّٰى أَدَّتْهُ إِلٰى غَيْرِهَا مَحْفُوظًا غَيْرَ مُغَيَّرٍ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِقْهٌ تَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلَا فَهْمٌ بِالرَّدِّ الْمَذْكُورِ وَكَيْفِيَّتِهِ.

وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَ، وَلَا ضَبَطَ، فَلَيْسَ مِثْلَ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ، وَلَا مِثْلَ الْأَجَادِبِ، بَلْ هُوَ مَحْرُومٌ، وَمِثْلُهُ مِثْلُ الْقِيعَانِ، الَّتِي لَا تُنْبِتُ كَلَأً، وَلَا تُمْسِكُ مَاءً.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে ফকীহ ও ও ফিকহ শিক্ষার্থীদের সকল স্তরের বিবরণ পেশ করেছেন। কোনো স্তর বাদ দেননি।

উর্বর ভূমি হলো– ওই ফকীহের দৃষ্টান্ত, যিনি হাদীস ভালো করে আয়ত্ত করেছেন, হাদীসের অর্থ-মর্ম উত্তমরূপে বুঝেছেন এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান কুরআন-সুন্নাহ থেকে বের করতে পারেন।

পানি সংরক্ষণকারী শক্ত জমি হলো– ওই মুহাদ্দিসের উদাহরণ, যিনি হাদীস মুখস্থ করেছেন, ‘যবত’ ও হেফাযত করেছেন, এরপর কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে ফকীহ নন, হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করার যোগ্যতা রাখেন না।

> আর যে হাদীস হেফয করেনি, হাদীস শিখেনি সে উর্বর ভূমির মতোও নয় এবং পানি সংরক্ষণকারী কঠিন ভূমির মতোও নয়। সে মাহরূম, হতভাগা। তার উদাহরণ হলো ওই যমিনের মতো, যা একেবারে কঠিন ও সমতল, না পানি আটকে রাখে, আর না ঘাসপাতা উৎপাদন করে।[১২৮]

হাদীসখানি মাযহাব অনুসারে আমল করার শক্তিশালী একটি দলীল। হাদীসটি থেকে স্পষ্ট, মুসলিমদের মধ্যে তিনটা শ্রেণি থাকবে। এক শ্রেণির মানুষ ফকীহ, যারা ইজতিহাদ করে হুকুম হুকুম-আহকাম আহরণ করার যোগ্যতা রাখবেন। আর বাকি দুই শ্রেণি ফকীহ নয়, ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না। এক শ্রেণি তো আলেমই নয়। আরেক শ্রেণি আলেম, কিন্তু ইজতিহাদ করে মাসআলা-মাসায়েল ইসতেম্বাত করতে পারেন না।

প্রশ্ন হলো, এই দুই শ্রেণির মানুষ আমল করবে কীভাবে? আমল করার জন্য তো আমলের বিধি-বিধান জানতে হবে। অথচ তারা নিজে নিজে বিধান আহরণ করার ক্ষমতা রাখে না!

তাদের জন্য শরীআতের আহকাম পালন করার সুরত একটাই। আর তা হলো– ফকীহদের বাতানো তরীকা অনুযায়ী আমল করা, যার পরিচিত নাম মাযহাব মানা। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যারা ফকীহ নয় তাদের জন্য ফকীহের ফিকহ ও মাযহাব অনুসরণ করা অপরিহার্য।

চতুর্থ ও পঞ্চম হাদীস

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

> نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَه، حَتّٰى يُبَلِّغَه غَيْرَه، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.
>
> অর্থাৎ আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে সজীবতা দান করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেছে। এরপর মুখস্থ করেছে

১২৮. আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ১/২৩৩

> এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কারণ ফিক্‌হের অনেক বাহক তার চেয়ে বড় ফকীহের নিকট তা পৌঁছে দেয় এবং ফিক্‌হের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়।[১২৯]

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে সজীবতা দান করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে। এরপর কণ্ঠস্থ করেছে (এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে)। কারণ ফিকহের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়।[১৩০]

আগে বিস্তারিত পড়েছেন, হাদীসদুটিতে উল্লিখিত 'ফিক্‌হ' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস। তাই فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ এর অর্থ হলো– 'অনেক মুহাদ্দিস ফকীহ নয়'।

এও পড়ে এসেছেন যে, ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ. (৩৯২-৪৬৩ হিজরী) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন–

> فَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَافِظًا، وَلَا يَكُونُ فِيهِ فَقِيهًا.
>
> হাদীসখানিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন, অনেক সময় এমন লোকও মুহাদ্দিস হন, যিনি হাদীস মুখস্থ করেছেন, কিন্তু হাদীস থেকে ফিকহ আহরণ করতে পারেন না।[১৩১]

---

১২৯. জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৬; মুসনাদে তয়ালিসী, হাদীস ৬১৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৫৯০; সুনানে দারেমী (ফতহুল মান্নান), হাদীস ২৪০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৭ ও ৬৮০

১৩০. মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৩৪১৬

১৩১. আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/১৪৬

এখান থেকে জানা গেল, হাদীসের জ্ঞান লাভকারী অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ দুই শ্রেণির। এক শ্রেণির মুহাদ্দিস ফকীহ, যাদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা আছে। আরেক শ্রেণির মুহাদ্দিস ফকীহ নন, যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জিত হয়নি। এই হাদীসদুটিতেও কোনো অস্পষ্টতা রাখা হয়নি যে, অনেক মুহাদ্দিস ফকীহের স্তরে উপনীত হতে পারবে না। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসায়েল ইসতেম্বাত করতে পারবে না। ইমাম আহমদ রহ.-এর বক্তব্য আগে উদ্ধৃত হয়েছে যে–

مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

মুহাদ্দিসগণের মাঝে ফিক্হ খুব কমই পাওয়া যায়।[১৩২]

বলাবাহুল্য যে, এই ধরনের মুহাদ্দিসগণের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার জন্য এছাড়া আর কোনো পথ নেই যে, যারা ইজতিহাদ করে মাসায়েল বের করতে পারেন, তাদের তাকলীদ করে আমল করা। সুতরাং সাধারণ মানুষের কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের জন্য তাকলীদ না করে কোনো উপায় নেই।

ষষ্ঠ হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা এভাবে ইলম উঠিয়ে নেবেন না যে, তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নেবেন; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন আর কোনো আলেম বাকি থাকবে না, তখন মানুষ তাদের 'মুকতাদা' (অনুসরণীয়) বানাবে জাহেলদের। জাহেল লোকদের কাছে দ্বীনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে।

---

১৩২. তবাকাতুল হানাবিলা, ইবনে আবী ইয়ালা ১/৩২৯

তারা যোগ্য না হয়েও সে বিষয়ে সমাধান পেশ করবে। ফলে এরা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ্ করবে।[১৩৩]

এই হাদীস থেকে কয়েকটা বিষয় জানা যায় :

এক. মুসলিমদের মাঝে দুটি শ্রেণি থাকবে। আলেম ও সাধারণ মানুষ।

দুই. সাধারণ মানুষ যতদিন দাবিদার আলেমদের পিছনে না পড়ে বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবে, ততদিন পর্যন্ত সবাই হক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

তিন. একটা সময় আসবে, যখন কুরআন ও সুন্নাহর গভীর ইলম বাকি থাকবে না, তা তুলে নেওয়া হবে।

চার. ইলম না থাকার অর্থ এ নয় যে, কাগজ, কলম, কিতাবাদি ইত্যাদি ইলমের উপাদানগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ইলম তুলে নেওয়ার এ মর্মও নয় যে, কিতাবপত্র (বা 'নেট') থেকে হরফ ও শব্দ-বাক্য মুছিয়ে দেওয়া হবে; বরং ইলম উঠিয়ে নেওয়ার মানে হচ্ছে, যেসব বক্ষ ইলম ধারণ করেছে, যে সকল মস্তিষ্ক ইলমের গভীরতায় ডুব দিয়েছে, একে একে সেসব আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বিদায় হয়ে যাবেন।

পাঁচ. নূরানী সিনার অধিকারী আলোকিত ব্যক্তিগণের তিরোধানের পর এমন কিছু লোকের আভির্ভাব হবে, যাদের দ্বীনের প্রজ্ঞা ও গভীর জ্ঞান অর্জন হয়নি।

ছয়. সাধারণ মানুষ গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুজতাহিদ হিসাবে আত্মপ্রকাশকারী এসব পণ্ডিতবর্গের দ্বারস্থ হবে।

সাত. শরীআতের পরিভাষায় এই দাবিদার মুজতাহিদেরা মূর্খ-জাহেল, শরীআতের ফিকহ ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত।

আট. এই জাহেলরা না জেনে না বুঝে মানুষকে শরীআতের বিধি-বিধান শোনাবে। পরিণতিতে সবাই গোমরাহ হবে।

---

১৩৩. সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

এই হাদীস প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো দ্বীনী বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমদের জিজ্ঞেস করা। তারা জীবিত না থাকলে তাদের রেখে যাওয়া ইলম ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞ আলেমগণ বিদ্যমান থাকবেন আর মানুষ তাঁদের শরণাপন্ন হবে বা তাঁদের রেখে যাওয়া ব্যাখ্যা ও ফতোয়া অনুযায়ী শরীআতের বিধান পালন করবে, ততদিন পর্যন্ত গোমরাহী তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমগণ বিদায় হয়ে যাওয়ার পর যদি সাধারণ মানুষ দাবিদার আলেমদের নিজেদের ইমাম বানিয়ে বসে, তাদের কথামতো আমল করতে শুরু করে, তাহলে পরিণতি হবে খুব ভয়াবহ। তখন গোমরাহির সয়লাব বয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ ও মূর্খ মুজতাহিদ সবাই সেই সয়লাবে ভেসে যাবে।

সুতরাং হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, যতদিন পর্যন্ত মুজতাহিদ ইমামদের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা মোতাবেক কুরআন ও হাদীসের হুকুম-আহকাম পালন করা হবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা আসবে না। অতএত তাঁদের মাযহাব অনুসারে আমল করা শুধু জায়েযই নয়, জরুরি। কেননা বর্তমানে এমন বিজ্ঞ আলেম পাওয়া বিরল, যিনি ইজতিহাদ করে কুরআন ও হাদীস থেকে বিধান আহরণ করতে পারেন। তাই এই যমানায় গোমরাহির কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে পূর্বেকার বিজ্ঞ আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের তাফসীর ও ফতোয়া গ্রহণ না করে উপায় নেই।

সপ্তম হাদীস

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবায় বলেছেন–

مَا بَالُ أَقْوَامٍ! لَايُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلَايُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلَايَعِظُوْنَهُمْ وَلَايَأْمُرُوْنَهُمْ وَلَايَنْهَوْنَهُمْ؟ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ! لَايَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَتَفَقَّهُوْنَ وَلَايَتَّعِظُوْنَ؟

وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَعِظُوْنَهُمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ.

ওই কওমের কী হলো, যারা নিজ প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের ইলম, দ্বীনের বিধি-বিধান শেখায় না, তাদের নসীহত করে না এবং (ভালো কাজের) আদেশ ও (মন্দ কাজের) নিষেধ করে না? আর সেই গোত্রেরই-বা কী হলো, যারা নিজ প্রতিবেশীদের থেকে দ্বীনের ইলম ও বিধি-বিধান শিখছে না? তাদের থেকে নসীহত গ্রহণ করছে না?

ওই কওম যেন প্রতিবেশীদেরকে শরীআতের ইলম ও হুকুম-আহকাম শেখায়, উপদেশ দেয় ও আদেশ-নিষেধ করে এবং সেই গোত্রও যেন প্রতিবেশীদের থেকে শরীআতের ইলম ও হুকুম-আহকাম শিখে এবং তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। (অবশ্যই তারা এমনটা করবে।) অন্যথায় আল্লাহর কসম! অচিরেই আমি তাদেরকে শাস্তি দেব।

আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাযি. বলেন, এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। তখন নবীজী কাদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দিয়েছেন, এ নিয়ে কিছু লোক বলাবলি শুরু করেছে।

তাদের আলোচনা নবীজীর কাছে পৌঁছালে তিনি বলেছেন—

اَلْأَشْعَرِيِّيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ، وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَابِ.

অর্থাৎ আমি আশআরীদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দিয়েছি। তারা ফকীহ সম্প্রদায়, আর তাদের প্রতিবেশীরা কূপের পাশে বেদুঈন জীবন যাপন করছে। (দ্বীন না জানার কারণে) তাদের মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই।[১৩৪]

---

১৩৪. মুজামুল কাবীর, তাবরানী : আততারগীব ওয়াততারহীব ১/৮২-৮৩ (হা. ২০৫); মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৪০২-৪০৩ (৭৫৭)

في إسناده بكيرُ بن معروف، ضعفه أحمد -في رواية- وابنُ المبارك، وقال البخاريُّ عن أحمدَ و أَبُوْ حاتم: ما أرى به بأساً، وقال النسائي وأحمد : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: فهو حسن الحديث. وفيه علقمة بن عبد الرحمن، كناه هشام بن عبيد الله الرازي: أبا سلمة، وهو من التابعين من أولاد الصحابة. =

এ হাদীস তাকলীদ করার বৈধতা প্রমাণ করে। আশআরী সাহাবীগণ ছিলেন ফকীহ্। তাদের প্রতি নির্দেশ হলো– নিজ প্রতিবেশীদেরকে, যাদের দ্বীনী ইলম নেই তাদেরকে ফিক্‌হ তথা কুরআন-সুন্নাহ ও দ্বীনের বিধি-বিধান শেখান। আর তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি হুকুম হলো– ফকীহ্দের থেকে ফিকহ্ অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করা। এভাবে ফকীহ্ ও মুজতাহিদের বাতানো ফিকহ্ অনুসারে আমল করার নামই তো তাকলীদ।

একটি আপত্তির জবাব

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ্ দ্বারা যখন তাকলীদের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়, তখন কেউ কেউ এখানে একটা অহেতুক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা যে তাকলীদ প্রমাণিত হয় তা হলো– তাকলীদে মুতলাক, তাকলীদে শাখছী নয়।

অর্থাৎ তাকলীদ দুই প্রকার। তাকলীদে মুতলাক বা সাধারণ তাকলীদ ও তাকলীদে শাখছী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ। সকল বিষয়ে নির্ধারিত এক ইমামের অনুসরণ করা হলো তাকলীদে শাখছী, আর নির্দিষ্ট কোনো ইমামের অনুসরণ না করে যখন যে ইমামের মাযহাব জানা যায় বা যে বিষয়ে যে ইমামের ফতোয়া পাওয়া যায়, তার অনুসরণ করা অর্থাৎ একাধিক ইমামের অনুসরণ করার নাম তাকলীদে মুতলাক।

সালাফী ভাইদের কিছু সংখ্যকের বক্তব্য হলো, আমরা তাকলীদে মুতলাককে হারাম বলি না, তাকলীদে শাখছীকে হারাম বলি। আপনাদের দলীলাদি তাকলীদে মুতলাকের বৈধতা প্রমাণ করে, তাকলীদে শাখছীর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে না।

= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: ارْمِ بِهِ. وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

وصدره المنذري في الترغيب من صنيعه بما يشير إلى قوة الحديث.

والحديث رواه ابن عساكر في تاريخه عن أبزى الخزاعي، وهو الصحيح، قال ابن السكن فيما حكاه الحافظ في الإصابة: روي عنه حديث واحد وإسناده صالح.

জবাব : সালাফী ভাইদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে দুটো বিষয় জানতে চাবো।

এক. পূর্বপুরুষদের তাকলীদ সম্পর্কিত যে আয়াত পেশ করে আপনারা তাকলীদ হারাম হওয়ার দলীল দেন, সেখানে কি এ কথা আছে, কাফেররা পূর্বপুরুষদের তাকলীদে শাখছী করত, এ জন্য তাকলীদ করা হারাম? আর তারা যদি তাকলীদে মুতলাক করত, তাহলে বাপ-দাদার তাকলীদ করা হারাম হতো না? এমন কথা তো সেই আয়াতে নেই; বরং আয়াতটির বাহ্যিক দিক লক্ষ করলে বোঝা যায়, মুশরিকরা তাদের পূর্বপুরুষদের তাকলীদে মুতলাকই করতো। তারা একজন নয়; একাধিক পূর্বপুরুষের আনুগত্য করত। তাকলীদ জায়েয হওয়ার বিপরীত যে আয়াতটি পেশ করা হয় তা হলো–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর তখন তারা বলে, না, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েরই অনুসরণ করবো, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।[১৩৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের তাকলীদে মুতলাকের নিন্দা করেছেন। তাছাড়া, বাস্তবতাও তো এটাই যে, কাফেরদের নির্দিষ্ট কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিল না; বরং একেক বিষয়ে একেকজনের অনুসরণ করত। সুতরাং তাকলীদকে ভাগ করে যদি বলা হয়, একপ্রকার জায়েয, আরেক প্রকার নাজায়েয তাহলে তাকলীদে শাখছী নয়; তাকলীদে মুতলাকই হারাম হবে।

দুই. আপনাদের দাবি হলো, তাকলীদ করলে আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীত অন্যের আনুগত্য করা হয়। আর গাইরুল্লাহর আনুগত্য করা শিরক। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তাহলে তাকলীদে শাখছীর তুলনায় তাকলীদে মুতলাক বড় শিরক। কারণ তাকলীদে শাখছীতে এক ইমাম,

---

১৩৫.সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭০

(আপনার বক্তব্য অনুসারে) একজন গাইরুল্লাহর অনুসরণ করা হয় আর তাকলীদে মুতলাকে একাধিক ইমাম তথা একাধিক গাইরুল্লাহর আনুগত্য করা হয়। সুতরাং ইমামগণের তাকলীদ করে শরীআতের বিধান পালন করাকে যদি গাইরুল্লাহর ইবাদত বলা হয়, তাহলে বলতে হবে তাকলীদে শাখছী থেকে তাকলীদে মুতলাক বড় অন্যায়।

যাকগে সে কথা। সেই প্রশ্নের মূল জবাব লক্ষ করুন :

১. আমরা যেসব আয়াত ও হাদীস পেশ করেছি, এর কোন্‌টি তাকলীদকে ভাগ করেছে এবং বলেছে যে, এই তাকলীদ জায়েয, ওই তাকলীদ জায়েয না? এমন কথা তো কোনো আয়াত বা কোনো হাদীসে নেই। কুরআন-হাদীস তাকলীদের কোনো ভাগ করেনি, সাধারণভাবে তাকলীদের বৈধতা প্রমাণ করেছে, যাতে উভয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উল্লিখিত দলীলসমূহ সমানভাবে তাকলীদে মুতলাক ও তাকলীদে শাখছী উভয়েরই দলীল। তাই ব্যাপকভাবে তাকলীদের উভয় প্রকারই বৈধ। এক প্রকারকে জায়েয বলে আরেক প্রকারকে নাজায়েয বলার কোনো দলীল-প্রমাণ নেই।

২. প্রথম হাদীসটিতে আবার দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ করছি। দেখুন, ইয়েমেনবাসীকে দ্বীন শেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাযি.কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর সাথে অন্য কাউকে পাঠাননি। আর ইয়েমেনবাসী শুধু মুআয রাযি.-এর তাকলীদ করেছেন। সুতরাং এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের সাহাবীদেরকে মুআয রাযি.-এর তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তি–তাকলীদ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

৩. সামনে মাযহাবের ইতিহাস বর্ণনা করা হবে। তখন দেখতে পাবেন, ইসলামের স্বর্ণযুগে তাকলীদে মুতলাক থাকলেও সাধারণভাবে তাকলীদে শাখছী বা ব্যক্তি তাকলীদেরই ছিল ব্যাপক প্রচলন।

* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে মাযহাব

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাযি.-এর নির্দেশ

উমর রাযি. খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম, যাঁদের কীর্তি, মর্যাদা ও মহত্ত্ব সবারই জানা। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশেষ করে উমর রাযি. -এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুটি হাদীস উদ্ধৃত করছি।

এক. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِه.

আল্লাহ তাআলা উমরের যবান ও কলবে হক গচ্ছিত রেখেছেন।[১৩৬]

দুই. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ، إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.

হে খাত্তাবের ছেলে উমর! ওই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, শয়তান যখনই এবং যে-কোনো পথেই তোমাকে চলতে দেখে, সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়।[১৩৭]

---

১৩৬. জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬৮২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৫১৪৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৮৯৫

১৩৭. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৯৬

মাযহাব সম্পর্কে এই উমরের বক্তব্য শুনুন–

কাযী শুরাইহ্ রহ. বলেন, উমর রাযি. আমার কাছে চিঠি প্রেরণ করেছেন–

إِذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِه، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاقْضِ بِهَا.

فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذْ بِه.

فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ وَتَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ.

যদি তোমার কাছে এমন কোনো বিষয়ের মোকদ্দমা আসে, যার মীমাংসা কুরআনে আছে, তাহলে সে অনুযায়ী সমাধান দেবে। মানুষ যেন তোমাকে কুরআন থেকে কিছুতেই ফেরাতে না পারে।

যদি বিষয়টির সমাধান কুরআনে না পাও, তাহলে নবীজীর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেবে এবং সে অনুসারে ফায়সালা করবে।

ব্যাপারটি যদি এমন হয় যার ফায়সালা কুরআনেও পাচ্ছো না, হাদীসেও দেখছো না, তাহলে মুসলিমগণের ইজমার দিকে নজর বুলাবে এবং ইজমার আলোকে সিদ্ধান্ত দেবে।

আর যদি তোমার সামনে এমন কোনো ব্যাপার উপস্থিত হয়, যার শুরাহা কুরআন ও হাদীসে নেই এবং পূর্ববর্তী কারও ফতোয়ায়ও নেই, তাহলে তুমি দুই পথের যে-কোনো একটা অবলম্বন করতে পারো। নিজ রায় অনুযায়ী ইজতিহাদ করবে

এবং সামনে অগ্রসর হবে। অথবা (আমার সাথে পরামর্শ করা পর্যন্ত) অপেক্ষা করবে। তুমি এই দুই পন্থার কোনো একটা গ্রহণ করতে পারো। তবে বিলম্ব করাটাই আমার মতে উত্তম।[১৩৮]

আছারটির সনদ সহীহ। হাফেয কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহ. (৮৭৯ হিজরী) বলেছন–

إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

আছারটির সনদ সহীহ।[১৩৯]

কাযী শুরাইহ্ রহ.-এর নিকট কোনো বিষয় উপস্থিত হলে উমর রাযি. পালাক্রমে কুরআন, হাদীস ও ইজমার মাধ্যমে সমাধান পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তিন উৎসে বিষয়টির মীমাংসা না পেলে রায় দ্বারা ইজতিহাদ করার উপদেশ দিয়েছেন। শুরাইহ্ রহ. ছিলেন উমর রাযি.-এর পক্ষ থেকে কূফার বিচারপতি। তাই শুরাইহ রহ. যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় পাবেন না সেসব ক্ষেত্রে কূফাবাসীকে ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিবেন। আর কারও ইজতিহাদী রায় অনুসারে শরীআতের বিধান পালন করার নামই তো তাকলীদ। কাজেই কূফার বিচারক ইজতিহাদ করে ফায়সালা দেওয়ার অর্থ হলো– কূফার মুসলিমগণ তাঁর তাকলীদ করবে, তাঁর মাযহাব অনুযায়ী আমল করবে। সুতরাং উমর রাযি.-এর নির্দেশেই শুরাইহ রহ. কূফাবাসীর ইমাম এবং তারা তাঁর মুকাল্লিদ।

উমর রাযি.-এর আরেকটি আছার লক্ষ করুন–

আবু ইদরীস খাওলানী রহ. বলেন, সাঈদ ইবনে আবু বুরদা রহ. আমাদের নিকট দীর্ঘ একটি পত্র বের করেছেন এবং বলেছেন, এই পত্রটি

---

১৩৮. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, আছার ২৩৪৪৪; সুনানে দারেমী (ফতহুল মান্নান), আছার ১৭৪; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৫; আল-আহাদীসুল মুখতারা ১/২৩৯; মুসনাদুল ফারূক, আছার ৭৬৩ (২/৪৪০); সুনানে নাসায়ী, আছার ৫৩৯৯

১৩৯. তাখরীজু আহাদীসি উসূলিল বাযদাভী (উসূলুল বাযদাভীর সাথে মুদ্রিত), পৃ. ৫৫৯

উমর রাযি. আবু মূসা আশআরী রাযি.-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। পত্রটির একটি অংশ হলো–

> الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَتَعَرَّفِ الْأَمْثَالَ وَالأَشْبَاهَ، ثُمَّ قِسِ الأُمُورَ عِنْدَ ذٰلِكَ، وَاعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا فِيمَا تَرٰى.
>
> যে বিষয়ে তোমার মনে খটকা বাঁধে আর বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহয় তুমি না পাও, সে ক্ষেত্রে খুব বুঝে শোনে অগ্রসর হবে। তুমি উত্থাপিত বিষয়টির অনুরূপ এবং এর কাছাকাছি বিধানগুলো অনুসন্ধান করবে। এরপর সেগুলোর উপর কিয়াস করবে এবং তোমার গবেষণা অনুসারে যা আল্লাহর অধিকতর প্রিয় এবং হকের বেশি নিকটতম সে অনুযায়ী ফায়সালা করবে।[১৪০]

আবু মূসা আশআরী রাযি. ছিলেন উমর রাযি.-এর পক্ষ হতে বসরার গভর্নর। এখানেও উমর রাযি. কুরআন-সুন্নাহয় যে বিষয়ের সমাধান পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদ করে ফতোয়া প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর কোনো মুজতাহিদের কিয়াস ও গবেষণা অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুসরণের নামই হচ্ছে মাযহাব মানা। সুতরাং আবু মূসা আশআরী রাযি.-এর গবেষণার আলোকে আমল করার মানে হলো, বসরার মুসলিমগণ তাঁর মাযহাব অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করবে। আর তা হয়েছে উমর রাযি.-এর নির্দেশনা অনুসারেই।

সারকথা, এ দুটি আছারে উমর রাযি. মূলত আবু মূসা আশআরী রাযি. ও কাযী শুরায়হ রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১৪০. সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৫

إسناده متصل، ورجاله ثقات، إلا يحيى بن الربيع المكى، فذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال: سمع: ابنَ عيينة. وعنه: أبو بكر محمد بن جعفر القصري، وأبو حامد بن بلال، والبغوي، انتهى. ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا.

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হলেন সেই মহান সাহাবী, যাঁর সম্পর্কে দরবারে নববী থেকে ঘোষিত হয়েছে–

رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِي مَا كَرِهَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমার উম্মতের জন্য যা পছন্দ করে, আমিও তাদের জন্য তা পছন্দ করি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমার উম্মতের জন্য যা অপছন্দ করে, আমিও তাদের জন্য তা অপছন্দ করি।[১৪১]

এই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন–

قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ، وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ، وَإِنَّ اللهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ. فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي أَخَافُ وَأَخْشَى.

একটা সময় ছিল যখন আমাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হতো না। আর তখন আমরা এর উপযুক্তও ছিলাম না। আল্লাহর কুদরতে এখন কী অবস্থানে পৌঁছেছি তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। সুতরাং তোমাদের নিকট কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, তোমরা (এর সমাধান) কুরআনের মধ্যে তালাশ করবে। যদি কুরআন মাজীদে না পাও, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেবে। হাদীস শরীফে না পেলে, মুসলিমগণ যেসব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন,

১৪১. মুসনাদে বায্যার, হাদীস ১৯৮৬; মুজামে আওসাত, তবারানী, হাদীস ৬৮৭৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৫৩৮৭

তাতে নজর বুলাবে। সেখানে না পাওয়া গেলে **রায় দ্বারা ইজতিহাদ করবে**। এ কথা বলবে না, (ইজতিহাদ করতে) আমার ভয় হচ্ছে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে।[১৪২]

আছারটির সনদ সহীহ। ইমাম নাসায়ী রহ. আছারটি বর্ণনা করার পর বলেন–

هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ.

কোনো সন্দেহ নেই, আছারটি সহীহ।[১৪৩]

হাকেম আবু আবদুল্লাহ নীশাপুরী রহ. বলেন–

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

আছারটির সনদ সহীহ।[১৪৪]

হাফেয কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহ. বলেন–

يَشْهَدُ لِحَدِيْثِ مُعَاذٍ: مَا أَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: ...

মুআয রাযি.-এর হাদীসটির সমর্থন করে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর বক্তব্য, যা দারেমী রহ. বর্ণনা করেছেন সহীহ সনদে।[১৪৫]

---

১৪২. সুনানে দারেমী (ফতহুল মান্নান), আছার ১৭৬-১৭৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, আছার ২৩৪৪৫; সুনানে নাসায়ী, আছার ৫৩৯৭; মুস্তাদরাকে হাকেম, আছার ৭০৩০; মুজামে কাবীর, তবারানী ৯/১৮৭ (৮৯২০) সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৫

১৪৩. সুনানে নাসায়ী, আছার ৫৩৯৭

لفظ «جيد» هنا بمعنى «صحيح»، وانظر لتعرف مفهوم «الجيد» عند المتقدمين «الوجيز في شيء من مصطلح علم الحديث» ص ٢٥٥-٢٥٧ لشيخنا محمد عبد الملك حفظه الله ورعاه.

১৪৪. মুস্তাদরাকে হাকেম, আছার ৭০৩০

১৪৫. তাখরীজু আহাদীসি উসূলিল বাযদাভী (উসূলুল বাযদাভীর সাথে মুদ্রিত), পৃ. ৫৫৯

এই আছারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, মুজতাহিদের নিকট কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি ধারাবাহিকভাবে কুরআন, হাদীস ও ইজমায় এর সমাধান তালাশ করবেন। সেখানে না পেলে ইজতিহাদ করে রায় দেবেন। স্পষ্ট কথা, মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে এ জন্যই ফতোয়া দেবেন যেন অন্যরা সে অনুযায়ী আমল করে। আর কারও ইজতিহাদী রায় অনুযায়ী দ্বীন পালনের নামই তো তাকলীদ।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর নির্দেশনা

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. বিশিষ্ট সাহাবী, ইলমুল ফারায়েয তথা উত্তরাধিকার বণ্টন-শাস্ত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম। আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال الحاكم: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.)

আমার উম্মতের মধ্যে ইলমুল ফারায়েয সবচেয়ে বেশি পারদর্শী হলো যায়েদ ইবনে সাবেত।[১৪৬]

মাসলামা ইবনে মাখলাদ রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর নিকট গিয়ে বললেন, ভাতিজা! আমাকে জবরদস্তিমূলক বিচারক নির্ধারণ করা হয়েছে। তখন যায়েদ রাযি. বলেছেন–

اِقْضِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَفِيْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَادْعُ أَهْلَ الرَّأْيِ، ثُمَّ اجْتَهِدْ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ، وَلَا حَرَجَ.

---

১৪৬. জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৭৯১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৯৯০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭১৩১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৫৭৮৪

> আপনি আল্লাহ তাআলার কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। যদি কিতাবুল্লাহয় না থাকে, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে মীমাংসা করবেন। যতি সুন্নতে নববীতেও না পাওয়া যায়, তাহলে মুজতাহিদদের একত্র করবেন। এরপর **আপনি ইজতিহাদ করে একটা রায় গ্রহণ করবেন**। এতে কোনো বাধা নেই। (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে না পেলে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।)[১৪৭]

হাফেয কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহ. বলেন–

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

আছারটির সনদ হাসান।[১৪৮]

মাসলামা ইবনে মাখলাদ রাযি. ছিলেন মুআবিয়া রাযি.-এর পক্ষ হতে মিশরের গভর্নর। যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. তাকে বলেছেন, তিনি যেন কুরআন ও সুন্নাহয় কোনো বিষয়ের মীমাংসা না পেলে ইজতিহাদ করে ফায়সালা প্রদান করেন। এর মর্ম হচ্ছে, মিশরবাসী মাসলামা রাযি.-এর ইজতিহাদী ফায়সালা অনুযায়ী আমল করবে, তাঁর মাযহাব অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান পালন করবে।

উল্লেখ্য, তৎকালীন গভর্নরদের দায়িত্ব কেবল রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির সমাধান পেশ করা ছিল না; বরং মানুষের দ্বীনী জরুরত ও দ্বীনী বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও জটিলতার সমাধান প্রদানের দায়িত্বও থাকত। আর এ তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মূল রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির সমাধানও তারা শরীআত অনুসারেই করতেন। আর শরীআত অনুযায়ী সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে তারা এ স্তরগুলোর পর্যায় রক্ষা করতেন। অর্থাৎ আগে কুরআন, না পেলে সুন্নাহ, অন্যথায় ইজমা, তারপর কিয়াস।

---

১৪৭. সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৫

১৪৮. তাখরীজু আহাদীসি উসূলিল বাযদাভী (উসূলুল বাযদাভীর সাথে মুদ্রিত), পৃ. ৫৫৯

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কর্মপন্থা

মাযহাবের ব্যাখ্যার আলোকে আমল করার ক্ষেত্রে রঈসুল মুফাস্সিরীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কর্ম ও নীতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ রহ. বলেন–

> سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ بِه، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِه، وَإِلاَّ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ. (إسناد صحيح، ورجاله ثقات.)
>
> আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.কে শুনেছি, তাকে যখন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় আর এর সমাধান আল্লাহর কিতাবে থাকে, তাহলে সে অনুযায়ীই মীমাংসা করেন। যদি কিতাবুল্লাহয় না থাকে, তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে পাওয়া যায়, তাহলে হাদীস মোতাবেক ফায়সালা করেন। যদি কুরআনেও না থাকে এবং হাদীসেও না থাকে, কিন্তু এ সম্পর্কে আবু বকর ও উমর রাযি.-এর বক্তব্য পাওয়া যায়, তখন তাদের মত অনুসারে ফতোয়া দেন। আর যদি এসবের কোনোটাতেই না পাওয়া যায়, তাহলে **নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে** মীমাংসা করেন।[১৪৯]

আছারটির সনদ সহীহ। রাবীগণ সিকাহ এবং সূত্র অবিচ্ছিন্ন।

---

১৪৯. সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৫; সুনানে দারেমী, (ফতহুল মান্নান) ২/১৬৭ (১৭৩) আলফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ১/৫৮২ (৫৪২); জামেউ বয়ানিল ইলমী ওয়াফাযলিহি ২/৫৭-৫৮

আছারটিতে স্পষ্টই এসেছে, তরজুমানুল কুরআন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.কে দ্বীনের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি যথাক্রমে কুরআন, হাদীস এবং আবু বকর ও উমর রাযি.-এর বক্তব্যে এর সমাধান তালাশ করতেন। সেখানে না পেলে ইজতিহাদ করে ফতোয়া দিতেন। তখন প্রশ্নকারী তাঁর সে ইজতিহাদী মত অনুযায়ী আমল করত। এর নামই তো মাযহাব অনুসরণ করা।

আছারটি থেকে আরেকটি বিষয় জানা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কুরআন ও সুন্নাহয় না পেলে শায়খাইন তথা আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর বক্তব্য ও আমল গ্রহণ করতেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইববে আব্বাস রাযি. শায়খাইনের তাকলীদ করতেন, তাঁদের মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।

❊ ❊ ❊

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে মাযহাব

মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা জায়েয; বরং সাধারণ মানুষের জন্য কোনো ইমামের তাকলীদ করা আবশ্যক—এ বিষয়ে বহু ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাবে। তবে আমরা সবার বক্তব্য পেশ করে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাই না। এখানে কেবল আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর বক্তব্য তুলে ধরব। কারণ ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ., এ দুটি নাম বর্তমানের সালাফী ভাইদের কাছে অনেক মর্যাদা রাখে। তারা এঁদের কিতাবাদি যত্নের সাথে অধ্যয়ন করেন এবং এর প্রচার-প্রসার করেন। অতএব মাযহাব ও ইমামগণ সর্ম্পকে এঁদের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বিষয়ে এ দুই মনীষীর দু'একটা বক্তব্য উল্লেখ করা মুনাসিব মনে করছি।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বক্তব্য

আল্লামা আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুল হালীম তকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী) বলেন-

إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ طَاعَةُ اللهِ وَالرَّسُولِ، وَهَؤُلَاءِ أُولُوا الأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾، إِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُمْ تَبَعًا لِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَا اسْتِقْلَالًا.

অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো- আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা। আর উম্মাহর ইমামগণ হলেন 'উলুল আমর', যাঁদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর,

আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর।[১৫০] তবে ইমামগণের আনুগত্যের অবশ্যকীয়তা স্বতন্ত্রভাবে নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের অনুগামী হিসাবে।[১৫১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তো এমনও বলেছেন যে, ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমের জন্যেও ক্ষেত্রবিশেষে অন্য ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয। তিনি লিখেছেন–

وَمَتَى أَمْكَنَ فِي الْحَوَادِثِ الْمُشْكِلَةِ مَعْرِفَةُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَانَ هُوَ الْوَاجِبَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذٰلِكَ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ عَجْزِ الطَّالِبِ، أَوْ تَكَافُؤِ الأَدِلَّةِ عِنْدَهُ، أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ، فَلَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ يَرْتَضِي عِلْمَهُ وَدِينَهُ.

অর্থাৎ জটিল বিষয়গুলোতে যদি বিজ্ঞ আলেমের জন্য কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান জানা সম্ভব হয়, তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। আর যদি সময় সংকীর্ণতার কারণে, (তালাশ করে দলীল বের করতে) অক্ষমতার কারণে, বৈপরীত্যপূর্ণ দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয় বিধান অসম্ভব হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে কুরআন-হাদীস থেকে সমাধান বের করা সম্ভব না হয় তাহলে তাঁর জন্য জায়েয এমন কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা, যাঁর ইলম ও আমলের প্রতি তাঁর আস্থা আছে।

এরপর তিনি লেখেন–

هٰذَا أَقْوَى الأَقْوَالِ.

এ ক্ষেত্রে এটাই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী অভিমত।[১৫২]

তিনি আরও বলেন–

وَأَمَّا الْقَادِرُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ، فَقِيلَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، كَمَا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ.

---

১৫০. সূরা নিসা (৪), আয়াত ৫৯

১৫১. মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/২০৮

১৫২. মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/৩৮৮

অর্থাৎ ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমের জন্য তাকলীদ করা জায়েয কি না, এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

এক. তাদের জন্য কোনো বিষয়ে কারও তাকলীদ করা জায়েয নেই।

দুই. সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য তাকলীদ করা জায়েয।

তিন. সময় সংকীর্ণতা বা অন্য কোনো প্রয়োজন হলে তাদের জন্য তাকলীদ করা জায়েয, অন্যথায় জায়েয নেই।

এই তৃতীয় মত সম্পর্কে তিনি বলেন–

وَهٰذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ.

এই মতটি সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ।[১৫৩]

যদি মুজতাহিদ আলেমের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে তাকলীদ করা জায়েয হয়, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা যে শুধু বৈধ নয়, বরং আবশ্যক, তাতে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর বক্তব্য

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম রহ. (৭৫১ হিজরী) মুজতাহিদগণের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

هُمْ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بِهِمْ يَهْتَدِي الْحَيْرَانُ فِي الظَّلْمَاءِ، وَطَاعَتُهُمْ أَفْرَضُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ بِنَصِّ الْكِتَابِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ.

অর্থাৎ ফিকহের ইমামগণ পৃথিবীতে আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের মাধ্যমে পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পায়। তাই পিতা-মাতার আনুগত্য করা যেমন ফরয এর চেয়ে বড় ফরয

১৫৩. মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/২১২

হলো ইমামগণের আনুগত্য করা। কুরআনের আয়াত দ্বারা বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর।'[১৫৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. আরও অগ্রসর হয়েছেন এবং ফতোয়া প্রদানের যোগ্য আলেমদের জন্যও তাকলীদ করা জায়েয হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন–

هَلْ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إِذَا عَلِمَ عَدَالَتَهُ، وَأَنَّهُ مَاتَ عَلَيْهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ الْحَيَّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.

কোনো মুজতাহিদ যদি তাকওয়ার যিন্দেগি অবলম্বন করেন এবং তাকওয়ার হালতেই ইনতেকাল করেন, জীবিত মুজতাহিদের শরণাপন্ন না হয়ে এমন মৃত মুজতাহিদের তাকলীদ করে ফতোয়া দেওয়া মুফতীর জন্য জায়েয হবে কি না, এ সম্পর্কে আহমাদ রহ. ও শাফেয়ী রহ.-এর অনুসারীদের দুটি অভিমত আছে।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন–

أَصَحُّهُمَا لَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمَذَاهِبَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَصْحَابِهَا، وَلَوْ بَطَلَتْ بِمَوْتِهِمْ لَبَطَلَ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ مِنْ الْفِقْهِ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ، وَلَمْ يَسُغْ لَهُمْ تَقْلِيدُهُمْ وَالْعَمَلُ بِأَقْوَالِهِمْ.

বিশুদ্ধমত মত হলো– মুফতীর জন্যও মৃত ইমামের তাকলীদ করা জায়েয। কেননা ইমামগণের মৃত্যুর কারণে তাঁদের মাযহাব বাতিল হয়ে যায় না। মৃত্যুর দ্বারা যদি তাঁদের মাযহাব বাতিল হয়ে যেত, তাহলে মানুষের হাতে

১৫৪. সূরা নিসা (৪), আয়াত ৫৯; ইলামুল মুআক্কিঈন ১/১৬

ইমামগণের যে ফিক্‌হ আছে তা বাতিল সাব্যস্ত হতো। তখন মানুষের জন্য ইমামগণের তাকলীদ করা ও তাঁদের রেখে যাওয়া ফতোয়া মোতাবেক আমল করা জায়েয হতো না।[১৫৫]

অন্যত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন–

اَلْمُفْتُوْنَ الَّذِيْنَ نَصَبُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْفَتْوٰى أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: اَلنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمفْتِيْنَ اَلْعَالِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ الْمُجْتَهِدُ فِيْ بَعْضِ أَحْكَامِ النَّوَازِلِ، يَقْصِدُ فِيْهَا مُوَافَقَةَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ، وَلَا يُنَافِي اجْتِهَادُهُ تَقْلِيْدَه لِغَيْرِهِ أَحْيَانًا، فَلَا تَجِدُ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا وَهُوَ مُقَلِّدٌ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فِيْ بَعْضِ الْأَحْكَامِ.

অর্থাৎ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত মুফতীদের চার শ্রেণি।

প্রথম শ্রেণি : যাঁরা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এই শ্রেণির আলেম কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে পারেন। আদিল্লায়ে শরঈয়্যার অনুসরণের ইচ্ছায় এসব ক্ষেত্রে তাঁরা ইজতিহাদ করেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা অন্যের তাকলীদ করলে এটা তাঁদের ইজতিহাদের পরিপন্থি হবে না। কারণ, এমন কোনো ইমাম পাওয়া যাবে না যিনি কিছু কিছু বিষয়ে তাঁর থেকে বড় মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব অনুসরণ করেননি।[১৫৬]

এবার বলুন, যেখানে বিজ্ঞ আলেমের জন্য তার চেয়ে বড় ইমামের মাযহাব অনুরসণ করা, তার ফতোয়ার আলোকে আমল করা জায়েয, সেখানে সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব মানা কতটা জরুরি হতে পারে!

---

১৫৫. ইলামুল মুআক্কিয়ীন ৪/৪৯১
১৫৬. ইলামুল মুআক্কিঈন ৪/৪৫৪

মাযহাব-এর ব্যাপারে 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুকার্‌রমা'-এর সিদ্ধান্ত

যারা মানুষকে মাযহাব বর্জনের দাওয়াত দেয় এবং মাযহাবের ইমামগণের সমালোচনা করে তাদেরকে লক্ষ্য করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধি 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুকার্‌রমা'-এর 'মাজলিসুল মাজমাইল ফিকহী'-এর বক্তব্য হলো–

أَمَّا تِلْكَ الْفِئَةُ الْأُخْرٰى الَّتِيْ تَدْعُو إِلَى نَبْذِ الْمَذَاهِبِ، وَتُرِيْدُ أَنْ تَحْمِلَ النَّاسَ عَلٰى خَطٍّ اجْتِهَادِيٍّ جَدِيْدٍ، وَتَطْعَنُ فِي الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَائِمَةِ وَفِي أَئِمَّتِهَا، أَوْ بَعْضِهِمْ: فَفِيْ بَيَانِنَا الآنِفِ مَا يُوْجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُفُّوْا عَنْ هٰذَا الْأُسْلُوْبِ الْبَغِيْضِ الَّذِيْ يَنْتَهِجُوْنَهُ، يُضَلِّلُوْنَ بِهِ النَّاسَ، وَيَشُقُّوْنَ صُفُوْفَهُمْ، وَيُفَرِّقُوْنَ كَلِمَتَهُمْ، فِيْ وَقْتٍ نَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُوْنُ إِلَى جَمْعِ الْكَلِمَةِ فِي مُوَاجَهَاتِ التَّحَدِّيَاتِ الْخَطِيْرَةِ مِنْ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، بَدَلًا مِنْ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُفَرِّقَةِ الَّتِيْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا.

অর্থাৎ যে শ্রেণির লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জনের আহ্বান করে এবং ফিকহের প্রচলিত সকল মাযহাব ও তার ইমামগণের অথবা কোনো কোনো ইমামের সমালোচনা করে এবং মানুষকে নতুন করে ইজতিহাদ করাতে চেষ্টা করে তাদের কর্তব্য, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। এর মাধ্যমে তারা মানুষকে গোমরাহ করছে, মুসলিমদের একতা বিনষ্ট করে দিচ্ছে এবং মুসলমানদের ঐক্যকে টুকরা টুকরা করে ফেলছে। অথচ এ ধরনের একতা বিনষ্টকারী আহ্বানের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ইসলামের দুশমনদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুসংহত করা।[১৫৭]

১৫৭. মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহী, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মকার্‌রমা, বর্ষ : ১, সংখ্যা : ২

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে 'মাজলিসুল মাজমাইল ফিকহী'র প্রধান শায়েখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায ও উপপ্রধান শায়েখ আবদুল্লাহ উমর নাসীফসহ চৌদ্দজন সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে।

শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্য

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আলউসাইমীন রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হিজরী) আরবের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম এবং আহলে হাদীস ভাইদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। তাকলীদে শাখছী তথা নির্দিষ্ট এক ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা যাবে কি না, এ সম্পর্কে তাঁর নিকট একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি তাকলীদে শাখছীর বিষয়ে চমৎকার ও সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন। সংগত কারণেই তাঁর আলোচনাটি এখানে পরিবেশন করা সমীচীন মনে করছি।

سُئِلَ فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ: مَا حُكْمُ تَقْلِيْدِ مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

يَنْقَسِمُ النَّاسُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ بِالنِّسْبَةِ لِالْتِزَامِ الْمَذَاهِبِ.

اَلْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لِظَنِّهِ أَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ إِلَى الصَّوَابِ، لٰكِنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ اِتَّبَعَهُ وَتَرَكَ مَا هُوَ مُقَلِّدٌ لَهُ. وَهٰذَا لَا حَرَجَ فِيْهِ. وَقَدْ فَعَلَهُ عُلَمَاءُ كِبَارٌ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ بِالنِّسْبَةِ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، فَإِنَّهُ أَعْنِيْ اِبْنَ تَيْمِيَةَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَيُعَدُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ....

اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ: مَنْ هُوَ مُتَعَصِّبٌ لِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ دُوْنَ أَنْ يَنْظُرَ فِيْ دَلِيْلِهِ، بَلْ دَلِيْلُهُ كُتُبُ أَصْحَابِهِ.... وَهٰذَا مَذْمُوْمٌ.

اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، وَهُوَ عَامِّيٌّ مَحْضٌ. فَيَتَّبِعُ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ أَصْلًا.

فَهٰذَا دَاخِلٌ فِيْ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ শায়েখ উসাইমীন রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো– চার মাযহাব থেকে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করার হুকুম কী?

হামদ ও সালাতের পর শায়েখ বলেন, মাযহাব অনুসরণের দিক থেকে সমস্ত মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণি : যারা এই উদ্দেশ্যে কোনো এক মাযহাব অনুসরণ করেন যে, তাদের নিকট এই মাযহাব অধিক সঠিক। এরপর তাদের সামনে যদি কোনো বিষয়ে প্রমাণিত হয়, এই বিষয়ে অন্য মাযহাবের মত সঠিক, তখন তারা সে মাসআলায় ওই মাযহাবের মত অনুসরণ করে এবং নিজের মাযহাবের মত বর্জন করে।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট এক মাযহাবের অনুসরণ করাতে কোনো দোষ নেই। বড় বড় উলামায়ে কেরাম এভাবে তাকলীদ করেছেন। যেমন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। তিনি ইমাম আহমাদ রহ.-এর অনুসারী ছিলেন এবং তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।...

দ্বিতীয় শ্রেণি : যারা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করে এভাবে যে, এ মাযহাবের রুখছত বা আযিমত যত বিধান আছে– সব গ্রহণ করে। এর স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল আছে কি না, সেদিকে লক্ষ করে না; বরং তার মাযহাবের কিতাবই তার দলীল। ...এ ধরনের তাকলীদ নিন্দনীয়।

> **তৃতীয় শ্রেণি :** যাদের (দলীলাদি বোঝার) ইলম নেই, সাধারণ মানুষ। তারা নির্দিষ্ট কোনো এক ইমামের মাযহাব অনুসরণ করবে। কেননা, তাদের পক্ষে কোন্ ইমামের মত সঠিক আর কোন্ ইমামের মত বেঠিক—তা নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং তারা ইজতিহাদেরও যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং সাধারণ মানুষ 'তোমাদের ইলম না থাকলে আহলে ইলমের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও'[১৫৮] এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ করবে।[১৫৯]

শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্যের খোলাসা হলো– সমস্ত মানুষ দুইভাগে বিভক্ত।

এক. হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মতো বিজ্ঞ আলেম, যাদের দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং ইজতিহাদ ও গবেষণা করার যোগ্যতা আছে।

দুই. যারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মতো বিজ্ঞ আলেম নন। ইজতিহাদ করা ও দলীলাদি গবেষণার করার যোগ্যতা নেই।

প্রথম শ্রেণির মানুষ, যারা হলেন বিজ্ঞ আলেম, তাদের সম্পর্কে শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্য হলো– তাঁরা যদি কোনো যাচাই-বাচাই না করে অন্ধভাবে কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করে, তাহলে তা নিন্দনীয়। কিন্তু তারা যদি অন্ধের মতো এক মাযহাবের তাকলীদ না করে, বরং ইজতিহাদ ও গবেষণা করে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব মোতাবেক আমল করে, তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। কারণ, বড় বড় আলেমগণ এভাবেই কোনো ইমামের তাকলীদ করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ, যারা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মতো গবেষক ও মুজতাহিদ আলেম নয়। শরীআতের দৃষ্টিতে তারা হলো সাধারণ মানুষ। এই শ্রেণির ব্যাপারে শায়েখ উসাইমীনের মন্তব্য হলো– তারা যেহেতু

---

১৫৮. সূরা নাহল (১৬), আয়াত ৪৩

১৫৯. মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়ারাসাইলিল উসাইমীন ২৬/২৮৫-২৮৬

হুকুম-আহকামের দলীল পর্যালোচনা করার যোগ্য নয়, তাই তাদের জন্য কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ করা আবশ্যক।

সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব অনুসরণ করা কর্তব্য এতে বিবেকসম্পন্ন কোনো আলেমের দ্বিমত নেই

সাধারণ মানুষের কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার জন্য বিজ্ঞ কোনো আলেমের শরণাপন্ন হওয়া অতি জরুরি– এতে কোনো যুগের উলামায়ে কেরামের দ্বিমত নেই। হিজরী ৫ম শতাব্দীর প্রথিতযশা ফকীহ ও মুহাদ্দিস, হাদীস শরীফের অতুলনীয় দুইখানা ভাষ্যগ্রন্থ : 'আততামহীদ' ও 'আলইস্তিযকার'-এর রচয়িতা, ইমাম আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. (মৃ. ৩৬৮-৪৬৩ হিজরী) লেখেন–

وَلَمْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تَقْلِيْدُ عُلَمَائِهَا.

অর্থাৎ এতে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো– নিজ এলাকার আলেমদের তাকলীদ করা।[১৬০]

আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ. (৪৬৩ হিজরী) বলেন, মুতাযেলাদের কারও কারও মত হলো–

দলীল না বুঝে সাধারণ মানুষের জন্যও কোনো আলেমের তাকলীদ করা জায়েয নেই। যে আলেম নয়, সে আলেমকে জিজ্ঞেস করবে। তিনি দলীল উল্লেখ করবেন এবং তাকে দলীল বুঝিয়ে দেবেন। সে ব্যক্তি আলেম থেকে দলীল বুঝে নেবে, এরপর সে অনুযায়ী আমল করবে।

খতীব বাগদাদী রহ. বলেন–

وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْعَامِّيِّ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ
إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَفَقَّهَ سِنِينَ كَثِيرَةً، وَيُخَالِطَ الْفُقَهَاءَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ،
وَيَتَحَقَّقَ طُرُقَ الْقِيَاسِ، وَيَعْلَمَ مَا يُصَحِّحُهُ وَيُفْسِدُهُ وَمَا

১৬০. জামিউ বয়ানিল ইলম ২/১১৪; আযওয়াউল বয়ান ৭/৩১২; আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ৯১

يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَفِي تَكْلِيفِ الْعَامَّةِ بِذَلِكَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطِيقُونَهُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ.

মুতাযেলী আলেমের এই বক্তব্য ভুল। কেননা সাধারণ মানুষের জন্য দলীল বোঝা সম্ভব না। দলীল বোঝার জন্য প্রয়োজন অনেক বছর সময় ব্যয় করে ইলমুল ফিকহের জ্ঞান অর্জন করা, জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় পর্যন্ত বিজ্ঞ ফকীহের সোহবত গ্রহণ করা, কিয়াস ও ইজতিহাদের নিয়মনীতি আয়ত্ত করা, সহীহ কিয়াস ও ভুল কিয়াসের পার্থক্য জানা, শরয়ী দলীলাদির মধ্যে কোন্টাকে কখন অন্যটার প্রাধান্য দিতে হবে তার জ্ঞান অর্জন করা।

আর সাধারণ মানুষকে এসবের জন্য বাধ্য করা অরণ্যে রোদন বৈ কিছু নয়। তাদের জন্য এইসব বিষয়ের ইলম হাছিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়।[১৬১]

❊ ❊ ❊

১৬১. আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/১৪০

তৃতীয় অধ্যায়
মাযহাবের ইতিহাস

বড় বড় হাদীসবিশারদ ইমামগণ মাযহাব অনুসরণ করতেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ. ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।...

–শায়েখ ছালেহ ইবনে ফাওযান

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীযুগে আমল করার পদ্ধতি

সংক্ষিপ্তভাবে মুসলিমবিশ্বের সাধারণ চিত্র

এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, যেখানে আল্লাহর রাসূল আছেন সেখানে অন্য কারও অনুসরণ করার কল্পনাই করা যায় না। সিরাতে মুস্তাকীমে চলার জন্য, দ্বীনের বিধান জানার জন্য নবীজীর বিকল্প কেউ তালাশ করবে না। তিনি মক্কায় থাকাকালে মক্কার সাহাবীগণ তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবেন, মদীনায় হিজরত করলে মদীনার সাহাবীগণ তাঁকে অনুসরণ করবেন- এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং তখন অন্য কারও অনুসরণ করার বা অন্য কারও শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই ছিল না।

কিন্তু দেখার বিষয় হলো- যেসব অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না, সেখানকার সাহাবীগণের জন্য তিনি কী পন্থা গ্রহণ করেছিলেন? দ্বীনের উপর চলার জন্য তিনি তাদের কী নির্দেশনা দিয়েছিলেন? হিজরতের পূর্বে মদীনার সাহাবীগণ এবং মক্কা বিজয়ের পর মক্কার সাহাবীগণের ব্যাপারে শরীআতের আহকাম অনুসরণের জন্য তিনি কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন? এমনিভাবে অন্যান্য যেসব এলাকায় তাঁর আসা-যাওয়া ছিল না, সেখানের সাহাবীদের জন্য তাঁর কী নির্দেশনা ছিল?

হাদীস ও সীরাতে নববী থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পূর্বে মদীনার সাহাবীগণ এবং মক্কা বিজয়ের পর তিনি মদীনায় চলে আসলে মক্কার সাহাবীগণ এবং অন্যান্য যেসব অঞ্চলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না, সেখানকার সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো বিজ্ঞ সাহাবীর শিক্ষা ও ফিকহ অনুসরণ করে শরীআতের বিধান পালন করতেন। নিম্নে কয়েকটি নজির লক্ষ করুন-

দুটি নজির

প্রথম নজির : হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসীর আমল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পূর্বে মদীনা তায়্যিবার কিছু ভাগ্যবান মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হয়েছিলেন। তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.কে প্রেরণ করেছিলেন। বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন–

> أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
>
> সাহাবীদের মধ্যে আমাদের নিকট (মদীনায়) সর্বপ্রথম আগমণ করেছেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. ও ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.।[১৬২]

মুসআব রাযি.কে মদীনায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে কুরআনের তালীম দেওয়া এবং দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া। আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আনসারী রহ. (১২০ হিজরী) মদীনার বিশিষ্ট তাবেয়ী। সীরাতুন্নাবী বিষয়ের বিদ্ধান মনীষী। তিনি আপন গোত্রের অনেক প্রবীণ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন–

> فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامَ وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ
>
> লায়লাতুল আকাবায় মদীনার সাহাবীগণ নবীজীর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর মদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.কে তাদের সাথে মদীনায় প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন,

---

১৬২. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৪৯৪১

তিনি যেন মদীনার সাহাবীদের কুরআন পড়ান, ইসলাম শেখান এবং দ্বীনের ফিকহ শিক্ষা দেন।[১৬৩]

হুবহু একই কথা বলেছেন সীরত ও মাগাযীর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৮০-১৫১ হিজরী) রহ.। তিনি বলেন–

فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامَ، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ.

লায়লাতুল আকাবায় মদীনার সাহাবীগণ নবীজীর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর মদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.কে তাদের সাথে মদীনায় প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মদীনার সাহাবীদের কুরআন পড়ান, ইসলাম শেখান এবং দ্বীনের ফিকহ শিক্ষা দেন।[১৬৪]

বিশিষ্ট তাবেয়ী উরওয়া ইবনে যুবায়ের (২৩-৯৪ হিজরী) ও বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (১২৪ হিজরী) বলেন–

فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَرَافِعَ بْنَ مَالِكٍ أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا يُفَقِّهُنَا. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ

(লায়লাতুল আকাবায় ইসলাম গ্রহণের পর) মদীনার সাহাবীগণ আপন গোত্রে ফিনে যান, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং মুআয ইবনে আফরা রাযি. ও রাফে ইবনে মালেক রাযি.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

১৬৩. দালাইলুন নুবওয়াহ, আবু নুআইম আসফাহানী, পৃ. ২৯৯

১৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৮২; তারীখে তবারী ২/৪৩৫; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ১/৬৫২; আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া, ইবনে কাছীর ৪/৩৭৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার্‌রাশাদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী ৩/১৯৭

নিকট প্রেরণ করেন যে, আপনি আমাদের নিকট একজন মুআল্লিম প্রেরণ করেন, যিনি আমাদের ফিকহ্ ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেবেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমায়র রাযি.কে মদীনায় প্রেরণ করেন।[১৬৫]

তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (১২৮ হিজরী)ও বলেছেন–

لَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ عَنِ الْعَقَبَةِ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يُفَقِّهُهُمْ

মদীনাবাসী আকাবা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাদেরকে ফিকহ্ শেখানোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.কে প্রেরণ করেন।[১৬৬]

তদ্রূপ, হাদীস ও সীরাতের অনেক ইমাম : যেমন, মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (২৩০ হিজরী), আবু হাতেম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হিজরী), আবু উমর ইবনে আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩ হিজরী) ও ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হিজরী) রহমাতুল্লাহি আলাইহিমও বলেছেন, মদীনার সাহাবীদের কুরআন পড়ানো এবং দ্বীনের ফিক্হ ও বিধি-বিধান শেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমাইর আবদারী রাযি.-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।[১৬৭]

দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মুসআব রাযি.কে মদীনায় প্রেরণ করার সময় যেসব দায়িত্ব দিয়েছেন এর অন্যতম হলো, মদীনাবাসীকে 'ফিক্হ' শিক্ষা দেওয়া। কুরআন-সুন্নাহয়

---

১৬৫. আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ৩/১৮২-১৮৩; দালাইলুন নুবুওয়াহ্, বায়হাকী ২/৪৩১; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/২৪২-২৪৩; তবাকাতে কুবরা, ইবনে সাদ ৩/৮৭

১৬৬. আল-ইছাবা ফী তামঈযিছ সাহাবা, ইবনে হাজার ৬/৯৮

১৬৭. দ্রষ্টব্য— আছছিকাত, ইবনে হিব্বান ১/৩৮ ও ৪৩৪; আত্তবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ ৩/৬৩; আল-ইস্তিআব, ইবনে আবদুল বার ৪/১৪৭৩; আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, ইবনুল জাওযী ৩/৩৩; তাহযীবুল কামাল, মিয্যী ৩/২৪৮

'ফিক্‌হ' শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আকীদা, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, আদব-আখলাক, চিন্তা-ফিকির অর্থাৎ শরীআতের সকল বিষয়ের বিধি-বিধান, যা কুরআন ও হাদীস থেকে আহরণ করা হয়, তাকে 'ফিক্‌হ' বলা হয়। মুসআব রাযি. যেমনভাবে কুরআন শেখাতেন, তেমনি কুরআন থেকে আহরণকৃত ফিকহও শেখাতেন। মদীনাবাসী মুসআব রাযি. থেকে কুরআন শিখতেন এবং কুরআন থেকে গ্রহণকৃত ফিকহ অনুযায়ী আমল করতেন। আর কারও আহরণকৃত ফিকহ অনুসারে আমল করার নামই তো তাকলীদ।

বলাবাহুল্য, এ সবই হতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে।

দ্বিতীয় নজির : মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীর আমল

মক্কা মুকার্‌রমা বিজয় হয় মদীনায় হিজরত করার সাত বছর পর অষ্টম হিজরীতে। তখন মক্কায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। দ্বীনের প্রসার লাভ করে। এরপর নবীজী মদীনায় চলে যান। যাওয়ার সময় মক্কার সাহাবীদের কুরআন ও দ্বীন শেখানোর জন্য তিনি মুআয ইবনে জাবাল রাযি.কে তাঁদের মুআল্লিম নিযুক্ত করেন। মক্কা মুকার্‌রমার বিশিষ্ট তাবেয়ী উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. (৯৪ হিজরী) ও সীরাতুন্নবী শাস্ত্রের ইমাম মূসা ইবনে উকবা রহ. (১৪১ হিজরী) বলেন—

> كَانَ حِيْنَ خَرَجَ إِلٰى حُنَيْنٍ اِسْتَخْلَفَ مُعَاذًا عَلٰى مَكَّةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّيْنِ. ثُمَّ صَدَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَخَلَفَ مُعَاذًا عَلٰى مَكَّةَ.
>
> (মক্কা বিজয়ের পর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন মুআয রাযি.কে মক্কায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। নির্দেশ দেন, তুমি মক্কার সাহাবীদেরকে কুরআন শেখাবে এবং ফিকহ তথা দ্বীন-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধানাবলি শিক্ষা দেবে।

এরপর তিনি মদীনায় চলে যান এবং মুআয রাযি.কে মক্কায় রেখে যান।[১৬৮]

সীরাতুন্নাবী শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হিজরী) বলেন–

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمْرَتِهِ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَاسْتَخْلَفَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ عَلَى مَكَّةَ، وَخَلَّفَ مَعَهُ مُعَاذًا يُفَقِّهُ النَّاسَ فِي الدِّينِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাতুল জিইর্‌রানা থেকে অবসর হলে মদীনার দিকে প্রত্যবর্তন করেন। তখন আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযি.কে মক্কার গভর্নর বিযুক্ত করেন এবং তার সাথে মুআয ইবনে জাবাল রাযি.কে রেখে যান, যেন মক্কাবাসীকে দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন এবং কুরআনের তালীম দেন।[১৬৯]

একই কথা বলেছেন আবু হাতেম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হিজরী), ইয্‌যুদ্দীন ইবনুল আছীর জাযারী রহ. (৬৩০ হিজরী) ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. (৮০৮ হিজরী) প্রমুখ ইমামগণ।[১৭০]

বলার অপেক্ষা রাখে না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক মক্কার সাহাবীগণ মুআয রাযি.-এর শেখানো ফিক্‌হ অনুসারে আমল করতেন। তাঁর শেখানো ফিকহে যেমন কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট বর্ণিত বিষয়াদি আছে, তেমনি তাঁর ইজতিহাদকৃত বিষয়াদিও আছে।

---

১৬৮. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী ৫/২০১; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ১/৪১২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ২/১৫০

১৬৯. সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫০০; দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী, ৫/২০৩; আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়ালওমাম, ইবনুল জাওযী ৩/৯৪; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ১/৪১২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ২/২২৩; আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ৪/৩৬৮

১৭০. দেখুন– আছছিকাত, ইবনে হিব্বান ১/১৩৬; আল-কামেল ফীত্‌তারীখ, ইবনুল আছীর ৩/১৪১; তারীখে ইবনে খালদুন ২/৪৬৬

আর মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে যে হুকুম-আহকাম আহরণ করেন, সে অনুযায়ী আমল করাই তো তাকলীদ। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না, মক্কা বিজয়ের পর যেসব বিষয় স্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যেত না, সেসব ক্ষেত্রে মক্কার সাহাবীগণ মুআয রাযি.-এর তাকলীদ করেই আমল করতেন। আর এই তাকলীদ করা হতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নির্দেশে।

অন্যান্য মুসলিম শহরের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নীতি ছিল– কোনো শহর বা অঞ্চলের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে ঈমান ও দ্বীন শেখানোর জন্য মুআল্লিম হিসাবে কোনো ফকীহ সাহাবীকে প্রেরণ করতেন। তারা ওই সাহাবী থেকে ঈমান শিখতেন, দ্বীনের হুকুম আহকাম জানতেন এবং সে মোতাবেক আমল করতেন।[১৭১] নমুনা স্বরূপ এখানে দুটি শহরের আলোচনা করছি।

আরও দুটি নজির

এক. ইয়েমেনের একটি শহর ছিল ‘জানাদ’। মুআয রাযি.কে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীর মুআল্লিম নিযুক্ত করা হয়েছিল। দু-এক বছর তাদেরকে দ্বীন শেখানোর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৭১. বরং দূর শহরের ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ নিজেরাই অনেক সময় ফকীহ সাহাবী প্রেরণ করার জন্য নবীজীর নিকট আবেদন করতেন। যেমন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণের পর নবীজীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন–

إِنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ فَشَا فِينَا، فَابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَيُقِيمُنَا لِسُنَّتِهِ وَشَرَائِعِهِ، وَيَؤُمُّنَا فِي صَلَاتِنَا

আমাদের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে একজনকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি আমাদের কুরআন পড়াবেন, ইসলামের ফিকহ ও হুকুম-আহকাম শেখাবেন, সুন্নাহ ও শরীআতের পথে পরিচালিত করবেন এবং নামাযে আমাদের ইমামতি করবেন।

–দালাইলুন নুবুওয়া, বায়হাকী ২/৪৩৭; ইসমাউল আমতা, তাকিউদ্দীন মাকরীযী ৯/২০৭

তাঁকে ইয়েমেনের 'জানাদ' শহরে প্রেরণ করেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা[১৭২] থেকে জানা যায়, ইয়েমেনবাসীকে ঈমান, নামায ও যাকাতের বিধি-বিধান শিখানোর জন্য মুআয রাযি.কে প্রেরণ করা হয়েছিল। হাদীসে যদিও এই তিনটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে মুহাদ্দিসগণ এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, মুআয রাযি.কে মূলত পূর্ণ দ্বীন শেখানোর জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল। হাদীস শরীফের অতুলনীয় দুটি ভাষ্যগ্রন্থ : 'আততামহীদ' ও আলইস্তিযকার'-এর রচয়িতা, ইমাম আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. (৪৬৩ হিজরী) বলেন–

> بَعَثَه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَاضِيًا إِلَى الْجَنَدِ مِنَ الْيَمَنِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ، وَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، ...
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাযি.কে বিচারক হিসাবে ইয়েমেনের 'জানাদ' শহরে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি ইয়েমেনের সাহাবীদেরকে কুরআন এবং ইসলামের বিধানাবলি শিক্ষা দেন।...[১৭৩]

পূর্বে তাকলীদের দলীল আলোচনায় উল্লিখিত ১ম হাদীসে এসেছে যে, মুআয রাযি.-এর নিকট কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে এর সমাধান তিনি প্রথমে কুরআন মাজীদে তালাশ করতেন। কুরআনে না পেলে হাদীস শরীফে অনুসন্ধান করতেন। হাদীস শরীফে না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ করে ফায়সালা করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, মুআয রাযি. ইয়েমেনে গিয়ে খুতবা দিয়েছেন। ইয়েমেনবাসীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন এবং ফিকহ ও কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাটির আরবী পাঠ এই–

خَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ فَحَضَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُّهِ وَالقرْآنِ.[১৭৪]

সুতরাং মুআয রাযি. কুরআন শেখাতেন, কুরআনের ফিকহ ও বিধি-বিধান জানাতেন। কুরআন-হাদীসে প্রাপ্ত বিধানাবলি শেখাতেন, কুরআন-

---

১৭২. সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮ ইত্যাদি; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯- ২৯, ৩০, ৩১

১৭৩. আল-ইসাবাহ ৩/১৪০৩

১৭৪. সুনানে দারেমী, (ফাতহুল মান্নান) ২/৩৪১ (২৩৩)

সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে আহরণকৃত মাসআলা-মাসায়েলও শিক্ষা দিতেন। আর ইয়েমেনবাসী সে শিক্ষা মোতাবেক আমল করতেন। এভাবে ইয়েমেনের সাহাবায়ে কেমার মুআয রাযি.-এর শিক্ষা ও ফিকহ অনুসারে শরীআতের বিধান পালন করতেন। এরই পরিচিত নাম তাকলীদ করা বা মাযহাব মানা।

দুই. ইয়েমেনের আরেকটি প্রসিদ্ধ শহর হলো 'নাজরান'। নাজরানবাসী ইসলামের আলোয় আলোকিত হলে তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হায্‌ম রাযি.কে প্রেরণ করেন। পাঠানোর সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি পত্র লিখে দেন। 'নাজরানে' গিয়ে আমর রাযি. যেসব দায়িত্ব পালন করবেন, এ পত্রে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়। পত্রটির একটি অংশ–

أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ...، وَيُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ وَيُفَقِّهَهُم فِيْهِ.

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর রাযি.কে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন সব বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করেন।... এবং মানুষকে কুরআনের তালীম দেন এবং কুরআনের ফিক্‌হ শিক্ষা দেন।[১৭৫]

এই পত্র সম্পর্কে ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. (৪৬৩ হিজরী) বলেন–

كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ هٰذَا تَلَقَّاهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقُبُوْلِ وَالْعَمَلِ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنَ الْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ.

অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমর ইবনে হায্‌ম রাযি.কে লিখিত এই পত্র সাদরে বরণ করেছেন এবং এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এটি তাদের কাছে একটি মুত্তাছিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, বেশি পরিচিত।[১৭৬]

---

১৭৫. আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে ইসহাক, পৃ. ৬৬৩; তারীখে তবারী ৩/৩৬৯; দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী ৫/৪১৩; তারীখে দিমাশক ৪৫/৪৭৭-৪৭৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/১৯১; আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ৫/৮৭

১৭৬. আল-ইস্তিযকার ২/৪৭১ باب الأمر بالوضوء لمن مس القران

পত্রটির উদ্ধৃত অংশে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর রাযি.কে যেমন কুরআন শেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি কুরআনের ফিক্হও শেখানোর নির্দেশ করেছেন।

আমর ইবনে হাযম রাযি.কে নাজরানে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে হিশাম রহ. (২১৮ হিজরী) ও ইবনে হিব্বান রহ. (৩৫৪ হিজরী) প্রমুখ ইমাম বলেছেন–

لِيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّيْنِ، وَيُعَلِّمَهُمُ السُّنَّةَ، وَمَعَالِمَ الْإِسْلَامِ.

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হায্ম রাযি.কে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি যেন নাজরানবাসীকে দ্বীনের ফিক্হ (হুকুম-আহকাম), সুন্নাহ (নববী পথ ও আদর্শ) ও ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান শিক্ষা দেন।[১৭৭]

বলার অপেক্ষা রাখে না, নাজরানের সাহাবীগণ আমর রাযি. থেকে যেমন কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্ট বিবৃত বিষয়াবলি শিখবেন, তেমনি কুরআন-হাদীস থেকে আহরণকৃত ফিক্হও শিখে থাকবেন এবং সে শিক্ষা ও ফিক্হ মোতাবেক আমল করবেন। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই নাজরানের সাহাবীগণ আমর ইবনে হাযম রাযি.-এর ফিকহ ও মাযহাব অনুসরণ করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই তাকলীদ করতেন

আমরা জেনেছি, তাকলীদ হলো– যাদের কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি হুকুম-আহকাম আহরণ করার যোগ্যতা নেই, তাদের কোনো মুজতাহিদের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা এমনই ছিল। তারা কোনো মুজতাহিদ সাহাবীর শিক্ষা ও ব্যাখ্যা মোতাবেক আমল করতেন। এ সম্পর্কে দুটি উদ্ধৃতি লক্ষ করুন।

---

১৭৭. সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫৯৪; আছ-ছিকাত, ইবনে হিব্বান ১/১৪৯; আল-ইস্তিআব ৩/১১৭৩

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ.-এর বক্তব্য

ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ রহ. (৭৯০-৮৬১ হিজরী) বলেন–

> لَا تَبْلُغُ عِدَّةُ الْمُجْتَهِدِينَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ، كَالْخُلَفَاءِ وَالْعَبَادِلَةِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَقَلِيلٍ، وَالْبَاقُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَفْتُونَ مِنْهُمْ.
>
> সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন তাঁদের সংখ্যা বিশ থেকে বেশি হবে না। যেমন আবু বকর রাযি., উমর রাযি., উসমান রাযি., আলী রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি., মুআয ইবনে জাবাল রাযি., আনাস রাযি., আবু হুরায়রা রাযি. ও আরও কয়েকজন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের শরণাপন্ন হতেন, তাঁদের থেকে মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতেন।[১৭৮]

অর্থাৎ অল্প কয়জন সাহাবী ছাড়া বাকি সকল সাহাবী কোনো না কোনো ফকীহ সাহাবীর তাকলীদ করতেন, তাঁর থেকে জেনে জেনে সে অনুযায়ী আমল করতেন।

শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উসাইমীন রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হিজরী) বলেন–

> وَالتَّقْلِيْدُ فِي الْوَاقِعِ حَاصِلٌ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ الْوُصُوْلَ إِلَى الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ لِجَهْلِهِ، أَوْ قُصُوْرِهِ.

---

১৭৮. ফতহুল কাদীর ৩/৪৫৩; আল-ইশফাক আলা আহকামিত তালাক, পৃ. ৩৪

وَوَظِيْفَةُ هٰذَا أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَسُؤَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الْأَخْذَ بِمَا قَالُوْا، وَالْأَخْذُ بِمَا قَالُوْا هُوَ التَّقْلِيْدُ.

অর্থাৎ বাস্তব কথা হলো, সাহাবীদের যুগ থেকেই তাকলীদ চলে আসছে। কেননা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবীদের যুগে এমন মানুষ ছিলেন, যারা আলেম না হওয়ার কারণে অথবা (আলেম হলেও) বিধান আহরণের যোগ্যতা না থাকার কারণে নিজে নিজে শরীআতের বিধান জানতে সক্ষম ছিলেন না। তাদের কর্তব্য, আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করা। আর আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার দাবি হলো, সে অনুযায়ী আমল করা। আর আলেমগণের বাতানো পদ্ধতিতে আমল করাকেই তাকলীদ বলে।[১৭৯]

সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের নিকট প্রেরিত সাহাবীর তাকলীদ করতেন সব ক্ষেত্রেই : একটি দৃষ্টান্ত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাহাবীকে যে শহরে প্রেরণ করতেন, সে শহরের সাহাবী ও তাবেয়ীগণ খুব গুরুত্বের সাথে তাঁর অনুসরণ করতেন। ওঠা-বসায়ও তারা তাঁর তাকলীদ করতেন। নিচের ঘটনাটা লক্ষ করুন, কিছুটা অনুমান করতে পারবেন, সে যুগে কেমন গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণীয় সাহাবীর মাযহাব মানা হতো। বুশাইর ইবনে ইয়াসার হারেসী রহ. বলেন–

মুআয ইবনে জাবাল রাযি.কে মুআল্লিম হিসেবে যখন ইয়েমেন প্রেরণ করা হয়, তখন তাঁর এক পায়ে সমস্যা ছিল।

فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي الْيَمَنِ فَبَسَطَ رِجْلَهُ فَبَسَطَ الْقَوْمُ أَرْجُلَهُمْ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَلٰكِنْ لا تَعُودُوا، فَإِنِّي إِنَّمَا بَسَطْتُ رِجْلَيَّ فِي الصَّلَاةِ لأَنِّي اشْتَكَيْتُهَا. (صحيح.)

১৭৯. ফতোয়া নূর আলাদ-দারবি ২/২২০

ইয়েমেন গিয়ে তিনি লোকদের নামাযের ইমামতি করেছেন। বসার সময় (অসুস্থ) পা প্রসারিত করে দিয়েছেন। (তাঁর অনুসরণে) লোকেরাও তাদের পা প্রসারিত করে বৈঠক করেছে। নামায শেষ হলে তিনি বললেন, তোমরা ভালো করেছ (যে, আমার অনুসরণ করেছ)। তবে, এমন আর করবে না। কেননা, নামাযের মধ্যে আমি পা প্রসারিত করেছি এ জন্য যে, আমার পায়ে সমস্যা। (তোমাদের পায়ে তো কোনো সমস্যা নেই।)[১৮০]

সালাফী আলেমদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই তাকলীদ করেছেন। বিজ্ঞ ফকীহ সাহাবীর নির্দেশনা অনুসারে শরীআতের বিধি-বিধান পালন করেছেন। সাহাবীদের এই আমলকে কি শিরক বা নাজায়েয বলা যায়?

❊ ❊ ❊

---

১৮০. তবাকাতে ইবনে সাদ ৩/৪৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সাহাবায়ে কেরামের যুগে মাযহাব

সাহাবায়ে কেরামের যুগের মাযহাব সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (১৬১-২৩৪ হিজরী), যিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর অতি শ্রদ্ধেয় উস্তায, হাদীসশাস্ত্রের বরেণ্য বিদ্বান, ইলালুল হাদীসশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম।[১৮১] সাহাবাযুগের মাযহাব সম্পর্কে তিনি লেখেন–

---

১৮১. আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর উস্তায, অন্যতম যুগসেরা হাদীসবিশারদ, ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন–

عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আলী ইবনুল মাদীনী হাদীসশাস্ত্রে সবচেয়ে বড় আলেম। -তারীখে বাগদাদ ১৩/৪২১; তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত, নববী ১/৩৫১; তাহযীবুল কামাল, মিয্যী ২১/১২; আল-কাশেফ, যাহাবী (৩৯৩৭); তাযকিরাতুল হুফ্ফায, যাহাবী ২/১৪: সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৫; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ২/১৪৬

হাফেয আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ফারহাযানী ও আরও একাধিক হাফেযুল হাদীস মুহাদ্দিসের বক্তব্য হলো–

أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِعِلَلِ الحَدِيْثِ: عَلِيٌّ.

ইলালুল হাদীসশাস্ত্রে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হলেন আলী ইবনুল মাদীনী। –সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৯; তাহযীবুত তাহযীব ১১/২৮৩

হাদীসশাস্ত্রের সম্রাট ইমাম বুখারী রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.) বলেন–

مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِي عِنْدَ أَحَدٍ، إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ بنِ المَدِينِيِّ.

কোনো মুহাদ্দিসের সামনে আমি নিজেকে ছোট মনে করিনি। কিন্তু আলী ইবনুল মাদীনীর নিকট গেলে আমার কাছে আমাকে ছোট মনে হয়েছে।

–আল-কামেল ফিযযুআফা ১/২১৩; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২: তারীখে দিমাশক ৫২/৮১; তাহযীবুল আসমা ১/৩৫১; আল-কাশেফ (৩৯৩৭); তাযকিরাতুল হুফ্ফায ২/১৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৬; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ২/১৪৭; মীযানুল ইতিদাল (৫৮৭৪)

لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم من لَهُ صُحَيْبَةٌ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ، وَيُفْتُونَ بِفَتْوَاهُ، وَيَسْلُكُونَ طَرِيقَتَهُ، إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَصْحَابٌ يَقُومُونَ بِقَوْلِهِ، وَيُفْتُونَ النَّاسَ.

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের শাগরেদগণ তাঁদের মাযহাব অনুসরণ করতেন, তাঁদের ফতোয়া অনুসারে ফতোয়া দিতেন এবং তাঁদের পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করতেন—এমন সাহাবী ছিলেন মাত্র তিনজন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.। এঁদের প্রত্যেকের বহু শাগরেদ ছিলেন যারা তাঁদের ফতোয়া সংরক্ষণ করতেন এবং মানুষকে সে অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[১৮২]

এরপর আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ঈমান, আমল ও ইলমের ক্ষেত্রে সে যুগের সর্বাধিক ঐতিহ্যপূর্ণ তিনটি শহর তথা কূফা, মদীনা ও মক্কায় প্রচলিত মাযহাবের আকর্ষণীয় বিবরণ পেশ করেন। প্রথমে কূফার বিবরণ দিয়েছেন, এরপর মক্কা ও মদীনার মাযহাবের আলোচনা করেছেন।

কূফানগরীর মাযহাব অনুসরণ

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মাযহাব তথা সাহাবায়ে কেরামের যুগে কূফাবাসীর মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন–

فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ الَّذِينَ يُقْرِئُونَ النَّاسَ بِقِرَاءَتِهِ، وَيُفْتُونَهُمْ بِقَوْلِهِ، وَيَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ: عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ،

---

১৮২. ইলালুল হাদীস ওয়ামারিফাতুর রিজালি ওয়াততারীখ, ইবনুল মাদীনী (দারু ইবনুল জাওযী, ২য় সংস্করণ ১৪৩০হি.), পৃ. ১০৭ (১৪), ১৩০ (২৬); শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দাহ (দারুল মুসলিম, রিয়াদ, সৌদিআরব, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬ হি.), পৃ. ৮৬-৮৭; আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, বায়হাকী (দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, ১ম সংস্করণ ১৪৩৭হি.), ২/৫৮১-৫৮২

وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ، سِتَّةٌ هَؤُلَاءِ عَدَّهُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর যে সমস্ত শাগরিদ তাঁর কেরাত অনুযায়ী মানুষকে পড়াতেন, তাঁর মত অনুসারে মানুষকে ফতোয়া দিতেন ও তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন, ইবরাহীম নাখাঈর মত অনুযায়ী তাঁরা হলেন এই ছয়জন: আলকামা ইবনে কায়স রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ., মাসরূক ইবনে আজদা রহ., আবীদা সালমানী রহ., আমর ইবনে শুরাহবীল রহ. ও হারেস ইবনে কায়স রহ.।[১৮৩]

এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর যে ছয়জন অনুসারী শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন কুরআন-হাদীসের শ্রেষ্ঠ আলেম, মুজতাহিদ ইমাম। তাঁরা যেখানে আপন উস্তায হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মাযহাব অনুসারে আমল করতেন এবং তাঁর মাযহাব অনুযায়ী মানুষকে ফতোয়া দিতেন, সেখানে কূফার সাধারণ তাবেয়ীরা যে তাঁর মাযহাব মেনে আমল করতেন—তা তো আর দলীল-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর দরকার নেই।

মক্কাবাসীর মাযহাব অনুসরণ

কূফার পর আলী ইবনুল মাদীনী রহ. মক্কার ইমাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মাযহাবের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লেখেন–

وَأَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ، وَيَسْلُكُونَ طَرِيقَهُ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَأَعْلَمُ هَؤُلَاءِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَثْبَتُهُمْ فِيهِ.

---

১৮৩. আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, বায়হাকী ২/৫৮২; ইলালুল হাদীস ওয়ামারিফাতুর রিজালি ওয়াততারীখ, ইবনুল মাদীনী পৃ. ১৩০ (২৬); শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দাহ, পৃ. ৮৭-৮৮

> আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর শিষ্যগণ, যাঁরা তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং তাঁর পথ ও পদ্ধতির উপর চলতেন, তাঁরা হলেন–আতা ইবনে আবী রাবাহ্ রহ., তাউস রহ., মুজাহিদ রহ., জাবের ইবনে যায়েদ রহ., ইকরিমা রহ. ও সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ.। এঁদের মধ্যে সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ. হলেন সবচেয়ে বড় আলেম এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ইলমের ক্ষেত্রে সর্বাধিক মজবুত।[১৮৪]

লক্ষ করুন, আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এখানেও এমন ছয়জন মনীষী তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা ছিলেন সে যুগে মক্কা মুকার্‌রমায় সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেম। তাঁরা প্রখ্যাত ফকীহ্ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন, মক্কায় তাঁর মাযহাবের প্রচার করতেন ও তাঁর মাযহাব অনুযায়ীই মক্কাবাসীকে ফতোয়া দিতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মক্কার সাধারণ তাবেয়ীগণও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন।

মদীনাবাসীর মাযহাব অনুসরণ

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. সাহাবায়ে কেরামের যুগে মদীনাবাসীর মাযহাবের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

> وَكَانَ أَصْحَابُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ فِي الْفِقْهِ، وَيَقُومُونَ بِقَوْلِهِ هَؤُلَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، كَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَقِيَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ،

---

১৮৪. ইলালুল হাদীস ওয়ামারিফাতুর রিজালি ওয়াততারীখ, ইবনুল মাদীনী পৃ. ১২০-১২১ (২১), ১৩০ (২৬); শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দাহ, পৃ. ৯১-৯২ আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, বায়হাকী ২/২৮৩

وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو سَلَمَةَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ.

فَأَمَّا مَنْ لَقِيَهُ مِنْهُم، وَثَبَتَ عِنْدَنَا لِقَاؤُهُ: سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبْ، وَعُرْوَة ابْن الزُّبَيْرِ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا مِنَ الْبَاقِينَ سَمَاعٌ مِنْ زَيْدٍ فِيمَا أُلْقِيَ إِلَيْنَا، إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ فِي الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ.

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর যে শাগরিদগণ তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং তাঁর ফতোয়ার সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করতেন, তারা হলেন বারোজন : সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., কাবীছা ইবনে যুআইব রহ., খারেজা ইবনে যায়েদ রহ., সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রহ., আবান ইবনে উসমান রহ., উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রহ., কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রহ., সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রহ., আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান রহ., আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রহ., তলহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউফ রহ. ও নাফে ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতঈম রহ।

তাদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর সাথে যাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি আমাদের কাছে প্রমাণিত, তাঁরা হলেন– সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., কাবীছা ইবনে যুআইব রহ., খারেজা ইবনে যায়েদ রহ., আবান ইবনে উসমান রহ. ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রহ.।

> আমাদের জানামতে যায়েদ ইবনে সাবেতের সাথে বাকিদের সাক্ষাৎ হয়নি। তবে, তাঁরাও ফিকহ ও ইলমের ক্ষেত্রে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন।[১৮৫]

দেখুন, আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এমন বারোজন মনীষী তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম। তাঁরা মুজতাহিদ সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং তাঁর মাযহাব অনুযায়ীই মদীনাবাসীকে ফতোয়া দিতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, মদীনার সাধারণ তাবেয়ীগণ, যাঁরা ইজতিহাদে পারদর্শী ছিলেন না, তারাও তাঁর মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন।

অন্যান্য মুসলিম শহরের মাযহাব অনুসরণ

আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্যে আমরা কূফা, মদীনা ও মক্কার মাযহাব ও তাদের ইমাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। আলোচনার শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছেন, এই কিতাবে তিনি শুধু ওইসব সাহাবীর মাযহাবের বিবরণ দিয়েছেন, যাঁদের শিষ্যগণ তাঁদের মাযহাবের হেফাযত করেছেন এবং প্রচার-প্রসার করেছেন। আর এমন সাহাবী হলেন তিনজন।

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ওইসব সাহাবীর মাযহাবের বর্ণনা দেননি, যাঁদের মাযহাব ও ফতোয়ার সংরক্ষণ করা হয়নি, যাঁদের শাগরেদগণ তাঁদের ফিকহ ও মাযহাবের প্রচার-প্রসার করেননি। অন্যথায় সাহাবায়ে কেরামের যুগে অন্যান্য শহরেও কোনো না কোনো ফকীহ সাহাবী ছিলেন, যাঁর মাযহাবের আলোকে সে শহরে আমল করা হতো। তাঁর শাগরিদগণ তাঁর কাছে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর ফিক্হ ও ফতোয়া অনুসারে আমল করতেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের শহরগুলো উল্লেখ করা যায়।

---

১৮৫. ইলালুল হাদীস ওয়ামারিফাতুর রিজালি ওয়াততারীখ, পৃ. ১৩১ (২৬) ১২৩-১২৭ (২৩); আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, ২/৫৮২; শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দাহ, পৃ. ৮৩-৮৫

বসরাবাসীর মাযহাব অনুসরণ

সাঈদ ইবনে আবু হেলাল রহ. বলেন, আবুল আসওয়াদ দুআলী রহ. (৬৯ হিজরী) বলেছেন–

> قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ، وَبِهَا أَبُوْ نُجَيْدٍ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ يُفَقِّهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ.
>
> আমি বসরায় গেলাম। সেখানে তখন আবু নুজায়দ ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. ছিলেন। বসরাবাসীকে ফিক্‌হ (দ্বীনের বিধি-বিধান) শিখানোর জন্য উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাকে পাঠিয়েছিলেন।[১৮৬]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) বলেন, তবারানী রহ. সহীহ সনদে সাঈদ ইবনে আবু হেলাল রহ. থেকে আছারটি বর্ণনা করেছেন।[১৮৭]

বলাই বাহুল্য যে, ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বসরাবাসীকে যে ফিকহ বা হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন, তারা সে অনুযায়ী আমল করতেন। আর তাকলীদ করার মানেই তো হলো– কোনো ফকীহের শিক্ষা অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করা।

দামেশক ও হিম্‌ছবাসীর মাযহাব অনুসরণ

শামের (বর্তমান সিরিয়ার) বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী একটি শহর ছিল দামেশক এবং আরেকটি বড় ও প্রসিদ্ধ শহর ছিল হিম্‌ছ। সাহাবাযুগে সেখানের মুসলিমগণও মাযহাব অনুসারে আমল করতেন। উমর রাযি. দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল শেখানোর জন্য দামেশকে পাঠিয়ে ছিলেন আবুদ্দারদা রাযি.কে আর হিম্‌ছে প্রেরণ করেছিলেন উবাদা ইবনে সামিত রাযি.কে। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আলকুরাযী রহ. (৪০-১২০ হিজরী) বলেন–

---

১৮৬. মুজামে কাবীর ১৮/১০৩ (১৮৭); আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ ৭/৭

১৮৭. আলইছাবা ৪/৫৭১

جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ صَامِتٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَدْ كَثُرُوا، وَمَلَئُوا الْمَدَائِنَ، وَاحْتَاجُوا إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهُهُمْ، فَأَعِنِّيْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِرِجَالٍ يُعَلِّمُونَهُمْ.

فَدَعَا عُمَرُ أُولَئِكَ الْخَمْسَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدِ اسْتَعَانُونِي بِمَنْ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ. فَأَعِينُونِي رَحِمَكُمُ اللهُ بِثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ. فَلْيَخْرُجُوا. فَخَرَجَ مُعَاذٌ، وَعُبَادَةُ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ.

فَقَالَ عُمَرُ: اِبْدَءُوا بِحِمْصَ، فَلْيَقُمْ بِهَا وَاحِدٌ، وَلْيَخْرُجْ وَاحِدٌ إِلَى دِمَشْقَ، وَالآخَرُ إِلَى فِلَسْطِينَ. وَقَدِمُوا حِمْصَ، وَأَقَامَ بِهَا عُبَادَةُ، وَخَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى دِمَشْقَ، وَمُعَاذٌ إِلَى فِلَسْطِينَ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় কুরআনুল কারীম জমা করেছেন পাঁচজন আনসারী সাহাবী : মুআয ইবনে জাবাল রাযি., উবাদা ইবনে সামেত রাযি., উবাই ইবনে কাব রাযি., আবু আইয়ুব আনছারী রাযি. ও আবুদ্দারদা রাযি.। উমর রাযি.-এর খেলাফতকালে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. তাঁর কাছে পত্র লিখেছেন, শামের লোকসংখ্যা প্রচুর, প্রত্যেক শহর জনবসতিতে পূর্ণ। তাদেরকে কুরআন এবং দ্বীনের ফিক্‌হ শেখানোর জন্য মুআল্লিমের প্রয়াজন। তাই হে আমীরুল মুমিনীন! কয়েকজন মুআল্লিম পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।

তখন উমর রাযি. ওই পাঁচজন সাহাবীকে ডেকে বললেন, তোমাদের শামদেশী ভাইয়েরা আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে, আমি যেন তাদের কাছে কয়েকজন মুআল্লিম পাঠাই, যারা তাদেরকে কুরআন শেখাবে এবং দ্বীনের মাসায়েল

শিক্ষা দেবে। তোমাদের থেকে তিনজন প্রস্তুত হও এবং শামে রওয়ানা হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন।

তখন মুআয রাযি., উবাদা রাযি. ও আবুদ্দারদা রাযি. বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

উমর রাযি. তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা প্রথমে হিমছে প্রবেশ করবে এবং সেখানে একজন অবস্থান করবে, আরেকজন যাবে দামেশ্‌কে এবং তৃতীয়জন চলে যাবে ফিলিস্তিনে।

উমর রাযি.-এর নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা প্রথমে হিমছে গিয়েছেন এবং উবাদা ইবনে সামেত রাযি. সেখানে অবস্থান করেছেন। এরপর আবুদ্দারদা রাযি. চলে গেছেন দামেশ্‌কে এবং মুআয রাযি.[১৮৮] রওয়ানা হয়েছেন ফিলিস্তিনে।[১৮৯]

বলার অপেক্ষা রাখে না, সেসব এলাকার মুসলিমগণ তাদের নিকট প্রেরিত এসব সাহাবী থেকে কুরআন হাদীসের বিধানাবলি শিখতেন এবং সে অনুযায়ী শরীআতের পাবন্দি করতেন। অর্থাৎ তারা এসব সাহাবীর ফিকহ ও মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।

শামবাসীর মাযহাব অনুসরণ

আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম ইবনে সা'দ আশআরী রহ. (৭৮ হিজরী)-এর জীবনীতে ইমাম ইবনে সা'দ রহ. (২৩০ হিজরী) বলেন–

بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ يُفَقِّهُ النَّاسَ.

উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাঁকে শামে পাঠিয়েছেন, যেন সেখানের মুসলিমদেরকে ফিক্‌হ তথা কুরআন-সুন্নাহর আহকাম শিক্ষা দেন।[১৯০]

---

১৮৮. তিনি আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে ইয়েমেন থেকে মদীনায় চলে এসেছিলেন। পরে উমর রা. ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই তার ইনতেকাল হয়। দ্রষ্টব্য : দালাইলুন নুবুওয়া, বায়হাকী ৫/৪০৫

১৮৯. তাবাকাতে ইবনে সাদ ২/২৭২; আততারীখুল আওসাত, বুখারী ১/৪২; তারীখে দিমাশক ২৬/১৯৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/১৮-১৯

১৯০. তবাকাতে ইবনে সাদ ৭/৩০৭ (৩৮১১); সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/১০

একই কথা বলেছেন ঐতিহাসিক ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ফাসাভী রহ.। তিনি বলেন–

بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ يُفَقِّهُ النَّاسَ

উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাঁকে শামে পাঠিয়েছেন, যেন সেখানের মুসলিমদেরকে ফিক্হ তথা কুরআন-সুন্নাহর আহকাম ও আদাব শিক্ষা দেন।[১৯১]

ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৭৪৮ হিজরী) হিজরী ৭৮ সালের আলোচনায় লেখেন–

وَفِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمنُ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ بِالشَّامِ. وَكَانَ قَدْ بَعَثَهُ عُمَرُ يُفَقِّهُ النَّاسَ.

এই সনে শাম দেশে মৃত্যুবরণ করেন আবদুর রহমান ইবনে গানম আশআরী রহ.। উমর রাযি. তাকে প্রেরণ করেছিলেন সেখানের মুসলিমদের ফিকহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য।[১৯২]

মিশরের আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং মক্কা মুকার্‌রামার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উলূমুল কুরআন ওয়ালহাদীস বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু শাহবা রহ. (১৪০৩ হিজরী) বলেন–

عَبْدُ الرَّحْمنُ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَدْ بَعَثَهُ الْفَارُوْقُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ، كَيْ يُفَقِّهَ النَّاسَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. আবদুল রহমান ইবনে গান্‌ম আশআরী রহ.-কে শামে পাঠিয়েছেন, যেন সেখানের মুসলমানদেরকে হুকুম-আহকাম ও কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেন।[১৯৩]

স্পষ্ট কথা, শামের মুসলিমগণ এই ফকীহ তাবেয়ী[১৯৪]র ফিকহ ও শিক্ষার অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ তাঁর মাযহাব অনুযায়ী আমল করতেন।

---

১৯১. আল-মারিফাতু ওয়াততারীখ ২/৩০৯
১৯২. আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার ১/৬৫
১৯৩. আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়ালমওযূআত ফী কুতুবিত তাফাসীর, পৃ. ৬৭
১৯৪. তিনি সাহাবী না তাবেয়ী ছিলেন, এ ব্যাপারে এখতেলাফ আছে। –তাকরীবুত তাহযীব (৩৯৮৭)

সমগ্র মুসলিমবিশ্বে মাযহাব অনুসরণ

এখানে কয়েকটি শহরের আলোচনা করা হলো যেখানে কোনো ফকীহ ও মুজতাহিদের মাযহাব অনুসারে আমল করা হতো। এর মধ্যে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা ও শাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা, এই শহরগুলো হলো ঈমান ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসভূমি। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী) বলেন–

> هَذِهِ الْأَمْصَارُ الْخَمْسَةُ: الْحِجَازَانِ، وَالْعِرَاقَانِ، وَالشَّامُ، هِيَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا عُلُومُ النُّبُوَّةِ مِنَ الْعُلُومِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْقُرْآنِيَّةِ وَالشَّرِيعَةِ.
>
> এই পাঁচটি শহর : মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা ও শাম হলো এমন শহর, যেখান থেকে ঈমানের ইলম, কুরআনের ইলম ও শরীআতের ইলম তথা নবুওতের বিদ্যা ও আলো ছড়িয়েছে।[১৯৫]

জ্ঞানের কেন্দ্রভূমিসমূহের মুসলিমগণ যখন ফকীহ সাহাবীর তাকলীদ করতেন, তাঁর মাযহাব মোতাবেক আমল করতেন, তখন অন্যান্য শহরবাসী যে মাযহাব মেনে চলতেন তা তো বলাই বাহুল্য।

এটা নিছক অনুমাননির্ভর কথা নয়; বরং বাস্তবিক ইতিহাস। তখনকার যুগে সকল ইসলামী শহরেই কোনো না কোনো মুজতাহিদের শিক্ষা ও নির্দেশনা তথা মাযহাব মোতাবেক আমল করা হতো। কারণ, হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলিম বিশ্বের পরিধি বিস্তৃত হলে তিনি প্রত্যেক এলাকায় একজন ফকীহ সাহাবীকে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে তারা তাঁর থেকে দ্বীন শিখে এবং তার শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসারে আমল করে। ইমাম মালেক রহ. (১৭৯ হিজরী) বলেন–

> إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَكَانَ يَبْعَثُ السَّرَايَا، وَكَانَ يَخْرُجُ، فَلَمْ يَفْتَحْ مِنَ الْبِلَادِ كَثِيْرًا حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ. ثُمَّ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَهُ، فَلَمْ يَفْتَحْ

১৯৫. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ৭/৫২৮

مِنَ الْبِلَادِ كَثِيْرًا، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَهُمَا فَفُتِحَتِ الْبِلَادِ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يَبْعَثَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمِيْنَ.

একসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ করতেন এবং নিজেও যুদ্ধে বের হতেন। তবে বেশি শহর বিজয় হয়নি। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিয়ে গেছেন। তাঁর পরে আবু বকর রাযি. খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তখনও খুব বেশি অঞ্চল বিজিত হয়নি। এরপর উমর রাযি. খেলাফতের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে বহু শহর বিজিত হয়। তখন তিনি বাধ্য হয়ে (বিজিত শহরগুলোতে) মুআল্লিম হিসাবে সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছেন।[১৯৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হিজরী) লেখেন–

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى كُلِّ مِصْرٍ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

উমর রাযি. প্রত্যেক ইসলামী শহরে ফকীহ শিক্ষক প্রেরণ করেছিলেন, যিনি সেখানের মুসলিমদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর তালীম দেবেন।[১৯৭]

কখনো কখনো ফকীহ সাহাবীও তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ সাহাবীর তাকলীদ করতেন

পেছনে ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. ও শায়েখ উসাইমীন রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই ফকীহ সাহাবীর তাকলীদ করে আমল করতেন। এর চেয়ে আরও বড় বিষয় হলো– ফকীহ সাহাবীও অনেক সময় তাঁর থেকে বড় ফকীহের তাকলীদ করতেন।

---

১৯৬. আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৯

১৯৭. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ৭/৫২৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ফকীহ সাহাবীদের শীর্ষ তালিকায়। তিনি অনেক সময় তাঁর চেয়ে বড় সাহাবী উমর রাযি.-এর তাকলীদ করতেন। ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন–

> لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لَهُ أَصْحَابٌ مَعْرُوْفُوْنَ حَرَّرُوْا فُتْيَاهُ وَمَذَاهِبَهُ فِي الْفِقْهِ غَيْرُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَكَانَ يَتْرُكُ مَذْهَبَهُ وَقَوْلَهُ لِقَوْلِ عُمَرَ، وَكَانَ لَا يَكَادُ يُخَالِفُهُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ، وَيَرْجِعُ مِنْ قَوْلِهِ إِلى قَوْلِهِ.
>
> আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবীর এমন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন না, যারা তার ফতোয়া ও ফিকহী মাযহাবগুলো সুবিন্যস্ত করবেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. (ও অনেক সময়) নিজের মাযহাব বর্জন করে উমর রাযি.-এর মাযহাব গ্রহণ করতেন। নিজের মত ছেড়ে দিয়ে উমরের মতের দিকে ফিরে আসতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কোনো বিষয়েই উমর রাযি.-এর মাযহাবের বিপরীত মত গ্রহণ করতে চাইতেন না।[১৯৮]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. নিজেই তো বলেছেন–

لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا وَشِعْبًا، وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، سَلَكْتُ وَادِيَ عُمَرَ وَشِعْبَهُ، وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ قَنَتَ عَبْدُ اللهِ.

সমস্ত মানুষ যদি এক পথে হাঁটে আর উমর হাঁটেন অন্য পথে, আমি উমরের পথেই হাঁটব।

(শাবী রহ. বলেন,) উমর রাযি. যদি ফজরের নামাযে কুনুত পড়তেন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.ও পড়তেন।[১৯৯]

---

১৯৮. ইলামুল মুআক্কিঈন ১/৪১

১৯৯. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, আছার ৭০৫৭; ইলামুল মুআক্কিঈন ১/৪০-৪১

রঈসুল মুফাস্‌সিরীন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. বিখ্যাত ফকীহ। তিনি আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর তাকলীদ করতেন। ফাতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি ছিল– কোনো মাসআলার সমাধান কুরআন ও হাদীসে না পেলে শায়খাইন তথা আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর মত তালাশ করতেন। তাদের মত পাওয়া গেলে সে মতই গ্রহণ করতেন। যদি শায়খাইনের মত না জানতে পারতেন তখন ইজতিহাদ করে ফতোয়া দিতেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ রহ. বলেন–

> سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ وَقَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ. (إسناد صحيح)
>
> আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.কে যখন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো, আর এর সমাধান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ীই ফায়সালা করতেন। যদি কিতাবুল্লাহয় না পেতেন, কিন্তু হাদীস শরীফে পেয়ে যেতেন তাহলে হাদীস মোতাবেক ফায়সালা করতেন। যদি কুরআনেও না থাকে এবং হাদীসেও না থাকে, কিন্তু এ সম্পর্কে আবু বকর ও উমর রাযি.-এর বক্তব্য পাওয়া যেত, তখন তাদের মত অনুসারে ফতোয়া দিতেন। আর যদি এসবের কোনোটাতেই না পেতেন তখন নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে ফতোয়া দিতেন।[২০০]

আছারটিতে স্পষ্টই এসেছে, তরজুমানুল কুরআন আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে আব্বাস রাযি. কুরআন ও সুন্নাহয় না পেলে শায়খাইন তথা আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি.-এর মত গ্রহণ করতেন, তাঁদের মত অনুযায়ী

২০০.সুনানে কুবরা, বায়হাকী ১০/১১৫

ফতোয়া দিতেন। আর কারও মত অনুসারে আমল করার নামই হলো তাকলীদ করা। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. শায়খাইনের তাকলীদ করতেন, তাঁদের মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. প্রসিদ্ধ ফকীহ। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন হাদীসে পেতেন না, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর মাযহাব অনুসারে আমল করতেন। সালাফী ভাইদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন–

> قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ: وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَمَاعَةً مِمَّنْ عَاشَ بَعْدَهُ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا كَانُوْا يُفْتُوْنَ بِمَذَاهِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَا كَانُوْا أَخَذُوْا عَنْهُ، مِمَّا لَمْ يَكُوْنُوْا حَفِظُوْا فِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا.
>
> ইবনে জারীর রহ. বলেছেন, বলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ও তাঁর পরে মদীনায় যেসব সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাদের এক জামাত যে বিষয়গুলোতে তাঁদের কোনো হাদীস জানা ছিলো না, সেসব বিষয়ে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[২০১]

সাহাবায়ে কেরামের যুগে খুব দৃঢ়তার সাথে মাযহাব মানা হতো : একটি দৃষ্টান্ত

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কত গুরুত্বের সাথে মাযহাব অনুসরণ করা হতো, এর একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন। ইমাম বুখারী রহ.-এর শ্রেষ্ঠ উস্তায ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর ভাষ্য থেকে আমরা জেনেছি, সাহাবাযুগে মক্কাবাসীদের মাযহাবের ইমাম ছিলেন ইবনে আব্বাস রাযি.,

---

২০১. ইলামুল মুআক্কিঈন (ইদারাতুশ শুউনুল ইসলামিয়া, কাতার) ১/৪১

আর মদীনাবাসীর মাযহাবের ইমাম ছিলেন যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ইকরিমা রহ. (১০৫ হিজরী) বলেছেন–

إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ.

মদীনাবাসী ইবনে আব্বাস রাযি.কে একবার মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, তাওয়াফ অবস্থায় কোনো মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কী করবে? (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য স্রাব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে, নাকি তখনই ফিরে যাবে?) ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) ফিরে যাবে। তখন মদীনাবাসী বললেন, (যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর মত হলো– এ নারী তাওয়াফ না করে ফিরবে না। আর) যায়েদ ইবনে সাবেতকে বাদ দিয়ে আপনার ফতোয়া আমরা গ্রহণ করব না।[২০২]

আবদুল ওয়াহ্হাব সাকাফীর বর্ণনায় আছারটির ভাষ্য হলো–

لَا نُبَالِيْ أَفْتَيْتَنَا أَوْ لَمْ تُفْتِنَا، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُوْلُ: لَا تَنْفِرُ.

অর্থাৎ আমরা আপনার ফতোয়ার পরোয়া করি না। কেননা যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. বলেছেন, (তাওয়াফ না করে) ফিরে যেতে পারবে না।[২০৩]

কাতাদার বর্ণনায় আছারটির বক্তব্য হলো–

قَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نَتَّبِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا.

মদীনার আনসারগণ বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আপনি যায়েদ ইবনে সাবেতের সাথে মতানৈক্য করছেন। কাজেই এ ব্যাপারে আমরা আপনার অনুসরণ করতে পারি না।[২০৪]

---

২০২. সহীহ বুখারী, আছার ১৭৫৮

২০৩. মুজামে কাবীর, তবারানী ২৫/(৩১৪); আল-মুস্তাখরাজ, ইসমাঈলী : ফতহুল বারী ৩/৬৬৫; উমদাতুল কারী ৮/৩০০

২০৪. মুসনাদে ত্বয়ালীসী, হাদীস ১৭৫৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৪৩২

লক্ষ করুন, মদীনার আনসারগণ কত দৃঢ়তার সাথে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। মদীনার মাযহাবের ইমাম যায়েদ রাযি.-এর মতের বিপরীতে মক্কার মাযহাবের ইমাম ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ফতোয়া মানতে কিছুতেই তারা সম্মত হননি।

এভাবে দৃঢ়তার সাথে কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ করাকে মদীনার আনসারগণ নিজেদের জন্য দোষের কিছু মনে করেননি। তদ্রূপ, ইবনে আব্বাস রাযি. বা অন্য কোনো সাহাবী অথবা তাবেয়ী তাদের এ কাজকে শিরক বলা তো বহু দূরের কথা, এর উপর কোনো ধরনের আপত্তি করেননি।

সালাফী আলেমগণের নিকট একটি জিজ্ঞসা

সাহাবাযুগে যে পদ্ধতিতে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা হয়েছে সে পদ্ধতির উপর কি আপত্তি করা যায়? আর কেউ আপত্তি করলে তা কি গ্রহণীয় হবে?

❁ ❁ ❁

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তাবেয়ীনযুগে মাযহাব

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে যারা মুজতাহিদ ছিলেন না, তারা কোনো না কোনো মুজতাহিদের ফিকহ ও নির্দেশনা অনুসারেই কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করতেন। তাবেয়ীদের যুগেও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। প্রত্যেক ইসলামী শহরে কোনো মুজতাহিদ ও ফকীহের মাযহাব অনুসারে আমল করা হতো। সংক্ষেপণের প্রতি লক্ষ করে তাবেয়ীনযুগের প্রত্যেক শহরের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা না করে এখানে শুধু দুটি বক্তব্য পরিবেশন করছি। আশা করি, এর মাধ্যমে সে যুগে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার পদ্ধতি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রহ.-এর বক্তব্য

মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. (১৮২ হিজরী) তাবেয়ীনযুগের প্রসিদ্ধ শহরগুলোর অনুসরণীয় ইমাম ও ফকীহের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে–

لَمَّا مَاتَ الْعَبَادِلَةُ -عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وعَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو: صَارَ الْفِقْهُ فِيْ جَمِيْعِ الْبُلْدَانِ إِلَى الْمَوَالِيْ، فَصَارَ فَقِيْهَ أَهْلِ مَكَّةَ: عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ، وَفَقِيْهَ أَهْلِ الْيَمَنِ: طَاوُوْسٌ، وَفَقِيْهَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ: يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، وَفَقِيْهَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: الْحَسَنُ، وَفَقِيْهَ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ، وَفَقِيْهَ أَهْلِ الشَّامِ: مَكْحُوْلٌ، وَفَقِيْهَ أَهْلِ خُرَاسَانَ:

عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، إِلَّا الْمَدِينَةَ فَإِنَّ اللهَ خَصَّهَا بِقُرَشِيٍّ فَكَانَ فَقِيْهَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ غَيْرَ مُدَافَعٍ : سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের পরে তাবেয়ীদের যুগে মক্কার ফকীহ (অনুসরণীয় ইমাম) হলেন আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., ইয়েমেনের ফকীহ হলেন তাউস রহ., ইয়ামামার ফকীহ হলেন ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর রহ., বসরার ফকীহ হলেন হাসান বসরী রহ., কূফার ফকীহ হলেন ইবরাহীম নাখায়ী রহ., শামের ফকীহ হলেন মাকহূল রহ., খুরাসানের ফকীহ হলেন আতা আলখুরাসানী রহ., আর মদীনার ফকীহ হলেন সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ.।[২০৫]

'মক্কার ফকীহ হলেন আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.' এ কথার মর্ম কী? এর মর্ম হলো– আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. হলেন মক্কাবাসীর ইমাম। তাঁর ফিক্হ ও ফতোয়া অনুসরণ করে তারা আমল করতেন। এমনিভাবে 'মদীনার ফকীহ হলেন সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ.' এর মানে হলো– সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ. হলেন মদীনার ইমাম। মদীনাবাসী তাঁর ফিক্হ-ফতোয়া অনুসরণ করে আমল করতেন। আর কোনো ইমামের ফিক্হ ও ফতোয়া মোতাবেক কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করার নামই মাযহাব।

তাছাড়া আপনি যদি তারীখ, তারাজিম ও তবাকাতের কিতাবসমূহে অর্থাৎ জীবনচরিতের বিস্তৃত উৎস গ্রন্থাবলিতে এসব ফকীহের জীবনবৃত্তান্ত অধ্যয়ন করেন, তাহলে আপনার সামনে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ এলাকার ইমাম। তাঁদের ফিকহ ও মাযহাব অনুযায়ী ওই এলাকার মুসলিমগণ শরীআতের বিধি-বিধান পালন করতেন। সুতরাং তাঁরা হলেন তাবেয়ীনযুগের প্রসিদ্ধ শহরগুলোর হাদীস ও ফিকহের মুজতাহিদ ইমাম, যাঁদের ফিক্হ ও মাযহাব অনুসারে সে যুগে আমল করা হতো।

---

২০৫. আততারীখুল কাবীর, ইবনে আবী খায়সামা ২/১০৪ (১৯৪২); আখবারু মাক্কা, ফাকেহী ২/৩২৬ (১৬৩২); তবাকাতুল ফুকাহা, আবু ইসহাক শীরাযী ১/৫৮; ইলামুল মুআক্কিঈন ১/৪৬

মুহাদ্দিস আবু মুসহির রহ.-এর বক্তব্য

আবু মুসহির রহ. বলেন, আমি কামেল ইবনে সালামা ইবনে রজা ইবনে হাইওয়া রহ.-কে বলতে শুনেছি–

قَالَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: مَنْ سَيِّدُ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ؟ قَالُوْا: رَجَاءُ ابْنُ حَيْوَةَ. قَالَ: فَمَنْ سَيِّدُ أَهْلِ الْأُرْدُنِ؟ قَالُوْا: عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ. قَالَ: فَمَنْ سَيِّدُ أَهْلِ دِمَشْقَ؟ قَالُوْا: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ. قَالَ: فَمَنْ سَيِّدُ أَهْلِ حِمْصَ؟ قَالُوْا: عَمْرُو بْنُ قَيْسِ السَّكُوْنِيُّ. قَالَ: فَمَنْ سَيِّدُ أَهْلِ الْجَزِيْرَةِ؟ قَالُوْا: عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ.

(উমাইয়া খলীফা) হিশাম ইবনে আবদুল মালিক একবার জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনবাসীর সায়্যিদ তথা ধর্মগুরু কে?

লোকেরা জবাব দিল, রজা ইবনে হায়ওয়া রহ.।

জর্দানবাসীর সায়্যিদ কে?

উবাদা ইবনে নুসাই রহ.।

দামেশ্‌কবাসীর সায়্যিদ কে?

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া গাস্‌সানী রহ.।

হিম্‌ছবাসীর সায়্যিদ কে?

আমর ইবনে কায়স সাকূনী রহ.।

জাযীরাবাসীর সায়্যিদ কে?

আদী ইবনে আদী কিন্দী রহ.।[২০৬]

সায়্যিদ অর্থ নেতা, গুরু। এটি ধর্মীয় গুরু ও রাষ্ট্রীয় নেতা, উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন খলীফা। কোন অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় নেতা কে, এটা তো তার জানাই ছিল। তিনি নিজেই তো তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে তিনি জানতে চাননি;

২০৬.আল-জারহু ওয়াততাদীল ৭/১৭২; আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল পৃ. ৫২-৫৩; আছ্ছিকাত, ইবনে হিব্বান ৪/২৩; তারীখে দিমাশক ২৬/২১৫, ৪৬/৩২১, ৬৫/৫৭; তাহযীবুল কামাল ২২/১৯৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৩২৪

বরং কোন অঞ্চলের ধর্মগুরু কে, সে সম্পর্কেই তিনি জানতে চেয়েছেন। তাই লোকেরা তার প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেক অঞ্চলের ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামের নাম উল্লেখ করেছে।

স্পষ্ট কথা, ধর্মগুরু মানে হলো, ধর্মের বিষয়ে তাঁরা দিক-নির্দেশনা দিতেন, আর লোকেরা তাঁদের সে ফিকহ ও নির্দেশনা মোতাবেক আমল করত। আর এটাই তো তাকলীদ। যেমন আমরা ধর্মীয় বিষয়ে আবু হানীফা রহ.-এর শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করি।

আরেক বর্ণনায় এসেছে–

سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَقِيلَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوْا: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالُوْا: طَاؤُوْسُ، وَعَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ الْجَزِيْرَةِ فَقِيْلَ: مَيْمُوْنُ بْنِ مِهْرَانَ، وَعَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ الشَّامِ، فَقِيْلَ: مَكْحُوْلٌ، وَعَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقِيْلَ: الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَعَنْ فَقِيْهِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ فَقِيْلَ: سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান প্রশ্ন করলেন, মদীনার ফকীহ কে?

বলা হয়েছে, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ.।

মক্কার ফকীহ কে?

আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.।

ইয়েমেনের ফকীহ কে?

তাউস রহ.।

জাযীরার ফকীহ কে?

মাইমুন ইবনে মিহরান রহ.।

শামের ফকীহ কে?

মাকহূল রহ.।

বসরার ফকীহ কে?

হাসান বছরী রহ.।

কূফার ফকীহ কে?

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রহ.।[২০৭]

এই বর্ণনাতে স্পষ্টই এসেছে যে, খলীফা মুসলিম শরহগুলোর ফকীহ তথা ধর্মগুরু সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।

তাছাড়া, আপনি যদি তারাজিম ও তবাকাতের কিতাবাদি হাতে নেন এবং এসব তাবেয়ীর জীবনচরিত অধ্যয়ন করেন তাহলে আরও স্পষ্ট ফুটে উঠবে, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব অঞ্চলের ইমাম। সে অঞ্চলের মুসলিমগণ তাঁদের মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।

মোটকথা, এসব ফকীহ তাবেয়ী ছিলেন নিজ নিজ এলাকার ধর্মগুরু ও ফকীহ। তাঁদের ফিকহ ও ফতোয়া তথা মাযহাব অনুসারে এসব অঞ্চলের মুসলমানগণ কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করতেন।

এ তো হলো প্রসিদ্ধ ও দারুল খিলাফা[২০৮]র নিকটবর্তী শহরগুলোর হাল-চিত্র। দারুল খিলাফা থেকে দূরের, বহু দূরের অঞ্চলগুলোর অবস্থাও ছিল একই। সেসব অঞ্চলেও কোনো ফকীহের ফিকহ ও মাযহাব অনুসারে আমল করা হতো। ফকীহ ইসমাঈল ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবুল মুহাজির মাখযুমী রহ. সম্পর্কে ইমাম ইবনে ইউনুস মিছরী রহ. বলেন–

اِسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَلٰى أَهْلِ إِفْرِيْقِيَّةَ؛ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُفَقِّهُهُمْ فِى الدِّيْنِ.

উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. তাকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেন, যেন তাদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করেন এবং তাদেরকে ফিকহ তথা দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন।[২০৯]

---

২০৭. আততারীখুল কাবীর, ইবনে আবী খায়সামা ২/১০৭ (১৯৬০); তারীখে দিমাশক ৬১/৩৪৭

২০৮. ইসলামী খেলাফতের রাজধানী।

২০৯. তারীখে ইবনে ইউনুস মিছরী ২/৩৭

একই কথা বলেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক খাইরুদ্দীন যিরিকলী রহ.। তিনি বলেন–

اِسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَلٰى أَهْلِ إِفْرِيْقِيَّةَ؛ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَيُفَقِّهُهُمْ فِى الدِّيْنِ، سنة ٩٩ هـ

হিজরী নিরানব্বই সালে উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. তাকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করেন, যেন তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে ফিকহ তথা দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন।[২১০]

* * *

২১০. আল-আলাম, যিরিকলী ১/৩১৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খাইরুল কুরূনের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও মাযহাব অনুসরণ করতেন

খাইরুল কুরূনের মাযহাব অনুসরণের ইতিহাসে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়। তা হলো– সে যুগে যারা হাদীস ও ফিকহের ইমাম ছিলেন, তাঁরাও এমন কোনো ফকীহের মাযহাব অনুসরণ করতেন যিনি ছিলেন ইলম, আমল ও তাকওয়া-তহারাতে তাদের থেকে অগ্রগামী।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. মশহুর ফকীহ। ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে, তাঁরা অনেক সময় তাঁদের থেকে বড় ফকীহের মাযহাব অনুসরণ করতেন।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর মন্তব্যটি আবার দেখে নিতে পারেন। তিনি বলেছেন–

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর যে সমস্ত শাগরিদ তাঁর কেরাত অনুযায়ী মানুষকে পড়াতেন, তাঁর মত অনুসারে মানুষকে ফতোয়া দিতেন ও তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন, –ইবরাহীম নাখায়ীর মত অনুযায়ী– তাঁরা হলেন এই ছয়জন : আলকামা ইবনে কায়স রহ., আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ., মাসরূক ইবনে আজদা রহ., আবীদা সালমানী রহ., আমর ইবনে শুরাহবীল রহ. ও হারেস ইবনে কায়স রহ.।[২১১]

---

২১১. আল-মাদখাল ইলা ইলমিস সুনান, ২/৫৮২; ইলালুল হাদীস ওয়া মারিফাতুর রিজালি ওয়াত তারীখ, পৃ. ১৩০ (২৬); শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দাহ, পৃ. ৮৭-৮৮

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর যে কয়জন শাগরেদের নাম উল্লেখ করেছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি ও ঈমান-আমলে তাঁরা এত উচ্চস্তরের ছিলেন যে, তাঁদের সম্পর্কে পাঁচশ সাহাবীর সান্নিধ্যপরশে ধন্য, যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান[২১২], আমের ইবনে শারাহীল শাবী রহ. (১০৪ হিজরী) বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ قَوْماً قَطُّ أَكْثَرَ عِلْماً، وَلاَ أَعْظَمَ حِلْماً، وَلاَ أَكَفَّ عَنِ الدُّنْيَا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، وَلَوْلاَ مَا سَبَقَهُمْ بِهِ الصَّحَابَةُ، مَا قَدَّمْنَا عَلَيْهِمْ أَحَداً.

জ্ঞানের প্রসারতায়, বুদ্ধির গভীরতায় ও দুনিয়ার নির্মোহতায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শিষ্যদের থেকে অগ্রগামী কোনো সম্প্রদায় আমি কখনো দেখিনি। সাহাবায়ে কেরামের যদি সোহবতের গুণটি না থাকত, তাহলে ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শাগরিদদের উপর আমরা কাউকে প্রাধান্য দিতাম না।[২১৩]

---

২১২. আছেম ইবনে সুলায়মান আহওয়াল রহ. বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ أَهْلِ الكُوْفَةِ وَالبَصْرَةِ وَالحِجَازِ وَالآفَاقِ مِنَ الشَّعْبِيِّ.

কূফা, বছরা, মক্কা, মদীনা এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের হাদীস শাবী থেকে বেশি জানেন এমন কাউকে আমি দেখিনি। –হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৩১০; তারীখে দিমাশক ২৫/৩৬১; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৩০২; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৮৫

আবু মিজলায রহ. বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْقَهَ مِنَ الشَّعْبِيِّ، لاَ سَعِيْدَ بنَ المُسَيِّبِ، وَلاَ طَاوُوْسَ، وَلاَ عَطَاءَ، وَلاَ الحَسَنَ، وَلاَ ابْنَ سِيْرِيْنَ، فَقَدْ رَأَيْتُ كُلَّهُم.

শাবী রহ. থেকে বড় ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম) আমি আর কাউকে দেখিনি। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., তাউস রহ., আতা ইবনে আবু রাবাহ রহ., হাসান বছরী রহ., ইবনে সীরীন রহ., সবাইকে আমি দেখিছি। তাঁদের কেউই শাবী থেকে বড় আলেম নন। –তাযকিরাতুল হুফ্ফায, যাহাবী ১/৮১; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/২৯৯

২১৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, রবী ইবনে খুসায়ম রহ.-এর জীবনী ৫/১৪৯

কূফার এই সকল তাবেয়ী সম্পর্কে ইবনে হায্ম যাহেরী রহ. বলেছেন–

فَمَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فِي التَّابِعِيْنَ كَعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَالرَّحِيْلِ (كَذَا فِي الْأَصْلِ، وَالصَّوَابُ: [عَمْرُو] بْنُ شُرَحْبِيْل، فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْإِحْكَامِ فِيْ غُضُوْنِ هَذِهِ الطَّبْقَةِ) وَمَسْرُوْقٍ وَنُبَاتَةَ وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَغَيْرِهِمْ، فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَفْتَى فِيْ حَيَاةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

অর্থাৎ আলকামা, আসওয়াদ, সুওয়াইদ, আমর ইবনে শুরাহবীল, মাসরূক, নুবাতাহ, সালমান ইবনে রাবীআ প্রমুখ কূফার তাবেয়ীনের মতো তাবেয়ীন মদীনায়ও ছিলেন না। তাঁদের সবাই উমর রাযি.-এর জীবদ্দশাতেই ফতোয়া প্রদান করতেন।[২১৪]

অন্যত্র ইবনে হাযম যাহেরী রহ. কূফার প্রথম তবকার তাবেয়ী আলকামা রহ.সহ ত্রিশজনের বিবরণ দিয়েছেন। এরপর তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে–

وَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَلِيٍّ وَ(٢١٥) أَكَابِرُ التَّابِعِيْنَ، كَانُوْا يُفْتُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَسْتَفْتِيْهِمُ النَّاسُ وَأَكَابِرُ الصَّحَابَةِ أَحْيَاءٌ حَاضِرُوْنَ، يُجَوِّزُوْنَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَدْ أَخَذَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ، ...

---

২১৪. আল-মুহাল্লা ৩/১২৯; মাআরিফুস সুনান ২/১৯১-১৯২

২১৫. قوله «وأكابر التابعين» عطف على «أصحاب» وليس هو ابتداء فقرة كما جاء في المطبوع. فأصحاب ابن مسعود وعلي الذين هم الطبقة الأولى من تابعي الكوفة هم أكابر التابعين وهم الذي كانوا يفتون الناس وأكابر الصحابة حاضرون، وهم الذي أخذ أكثرهم عن عمر بن الخطاب.

وأما الطبقة الأولى من مكة والمدينة من أمثال سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح فهم في طبقة إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير الذين هم من الطبقة الثانية من تابعي الكوفة، لم يأخذ أحد منهم عن عمر بن الخطاب، فضلا عن أن يفتوا في حياة أكابر الصحابة.

وَيُضَافُ إِلَى هَؤُلَاءِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ ـ وَأَخَذَ عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ ـ وَمَيْسَرَةُ وَزَاذَانُ وَالضَّحَّاكُ..

ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُمْ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَعَامِرُ الشَّعْبِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ...

এঁরা হলেন ইবনে মাসউদ রাযি. ও আলী রাযি.-এর শিষ্য এবং শ্রেষ্ঠতর তাবেয়ীন। আকাবির (বিজ্ঞ ও প্রবীণ) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতেই তাঁরা ফতোয়া দিতেন। মানুষ তাঁদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করত। সাহাবায়ে কেরাম তাঁদেরকে এর যোগ্য মনে করতেন।

তাঁদের অধিকাংশই উমর রাযি., আয়েশা রাযি. ও আলী রাযি.সহ অন্যান্য বড় বড় সাহাবী থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমর ইবনে মায়মুন রহ. মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর সুহবতে থেকেছেন এবং তাঁর থেকে ইলম হাসিল করেছেন।...

কূফার এই শ্রেণির তাবেয়ীদের সাথে আরও যুক্ত হবে আবু উবাইদা ইবনে মাসউদ রহ., আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ রহ., আবদুর রহমান ইবনে লাইলা আনসারী রহ. –যিনি ১২০জন সাহাবী থেকে ইলম অর্জন করেছেন– মায়সারা রহ., যাযান রহ. ও যাহ্হাক রহ.।

দ্বিতীয় স্তরের তাবেয়ীন হলেন ইবরাহীম নাখাঈ, আমের শাবী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ...।[২১৬]

---

২১৬. আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (দারুল আফাক আলজাদীদী, বৈরুত, লেবানন,) ৫/৯৫-১০০
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. ইলামুল মুআক্কিঈন গ্রন্থে ইবনে হাযম যাহেরী রহ. -এর পূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু ইবনে হাযম রহ.-এর বরাত উল্লেখ করেননি। দ্রষ্টব্য : ইলামুল মুআক্কিঈন (ইদারাতুশ শুউনুল ইসলামিয়া, কাতার, ১ম সংস্করণ ১৪৩৮হি. ২০১৭ঈ.) ১/৪৪-৫৩

কূফার তাবেয়ীদের মাঝে কতক তো এমন উচ্চপর্যায়ের ছিলেন যে, স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও তাঁদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন।[২১৭]

এমনিভাবে ইবনুল মাদীনী রহ. মদীনার ইমাম যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. এবং মক্কার ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর যেসব অনুসারী শিষ্যদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ছিলেন গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী। সে যুগে মক্কা ও মদীনায় তাঁদের চেয়ে বড় কোনো আলেম ছিলেন না। মক্কা মদীনায় তাঁদের ফিকহ-ফতোয়ার অনুসরণ করা হতো।

সুতরাং ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্য প্রমাণ করছে, খায়রুল কুরূনের বিজ্ঞ আলেমগণও তাঁদের থেকে বড় আলেমের মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ.-এর জীবনীতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে মুজতাহিদ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা পেশ করেছেন। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নাম পেশ করার পর বলেন–

ثُمَّ: عَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوْقٌ، وَأَبُو إِدْرِيْسَ، وَابْنُ المُسَيِّبِ. ثُمَّ: عُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَطَاوُوْسٌ، وَعِدَّةٌ.

এরপর আলকামা রহ., মাসরূক রহ., আবু ইদরীস রহ., সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ.।

এরপর উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ., আমের শাবী রহ., হাসান বছরী রহ., ইবরাহীম নাখাঈ রহ., মুজাহিদ রহ., তাউস রহ. প্রমুখ।[২১৮]

যাহাবী রহ. মুজতাহিদগণের তালিকায় আলকামা রহ., মাসরূক রহ., ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর নামও উল্লেখ করেছেন, যাঁদের সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন, তাঁর মাযহাবের প্রচার-প্রসার করতেন।

২১৭.দ্রষ্টব্য : আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল পৃ. ৪৯ (১৪০); ফিকহু আহলিল ইরাক পৃ. ১২২
২১৮.সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৫২৫

তদ্রূপ, মুজতাহিদ ইমামগণের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে যাহাবী রহ. এখানে সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ. ও উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ.-এর নামও পেশ করেছেন, আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর ভাষ্যমতে যাঁরা যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর তাকলীদ করতেন, তাঁর মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দিতেন।

সুতরাং মাযহাবের ইতিহাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমগণও তাঁদের থেকে অগ্রগামী কোনো বিজ্ঞ আলেমের তাকলীদ করতেন, তাঁর ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা মোতাবেক কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করতেন।

একটি প্রশ্নের উত্তর

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, ইবনে মাসউদ রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি. ও যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর যেসব শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন মুজতাহিদ। বহু বিষয়ে তাঁরা নিজেদের অনুসরণীয় সাহাবীর সাথে মতবিরোধ করেছেন। এসব সাহাবীর মাযহাব অনুসরণ করলে তাঁরা এঁদের সাথে এখতেলাফ করেন কেন?

এর সমাধান হলো, এই তাবেয়ীদের প্রত্যেকেই ছিলেন বিজ্ঞ ফকীহ ও মুহাদ্দিস, শরীআতের পারদর্শী আলেম এবং মুজতাহিদ ইমাম। তাঁদের তাকলীদ আর আমাদের তাকলীদ এক হবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা সাধারণ মানুষ, ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই। এ জন্য সাধারণত সকল বিষয়েই কোনো ইমামের শরণাপন্ন হই। আর তাঁদের ছিল উলূমে শরইয়্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য। ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা রাখতেন। তাই তাঁরা আপন উস্তাযের মাযহাব মানতেন, সাথে সাথে গবেষণাও করতেন। তাঁদের গবেষণায় যে মাসআলায় অনুসরণীয় ইমামের মত দুর্বল মনে হয়েছে, সেখানে তাঁরা নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী অগ্রগণ্য মত অনুসারে আমল করেছেন।

এটাইতো মাযহাব অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি। মাযহাবের অনুসারীদের থেকে যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে, তাঁদের ইজতিহাদ মোতাবেক যদি কোনো বিষয়ের ব্যাপারে সুপ্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত দলীলের নিরিখে

এ বিধানটিতে নিজ মাযহাবের রায় দুর্বল, অন্য মাযহাবের রায় শক্তিশালী, তাহলে নিজ ইমামের মত বর্জন করে অন্য ইমামের মত গ্রহণ করবে। এই এখতেলাফের কারণে তাঁরা ইমামের মাযহাব থেকে বের হয়ে যাবেন না।

বিজ্ঞ আলেমগণের তাকলীদের বড় ক্ষেত্র হলো– ওইসব বিষয়, যেখানে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নেই। কিয়াস করে মাসআলা বের করতে হয়। এসব ক্ষেতে তাঁরা নিজেরা ইজতিহাদ করতেন না। নিজের রায় ও কিয়াসের পরিবর্তে পূর্ববর্তী কোনো ফকীহের মত ও রায় গ্রহণ করতেন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَعْمَلْ إِلَّا بِمَا عَرَفْتُهُ مِنْ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَمَا لَا أَعْرِفُهُ مِنْهُمَا جَعَلْتُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِيْهِ أَبَا حَنِيْفَةَ، لِعِلْمِيْ بِهِ.

হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি কেবল ওই বিষয়েই আমল করেছি, যা আমি আপনার কিতাব এবং আপনার নবীর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। আর যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারিনি, **সেসব ক্ষেত্রে আপনার ও আমার মধ্যে আবু হানীফাকে রেখেছি।** কেননা, তাঁর ব্যাপারে আমার জানা আছে।[২১৯]

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ আলেম, তাদের অনেকেই কোনো কোনো বিষয়ে নিজ ইমামের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. তো উসূল ও ফুরূ' তথা মূলনীতি ও বিধি-বিধান উভয় ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে মতানৈক্য করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা হানাফী মাযহাব থেকে বের হয়ে যাননি।

তদ্রূপ, সাহাবাযুগের বা পরবর্তীযুগের কোনো ইমামের যোগ্য অনুসারী নিজ ইমামের সাথে মতবিরোধ করলে তিনি ওই ইমামের মাযহাব থেকে খারেজ হয়ে যাবেন না।

❊ ❊ ❊

২১৯. আসসাহমুল মুছীব ফির্‌রাদ্দি আলাল খতীব, পৃ. ৬৩, ৫৭-৫৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সালাফের যুগ থেকে অবিসংবাদিত আহলে হাদীসগণের অনুসৃত কর্মধারা

সালাফে ছালেহীনের যুগে যাঁরা আহলে হাদীস ছিলেন, তাঁরা কোনো না কোনো ফকীহের মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন এবং মাযহাব অনুসরণের সমর্থক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল না, তাঁরা তো কোনো মাযহাব মানতেনই, যাঁদের ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল তাঁরাও নিজেকে কোনো মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত রাখতেন। সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে শরীআতের বিধি-বিধান আহরণ করার সাহস করতেন না। হাঁ, তাঁদের মধ্যে হাতেগোনা কেউ কেউ নিজে নিজে ইজতিহাদ করে আমল করতেন। তবে, তাঁরা মাযহাবের অনুসারী কাউকে নিন্দা করতেন না। সাধারণ মানুষকে ফকীহের ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন-সুন্নাহ অনুসণে বারণ করতেন না। আউওয়ামকে ইজতিহাদ করার নির্দেশ দিতেন না।

সে ইতিহাস এখন আপনাদের সামনে পেশ করব। তবে, সালাফের যুগের আহলে হাদীসগণের কর্মধারার বিবরণ দেওয়ার পূর্বে 'আহলে হাদীস' কাকে বলে? আহলে হাদীসের পরিচয় কী? এ যুগের আহলে হাদীস আর সে যুগের আহলে হাদীসের মধ্যে পার্থক্য কী? এসব বিষয় পরিষ্কাররূপে জানা থাকা দরকার। তাই সংগত মনে হচ্ছে, আগে আহলে হাদীসের পরিচিতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হোক।

আহলে হাদীসের পরিচয়

সালাফের সময় 'আহলুল হাদীস' বা 'আছহাবে হাদীস' কোনো দল বা ফিরকার নাম ছিল না, বরং এটি ছিল গৌরবময় খেতাব, সম্মানিত উপাধি। হাদীসের হাফেয এবং হাদীসশাস্ত্রে বিজ্ঞ না হলে কাউকে এ মহান খেতাব দেওয়া হতো না। শাস্ত্রীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জন না করে কেউ আহলে হাদীস হতে পারত না। যিনি হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হতেন, শাস্ত্রীয় উচ্চ ও মহৎ গুণাবলিতে সজ্জিত হতেন, তিনি এ অভিধায় ভূষিত হতেন, তা তিনি যে-কোনো দল বা যে-কোনো মাযহাবেরই অনুসারী হন। যে-ই সেসব উচ্চ গুণ-ছিফাতের অধিকারী হতেন, সে-ই আহলে হাদীস-এর মহান খেতাব লাভ করতেন। কাজেই আহলে হাদীসের পরিচয় জানতে হলে সেইসব ছিফাত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করা প্রয়োজন।

আহলে হাদীসের কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য

খতীব বাগদাদী রহ. (৩৯২-৪৬৩ হিজরী) বলেন–

الْوَصْفُ بِالْحِفْظِ عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، وَهُوَ سِمَةٌ لَهُمْ، لَا يَتَعَدَّاهُمْ وَلَا يُوصَفُ بِهَا أَحَدٌ سِوَاهُمْ.

'হাফেয' শব্দটি উল্লেখ করলে এর দ্বারা কেবল আহলে হাদীসকেই বোঝানো হয়। এটি কারও নয়, শুধু তাঁদের বৈশিষ্ট্য। আহলে হাদীস ব্যতীত অন্য কাউকে হাফেয বলা যাবে না।[২২০]

বোঝা গেল, আহলে হাদীসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'হাফেয' হওয়া। এবার আমাদের জানা দরকার হাফেয কাকে বলে? হাফেযের গুণাবলি কী কী? খতীব বাগদাদী রহ. নিজেই এর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন–

مِنْ صِفَاتِ الْحَافِظِ الَّذِي يَجُوزُ إِطْلَاقُ هَذَا اللَّفْظِ فِي تَسْمِيَتِهِ: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَصِيرًا مُمَيِّزًا لِأَسَانِيدِهَا، يَحْفَظُ مِنْهَا مَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ عَلَى صِحَّتِهِ وَمَا

২২০.আল-জামি লিআখলাকির রাবী ওয়াআদাবিস সামি' ২/১৭২

اخْتَلَفُوا فِيهِ، لِلْاجْتِهَادِ فِي حَالِ نَقَلَتِهِ، يَعْرِفُ فَرْقَ مَا بَيْنَ قَوْلِهِمْ: «فُلَانٌ حُجَّةٌ» وَ«فُلَانٌ ثِقَةٌ» وَ«مَقْبُولٌ» وَ«وَسَطٌ» وَ«لَا بَأْسَ بِهِ» وَ«صَدُوقٌ» وَ«صَالِحٌ» وَ«شَيْخٌ» وَ«لَيِّنٌ» وَ«ضَعِيفٌ» وَ«مَتْرُوكٌ» وَ«ذَاهِبُ الْحَدِيثِ»، وَيُمَيِّزُ الرِّوَايَاتِ بِتَغَايُرِ الْعِبَارَاتِ نَحْوُ «عَنْ فُلَانٍ» وَ«أَنَّ فُلَانًا»، وَيَعْرِفُ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى صَحَابِيًّا أَوْ تَابِعِيًّا، وَالْحُكْمَ فِي قَوْلِ الرَّاوِي «قَالَ فُلَانٌ» وَ«عَنْ فُلَانٍ»، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنَ الْمُدَلِّسِينَ دُونَ إِثْبَاتِ السَّمَاعِ عَلَى الْيَقِينِ، وَيَعْرِفُ اللَّفْظَةَ فِي الْحَدِيثِ تَكُونُ وَهْمًا وَمَا عَدَاهَا صَحِيحًا، وَيُمَيِّزُ الْأَلْفَاظَ الَّتِي أُدْرِجَتْ فِي الْمُتُونِ فَصَارَتْ بَعْضَهَا لِاتِّصَالِهَا بِهَا، وَيَكُونُ قَدْ أَنْعَمَ النَّظَرَ فِي حَالِ الرُّوَاةِ بِمُعَانَاةِ عِلْمِ الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُ.

অর্থাৎ হাফেযের কিছু গুণ হলো এই–

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত হওয়া।

(২) হাদীসের সনদ যাচাইয়ে পারদর্শী হওয়া।

(৩) কোন্ হাদীস সবার কাছে সহীহ, আর বর্ণনাকারীদের স্তর ও পর্যায় নির্ণয়ে ইখতিলাফের কারণে কোন্ হাদীসে ইমামগণের মতানৈক্য আছে সে বিষয়ে সম্যক অবগত থাকা।

(৪) বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে ইমামগণের মন্তব্য সঠিকভাবে বোঝা।

(৫) ইলালুল হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

(৬) রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়া।[২২১]

তো এসব হলো 'হাফেযে'র বৈশিষ্ট্য। আর হাফেয হওয়া আহলে হাদীসের বিশেষত্ব। সুতরাং আহলে হাদীস হতে হলে হাফেযের এই গুণগুলো অর্জন করতে হবে, এসব মহৎ গুণে নিজেকে অলংকৃত করতে হবে। তাই সালাফের যুগে কারও মধ্যে এসব গুণের বিকাশ না পাওয়া গেলে তাকে আহলে হাদীস নামে অভিহিত করা হতো না।

---

২২১. প্রাগুক্ত ২/১৭৩

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম না হলে আহলে হাদীস হওয়া যায় না

সালাফের যুগে যারা ইলমুল হাদীসে পারদর্শী হতেন না, এই শাস্ত্রে ইমাম হওয়ার মহৎ গুণাবলি অর্জন করেননি, তাঁদেরকে আহলে হাদীস উপাধি দেওয়া হতো না। কয়েকটি মন্তব্য লক্ষ করুন।

কিছু মন্তব্য

এক. সালাফের যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় কিছু শায়েখ হাদীসের দরস দিতেন। তাদের সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ. (৯৩-১৭৯ হিজরী) বলেন–

رُبَّمَا جَلَسَ إِلَيْنَا الشَّيْخُ، فَيَتَحَدَّثُ كُلَّ نَهَارِهِ، مَا نَأْخُذُ عَنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَمَا بِنَا أَنَّا نَتَّهِمُهُ، وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

কখনো এমন হয়, একজন শায়েখ আমাদের কাছে (মসজিদে নববীতে) সারাদিন হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন, কিন্তু আমরা তার থেকে কোনো হাদীস শুনি না। তার ধার্মিকতার বিষয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই; বরং এ জন্য তার হাদীস গ্রহণ করি না যে, তিনি আহলে হাদীস নন।[২২২]

অর্থাৎ তিনি শায়েখ, হাদীসের পঠন-পাঠনে ব্যস্ত। কিন্তু আহলে হাদীস নন। তাই তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করিনি।

শায়েখ সারাদিন হাদীস শরীফের পাঠদানে ব্যস্ত থাকেন। এরপরও আহলে হাদীস হতে পারেননি কেন? কারণ হলো– তিনি ইলমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় গুণাবলির অধিকারী অর্জন করেননি। ইমাম মালেকই অন্যত্র এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এ ধরনের শায়েখ থেকে হাদীস গ্রহণ না করার কারণ হলো– তারা হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য হলো–

أَدْرَكْتُ بِهٰذَا الْبَلَدِ مَشْيَخَةً لَهُم فَضْلٌ وَصَلاحٌ يُحَدِّثُونَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم شَيْئًا، قِيلَ: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّثُونَ.

এই শহরে মর্যাদাবান ও দ্বীনদার এমন অনেক শায়েখ পেয়েছি যারা হাদীস শরীফের পাঠদান করেন। কিন্তু আমি তাদের কারও থেকে কোনো হাদীস শুনিনি।

---

২২২. আততামহীদ ১/৪৫; আল-ইনতিকা ১/১৭; তারতীবুল মাদারিক ১/১৩৭

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো– কেন?

তিনি বলেছেন, তারা হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না।[২২৩]

প্রথম বক্তব্যে এসেছে, হাদীসের পাঠদানকারী শায়েখদের থেকে হাদীস গ্রহণ না করার কারণ হলো– তারা আহলে হাদীস নন। আর দ্বিতীয় বক্তব্যে এসেছে, তারা হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না। সুতরাং এইসব শায়েখ ইলমুল হাদীসে পারদর্শী না হওয়ার কারণে তারা আহলে হাদীস হতে পারেননি।[২২৪] তাই তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা ঠিক না।

দুই. ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. 'ওয়াসিত'-এর বড় মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, আমি তাঁর থেকে অধিক হাদীস মুখস্থকারী আর কাউকে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. (১৫৮-২৩৩ হিজরী) বলেছেন–

> يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُمَيِّزُ وَلَا يُبَالِيْ عَمَّنْ رَوٰى.
>
> ইয়াযীদ ইবনে হারূন আহলে হাদীস নন। কারণ তিনি হাদীসের স্তর নির্ণয় করেন না এবং হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের বাছবিচার করেন না।[২২৫]

অথচ তিনি সনদসহ বিপুল পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করেছেন, শ্রেষ্ঠ হাফেযুল হাদীস হয়েছেন, ইলমুল হাদীসের উসূল (নীতিমালা) সম্পর্কে

---

২২৩. কিতাবুল মাজরূহীন (মুকাদ্দিমা) ১/৪১; আল-কামেল ফিযযুআফা ১/১৭৮

২২৪. হায়! এখন তো আহলে হাদীস হওয়া এত সস্তা হয়ে গেছে যে, হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। একজন মূর্খ, হাদীস কাকে বলে তাও বিশুদ্ধভাবে বলতে পারে না, সে আহলে হাদীস হতে পারে! কেউ যদি বলে, আমি উম্মাহর নির্ভরযোগ্য ইমামগণের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা গ্রহণ করব না, বরং এ যমানার সালাফী আলেমের মাযহাব মেনে চলব, তার নির্দেশনা অনুসারে আমল করব, তাহলেই সে আহলে হাদীস হয়ে যাবে, যদিও তার খবর নেই 'আহলে হাদীস' কাকে বলে। আল্লাহই আমাদের হেফাযতকারী।

২২৫. তারীখে বাগদাদ ১৬/৪৯৩; তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩২

সম্যক অবগত। এরপরও আহলে হাদীস হতে পারেননি। কারণ তিনি হাদীস শরীফের পাঠদানের সময় সেসব উসূলের প্রতি লক্ষ রাখেন না।[২২৬]

তিন. আবুল কাসেম আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আলী ছিলেন আরবী ভাষায় পারদর্শী আলেম, কিন্তু হাদীস শরীফ নিয়ে তেমন ব্যস্ততা ছিলো না। তার সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (৫৯৭ হিজরী) বলেন–

لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْعِلْمِ، إِنَّمَا كَانَ يَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَمْ يَرْوِ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيْثِ.

তিনি আহলে হাদীস ছিলেন না। তিনি কেবল আরবী ভাষা জানতেন। কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।[২২৭]

সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন না করে এবং হাদীসের দরস নিয়ে ব্যস্ত না থেকে শুধু আরবীভাষায় পারদর্শী হলেই আহলে হাদীস হওয়া যায় না।[২২৮]

চার. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর ইয়ামামী রহ. ছিলেন বড় দ্বীনদার, হাদীস অনুসরণের মূর্তপ্রতীক। ইসহাক ইবনে আবু ইসরাঈল রহ. বলেন–

وكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، وأَهْلِ الْوَرَعِ والدِّينِ، مَا رَأَيْتُ بِالْيَمَامَةِ خَيْرًا مِنْهُ

তিনি ছিলেন উত্তম ব্যক্তি, মুত্তাকী ও ধার্মিকদের অন্যতম। ইয়ামামায় তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখিনি।[২২৯]

অর্থাৎ জীবনের সকল অঙ্গনে হাদীস অনুসরণ করতেন। ইবাদত, লেনদেন, আচার-আচরণ, আখলাক-চরিত্র সব ক্ষেত্রে হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন। এখানেই শেষ নয়; তিনি হাদীস শরীফ বর্ণনাও করতেন।

---

২২৬. কত সাধনার পর অর্জন হতো সম্মান ও মর্যাদার উপাধি 'আহলে হাদীস'! কিন্তু সালাফী আলেমদের কসরত ও অপচেষ্টায় এই কষ্টসাধ্য ও মহামহিম উপাধি কত সস্তা হয়ে গেছে! কত নিম্নে নেমে এসেছে!

২২৭. আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম ১৪/২৮৫

২২৮. আর এখন তো আরবী ভাষা জানারও প্রয়োজন হয় না। শুধু সালাফী কোনো আলেমের তাকলীদ করলেই আহলে হাদীস হয়ে যায়, যদিও সে হাদীস পড়তে পারে না, হাদীসের অর্থ-মর্ম কিছুই জানে না।

২২৯. আল-কামেল ফিয্যুআফা ৫/৩৫৯; তাহযীবুল কামাল ১৬/২৯৩

তার বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে স্থান পেয়েছে। ছিলেন এক জামাত মুহাদ্দিসের উস্তায।[২৩০]

তা সত্ত্বেও তিনি আহলে হাদীস হতে পারেননি। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন–

لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

তিনি আহলে হাদীস ছিলেন না।[২৩১]

পাঁচ. ইমাম আবদুল মালিক ইবনে হাসান আন্দালুসী (উরফে যুবান) রহ. ছিলেন অনেক বড় মুফতী, সুন্নাহ মোতাবেক আমলকারী আলেম। তাঁর জীবনীতে এসেছে–

كَانَ فَقِيْهًا فَاضِلًا، وَرِعًا.

তিনি ফকীহ, মহৎ ব্যক্তি ও মুত্তাকী (হাদীসের পূর্ণ অনুসারী) ছিলেন।[২৩২]

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইমামগণ তাকে আহলে হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেননা, ইলমুল হাদীসে পারদর্শী ছিলেন না। ইমাম ইবনুল ফারাযী রহ. (৩৫১-৪০৩ হিজরী) বলেন–

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

তিনি আহলে হাদীস ছিলেন না।[২৩৩]

ছয়. মুহাম্মাদ ইবনে আফলাহ আলমাওছিলী রহ. ইমাম আহমদ রহ. ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শরীফের ইলম অর্জন করেছেন এবং ছিলেন আরবী ভাষার কবি। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন না। তাই তিনি

---

২৩০. দ্রষ্টব্য— তাহযীবুল কামাল ১৬/২৯২, ২৯৪

২৩১. তারীখে ইবনে মাঈন, ইবনে তহমান (১৫০)

আর সালাফীদের অবস্থা হলো– হাদীস বর্ণনা করা তো অনেক দূরের, হাদীস পড়া ও হাদীস বোঝারও প্রয়োজন হয় না; এমনকি জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাদীস অনুসরণের দরকার পড়ে না; বরং মতবিরোধপূর্ণ কয়েকটি মাসআলায় সালাফী আলেমের কথামত আমল করলেই আহলে হাদীস বনে যায়, যদিও সে মুআমালা, মুআশারা ও আখলাকের ক্ষেত্রে হাদীস শরীফের ধারেকাছে থাকে না।

২৩২. তারতীবুল মাদারিক ৪/১১০

২৩৩. প্রাগুক্ত

আহলে হাদীস উপাধি লাভ করতে পারেননি। 'তারিখে মাওছিল' কিতাবের লেখক আবু যাকারিয়া মাওছিলী রহ. বলেন–

كَانَ شَاعِرًا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

তিনি কবি ছিলেন, আহলে হাদীস ছিলেন না।[২৩৪]

সাত. ইবনে নাবহান আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ রহ. সম্পর্কে হাফেয যাহাবী রহ. বলেন–

الشَّيْخُ الكَبِيْرُ، العَالِمُ المُعَمَّرُ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ

বড় শায়েখ, বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম, স্বযুগে হাদীসের উচ্চ সনদ প্রদানকারী।[২৩৫]

ইমাম আবু তাহের সিলাফী রহ.সহ বড় বড় মুহাদ্দিসের উস্তায। কিন্তু ইলমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় গুণাবলি পূর্ণরূপে অর্জন করেননি। তাই উলামায়ে কেরাম তাকে আহলে হাদীসের কাতারে শামিল করেননি। ইমাম ইবনে নাছের রহ. বলেন–

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ.

ইবনে নাবহান আহলে হাদীস ছিলেন না।[২৩৬]

আট. যাইনুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনে আবুল হারাম মিসরী রহ. ছিলেন ইলমুল ফিকহের বিজ্ঞ আলেম, মিসরের আলকুব্বাতুল মানসূরিয়া মাদরাসার হাদীস শরীফের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু ইলমুল হাদীসের ইমাম ছিলেন না। তাই তাকে আহলে হাদীস বলা হতো না। তাকিউদ্দীন ইবনে কাজী শাহবা রহ. বলেন–

وَلِيَ مشيخة الحَدِيثِ بِالْقُبَّةِ الْمَنْصُوْرِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

আলকুব্বাতুল মানসূরিয়ায় হাদীসের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছেন। তবে আহলে হাদীস ছিলেন না।[২৩৭]

২৩৪.তাহযীবুল কামাল ২৪/৫০১
২৩৫.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/২৫৫
২৩৬.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/২৫৭
২৩৭.তবাকাতুশ শাফিইয়্যা, ইবনে কাজী শুহবা ২/২৭৭

সালাফের যুগে আহলে হাদীস হওয়া আর মাযহাবের অনুসারী হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না

সে যুগে আহলে হাদীস হওয়ার ভিত্তি ছিল হাদীসের ইলম ও হাদীসশাস্ত্রের পারদর্শিতা অর্জন করা। বিশেষ কোনো মত ও ফিরকার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তাই যারা আহলে হাদীস হতেন, তারা মাযহাবও অনুসরণ করতেন। মাযহাব অনুসরণ করা আর আহলে হাদীস হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ছিল না। বরং কোনো কোনো অঞ্চলে 'আহলে হাদীস' বলাই হতো তাদেরকে, যারা বিশেষ মাযহাবের অনুসারী। ইমাম আবু আমর তকিউদ্দীন ইবনুছ ছালাহ রহ. (৬৪৩ হিজরী) বলেন–

وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَمَذْهَبُ الْحَدِيْثِ، عِبَارَتَانِ يُعَبَّرُ بِهِمَا فِي خُرَاسَان عَنِ الشَّافِعِيَّةِ وَمَذَاهِبِهِمْ، قَدْ صَارَتَا عِنْدهُمْ كَاسْمِ الْعَلَمِ، لِذٰلِكَ لَا يُطْلَقَانِ عَلٰى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

খোরাসান শহরে আসহাবে হাদীস ও মাযহাবে হাদীস বলে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের ব্যক্ত করা হতো। এ দুটি শব্দ শাফেয়ী মাযহাবের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তাই খোরাসানে শাফেয়ী মাযহাব ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে মাযহাবে হাদীস বা আসহাবে হাদীস শব্দ ব্যবহার করা হয় না।[২৩৮]

যাই হোক, সালাফের সময় আহলে হাদীস কোনো ফিরকার নাম ছিল না। আহলে হাদীস আর মাযহাবের অনুসারী ভিন্ন দুই গ্রুফ ছিল না। আহলে হাদীস হলেন বিশেষ কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যে-ই সেসব মহৎ গুণে সজ্জিত হতেন সে-ই আহলে হাদীস, যদিও তিনি মুকাল্লিদ, কোনো ইমামের তাকলীদ করেন। নিম্নে যুগসেরা কতিপয় আহলে হাদীসের পরিচয় তুলে ধরা হলো, যারা আহলে হাদীস হয়েও মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।

✻ ✻ ✻

২৩৮.তবাকাতুল ফুকাহাইশ শাফিইয়্যা ১/২৬৫

সালাফের যুগে মাযহাবের অনুসারী কতিপয় আহলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. (১৩৫-১৯৮ হিজরী)

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ.-এর আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ। ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. (১৫০-২০৪ হিজরী) বলেন–

لاَ أَعْرِفُ لَهُ نَظِيْراً فِي هَذَا الشَّأْنِ.

আমার জানামতে হাদীসশাস্ত্রে আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর সমকক্ষ কেউ নেই।[২৩৯]

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. একাধিকবার বলেছেন–

والله لَوْ أُخِذْتُ، فَحُلِّفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، لَحَلَفْتُ بِاللهِ:
أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَداً قَطُّ أَعْلَمَ بِالحَدِيْثِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ.

আল্লাহর কসম! আমাকে যদি হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে দাঁড় করানো হয় এবং কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলব, আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর চেয়ে বড় হাদীসবিশারদ আমি আর কাউকে দেখিনি কখনো।[২৪০]

---

২৩৯. আল-ইরশাদ ফী মারিফাতি উলামাইল হাদীস ১/২৩৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৯৪; তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৮১; আল-আলাম, যিরিক্‌লী ৩/৩৩৯

২৪০. আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৫২; তারীখু আসমাইছ ছিকাত, পৃ. ১৪৫ (৭৮৭); তাহযীবুল আসমা ১/৩০৫; তাহযীবুল কামাল ১৭/৪৩৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৯৭-১৯৮; তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৮০-২৮১

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ নববী রহ. (৬৩১-৬৭৬ হিজরী) বলেন–

إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي عَصْرِهِ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَمَعَارِفِهِ.

তিনি ছিলেন আপন যুগের সমস্ত আহলে হাদীসের ইমাম এবং হাদীসশাস্ত্রের সকল শাখায় মুহাদ্দিসগণের আশ্রয়স্থল।[২৪১]

এই মহান ইমামও মাযহাব মানতেন, মদীনার ফকীহদের তাকলীদ করতেন। ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন–

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ يَذْهَبُ مَذْهَبَ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَيَقْتَدِي بِطَرِيْقَتِهِم.

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী মদীনার তাবেয়ীদের মাযহাব অনুযায়ী আমল করতেন এবং তাঁদের তরিকা অনুরসণ করতেন।[২৪২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী রহ. ইমাম মালেক রহ.সহ মদীনার অন্যান্য মুজতাহিদদের মাযহাব অনুসরণ করতেন।[২৪৩]

২. ইয়াকুব ইবনে শায়বা সাদুসী মালেকী রহ. (১৮২-২৬২ হিজরী)

হাদীসের ছাত্রদের কাছে পরিচিত একটি নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে শায়বা সাদুসী রহ.। ইমাম আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন–

يَعْقُوْبُ أَحَدُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

ইয়াকুব ইবনে শায়বা আহলে হাদীসের বিশিষ্ট একজন ইমাম।[২৪৪]

---

২৪১. তাহযীবুল আসমা ১/৩০৫

২৪২. আল-ইলাল, ইবনুল মাদীনী, পৃষ্ঠা ৪৫; আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৫২; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/২০০

২৪৩. দ্রষ্টব্য : মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/৪১

২৪৪. তারতীবুল মাদারিক ৪/১৫১

কাযী ইয়ায রহ. (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী) ও ইবনে ফারহুন রহ. (৭৯৯ হিজরী) বলেন–

يَعْقُوْبُ هٰذَا أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَعْلَامِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

তিনি মুসলিমদের অন্যতম ইমাম এবং বিশিষ্ট আহলে হাদীস।[২৪৫]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৬৭৩-৭৪৮ হিজরী) বলেন–

صَاحِبُ الْمُسنَدِ الْكَبِيْرِ المُعَلَّلِ، مَا صُنِّفَ مُسْنَدٌ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلٰكِنَّهُ مَا أَتَمَّهُ.

অর্থাৎ তিনি ইলালুল হাদীসের বিবরণসহ হাদীসশাস্ত্রের এমন বিশাল মুসনাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার থেকে সুন্দর কোনো মুসনাদ গ্রন্থ রচিত হয়নি। কিন্তু তিনি তা পূর্ণ করার সুযাগ পাননি।[২৪৬]

সায়্যেদ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর কাত্তানী রহ. (১৩৪৫ হিজরী) বলেন, যদি মুসনাদ গ্রন্থটি পূর্ণ হতো, তাহলে দুইশ' খণ্ডে সমাপ্ত হতো।[২৪৭]

এই মহান আহলে হাদীস মুহাদ্দিস ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব অনুসারে আমল করতেন।[২৪৮]

৩. আহমাদ ইবনে সায়্যার শাফেয়ী রহ. (২৬৮ হিজরী)

সালাফের যুগে যাদের হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রে সমান পাণ্ডিত্য ছিল, তাদের অন্যতম হলেন ইমাম আবুল হাসান আহমাদ ইবনে সায়্যার মারওয়াযী রহ.। খতীব বাগদাদী রহ. বলেন–

أَحْمَدُ بْن سَيَّارُ بْن أَيُّوبُ أَبُو الْحَسَنِ الْفَقِيهُ الْمَرْوَزِيُّ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي بَلَدِهِ عِلْمًا وَأَدَبًا، وَزُهْدًا وَوَرَعًا، وَكَانَ يُقَاسُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي عَصْرِهِ.

ফকীহ আহমাদ ইবনে সায়্যার মারওয়াযী ছিলেন ইলম, আদব, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতায় স্বদেশের আহলে হাদীস

---

২৪৫. তারতীবুল মাদারিক ৪/১৫১; আদদীবাজুল মুযহাব ২/৩৬৩

২৪৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ২/১১৮

২৪৭. আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ৬৯

২৪৮. দ্রষ্টব্য : আদদীবাজুল মুযহাব ২/৩৬৩; তারতীবুল মাদারিক ৪/১৫০

মুহাদ্দিসগণের ইমাম। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর সাথে তাঁকে তুলনা করা হতো।[২৪৯]

যুগের আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এই মুহাদ্দিস ইমাম শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করতেন।[২৫০]

৪. মুহাম্মাদ ইবনে নছর মারওয়াযী শাফেয়ী রহ. (২০২-২৯৪ হিজরী)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নছর মারওয়াযী রহ. ছিলেন হাদীসের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী রহ. (৩২১-৪০৫ হিজরী) বলেন—

إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ.

তিনি ছিলেন স্বযুগের আহলে হাদীসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম।[২৫১]

ইমাম ইবনে হাযম যাহেরী রহ. (৩৮৪-৪৫৬ হিজরী) বলেন—

أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَجْمَعهُم للسُّنَنِ، وَأَضْبَطهُم لَهَا، وَأَذْكَرهُمْ لِمَعَانِيهَا، وَأَدرَاهُمْ بِصِحَّتِهَا، وَبِمَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا اخْتَلفُوا فِيْهِ.

قَالَ: وَمَا نَعْلَمُ هَذِهِ الصِّفَةَ -بَعْد الصَّحَابَةِ- أَتَمَّ مِنْهَا فِي مُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ المَرْوَزِيِّ، فَلَو قَالَ قَائِل: لَيْسَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ وَلاَ لأَصْحَابِهِ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ لَمَا أَبْعَدَ عَنِ الصِّدْقِ.

---

২৪৯. তারীখে বাগদাদ ৫/৩০৬; তবাকাতুল ফুকাহাইশ শাফিঈয়্যাহ ১/৩৪২ (১০৩); তাহযীবুল আসমা ১/ ১১৩

২৫০. দ্রষ্টব্য : তাহযীবুল আসমা ১/ ১১৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১২/৬১০; তারীখুল ইসলাম ৬/২৬৫; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ২/১৮৩; তাহযীবুত তাহযীব ১/৭৯

২৫১. তারীখে নায়সাবুর, পৃ. ৫৮ (১১৩৬); তবাকাতুল ফুকাহা, ইবনুস সালাহ ১/২৭৭-২৭৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ২/১৬৫; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ২/২৪৭

> সবচেয়ে বড় আলেম হলো ওই ব্যক্তি, যার হাদীস ও আছার সবার চেয়ে বেশি মুখস্থ, আছার ও হাদীসের মর্ম-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, এ সবের স্তর নির্ণয়ে সব থেকে বেশি পারদর্শী, ইমামগণের ঐকমত্যপূর্ণ ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।
>
> আর আমাদের জানামতে সাহাবায়ে কেরামের পর এইসব গুণাবলি মুহাম্মাদ ইবনে নছর মারওয়াযীর মধ্যে যেমন পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, অন্য কারও মধ্যে এমন ছিল না। কেউ যদি আরও অগ্রসর হয়ে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের কোনো আছার মুহাম্মাদ ইবনে নছর মারওয়াযীর অজানা ছিল না, তাহলে তার কথা অসত্য হবে না।[২৫২]

এই মহান আহলে হাদীস মুহাদ্দিস ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করতেন।[২৫৩]

৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বুশানজী মালেকী রহ. (২০৪-২৯১ হিজরী)

তিনি একজন প্রাজ্ঞ হাদীসবিশারদ। ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (৫৭৯ হিজরী) বলেন–

شَيْخُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ.

> আবু আবদুল্লাহ বুশানজী রহ. ছিলেন সমকালের আহলে হাদীসগণের শায়েখ।[২৫৪]

২৫২.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/৪০; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৬/১০৪৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ২/৬৫৩; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ২/২৪৭-২৪৯

২৫৩.দ্রষ্টব্য : তবাকাতুল ফুকাহা, ইবনুস সালাহ ১/২৭৭; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ২/২৪৬, ২৪৯; তবাকাতুশ শাফিইয়্যীন, ইবনে কাছীর ১/১৮৪; আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ৪৬

২৫৪.আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম ১৩/২৯

একই কথা বলেছেন ইমাম আবুল হাজ্জাজ মিয্যী রহ. (৬৫৪-৭৪২ হিজরী), শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৬৭৩-৭৪৮ হিজরী) ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৭৭৩-৮৫২ হিজরী)।[২৫৫]

তিনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম।[২৫৬]

৬. ইবনুল জাব্বাব কুরতুবী মালেকী রহ. (২৪৬-৩২২ হিজরী)

ইমাম আবু আমর আহমদ ইবনে খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল জাব্বাব কুরতুবী রহ. সম্পর্কে ইবনে ফারহুন রহ. বলেন–

كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ إِمَامَ وَقْتِهِ، غَيرَ مُدَافَعٍ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالْعِبَادَةِ.

তিনি ছিলেন স্পেনে ফিক্হ, হাদীস ও ইবাদত-বন্দেগিতে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম।[২৫৭]

এই ইমাম ইবনুল জাব্বাব রহ. ছিলেন মালেকী মাযহাবের বিজ্ঞ মুহাদ্দিস।[২৫৮]

৭. ইবনে আবু হাতেম শাফেয়ী রহ. (২৪০-৩২৭ হিজরী)

আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবনে আবু হাতেম হানযালী রহ. ছিলেন ইলমের অথৈ সমুদ্র এবং হাদীসশাস্ত্রের বহু গ্রন্থপ্রণেতা। এগুলোর মধ্যে বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'আলজারহু ওয়াততাদীল' ও 'কিতাবুল ইলাল' গ্রন্থদ্বয়, যা থেকে পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস উপকৃত হয়েছেন। আবু ইয়ালা খলীলী রহ. বলেন–

كَانَ بَحْراً فِي الْعُلُوْمِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ.

উলূমে শরইয়্যা ও রিজাল-শাস্ত্রে ইবনে আবু হাতেম রহ. ছিলেন ইলমের সাগর।[২৫৯]

২৫৫.দ্রষ্টব্য : তাহযীবুল কামাল ২৪/৩০৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/৫৮১; তারীখুল ইসলাম ৬/১০০৩; তাহযীবুত তাহযীব ৬/১০৬

২৫৬.দ্রষ্টব্য : সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/৫৮১; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৬/১০০৩

২৫৭.আদদীবাজুল মুযহাব ১/১৬০

২৫৮.দ্রষ্টব্য : আদদীবাজুল মুযহাব ১/১৬০

২৫৯.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/২৬৪; তবাকাতুস সুবকী ৩/৩২৫

এই মহান মুহাদ্দিসও ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।[২৬০]

৮. আবু বকর ইসমাঈলী শাফেয়ী রহ. (২৭৭-৩৭১ হিজরী)

হাদীসের জগতে আপন ধীশক্তির যোগ্যতায় যারা ছিলেন স্বযুগের সবার শীর্ষে, তাদের অন্যতম হলেন আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আবু বকর ইসমাঈলী রহ.। হাকেম নিশাপুরী রহ. বলেন–

كَانَ الْإِسْمَاعِيْلِيُّ وَاحِدَ عَصْرِهِ وَشَيْخَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ.

আবু বকর ইসমাঈলী রহ. ছিলেন স্বযুগের অনন্য ইমাম এবং মুহাদ্দিস ও ফকীগণের শায়েখ।[২৬১]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর মতো প্রবাদতুল্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি আবু বকর ইসমাঈলী রহ.-এর স্মরণশক্তির প্রখরতা এবং হাদীসশাস্ত্রের বিশাল বিস্তৃতি দেখে অভিভূত হয়েছেন এবং বলেছেন–

> وَابْتَهَرْتُ بِحِفْظِ هٰذَا الْإِمَامِ، وَجَزَمْتُ بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرِيْنَ عَلٰى إِيَاسٍ مِنْ أَنْ يَلْحَقُوا الْمُتَقَدِّمِيْنَ فِي الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ.
>
> ইমাম আবু বকর ইসমাঈলী রহ.-এর স্মৃতিশক্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস করেছি যে, স্মৃতিশক্তি ও বোধবুদ্ধির পারদর্শিতায় পূর্ববর্তী ইমামগণের নাগাল পাওয়া পরবর্তী আলেমদের জন্য অসম্ভব।[২৬২]

তাঁর মতো মহান আহলে হাদীস ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করতেন।[২৬৩]

---

২৬০. দ্রষ্টব্য : তবাকাতুল ফুকাহাইশ শাফিইয়্যাহ, ইবনুস সালাহ ১/৫৩৪; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ৩/৩২৫

২৬১. সিয়ারু আলামিন নুবালাহ ১৬/২৯৪; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৮/৩৫৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/১০৬-১০৭; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৩/৮

২৬২. তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/১০৬; আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ২৬

২৬৩. দ্রষ্টব্য : তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/১০৬; তবাকাতুশ শাফিইয়্যা, সুবকী ৩/৭; আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ২৬

৯. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ জানযী শাফেয়ী রহ.

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. (৫৭৭-৬৪৩ হিজরী) বলেন–

مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ.

তিনি ছিলেন আহলে হাদীস ও ফকীহদের একজন।[২৬৪]

দারাকুতনী রহ. বলেন, তিনি শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী ফিক্হের চর্চা করতেন।[২৬৫]

১০. আবু হাতেম ইবনে হিব্বান শাফেয়ী রহ. (৩৫৪ হিজরী)

আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান বুসতী রহ. ছিলেন হাদীস, ফিক্হ, তারীখ, রিজাল প্রভৃতি শাস্ত্রের ইমাম। হাদীসের বিষয়ে 'আসসহীহ' এবং রিজালশাস্ত্রে 'আছছিকাত' ও 'আলমাজরুহীন' ইত্যাদি কালজয়ী গ্রন্থই তাঁর পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। আবু সা'দ সামআনী রহ. বলেন–

كَانَ أَبُوْ حَاتِمٍ إِمَامَ عَصْرِهِ.

ইবনে হিব্বান রহ. ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম।[২৬৬]

তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।[২৬৭]

১১. ইমাম দারাকুতনী শাফেয়ী রহ. (৩০৬-৩৮৫ হিজরী)

হিজরী ৪র্থ শতাব্দী বা এর পরের এমন কোনো মুহাদ্দিস পাওয়া বিরল, যিনি হাদীসশাস্ত্রে আবুল হাসান আলী ইবনে উমর ইবনে আমহদ দারাকুতনী রহ.-এর বিস্তৃত জ্ঞানের সামনে নিজেকে হীন জ্ঞান করতেন না। ইমাম আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন সুলামী রহ. (৩২৫-৪১২ হিজরী) বলেন–

---

২৬৪. তবাকাতুল ফুকাহাইশ শাফিইয়্যাহ ১/৩১৯

২৬৫. দ্রষ্টব্য : তবাকাতুল ফুকাহাইশ শাফিইয়্যাহ, ইবনুস সালাহ ১/৩১৯; আল-আনসাব, সামআনী ৩/৩৫৫

২৬৬. আল-আনসাব ২/২২৫; তবাকাতুল ফুকাহা, ইবনুস সালাহ ১/১১৬; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, সুবকী ৩/১৩২

২৬৭. আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ২০

شَهِدْتُ بِاللهِ إِنَّ شيخَنَا الدَّارَقُطْنِيَّ لَمْ يُخَلِّفْ عَلَى أَدِيمِ الْأَرضِ مِثْلَهُ، فِي مَعْرِفَةِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذٰلِكَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَتْبَاعِهِم.

আমি আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের উস্তায দারাকুতনী রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনে আছার (আমল ও ফতোয়া) সম্পর্কে তাঁর মতো কোনো আলেম রেখে যাননি।[২৬৮]

খতীব বাগদাদী রহ. বলেন–

كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ فَرِيدَ عَصْرِهِ، وَقرِيعَ دَهْرِهِ، وَنَسِيْجَ وَحْدِهِ، وَإِمَامَ وَقْتِهِ، انْتَهَى إِلَيْهِ عِلْمُ الْأَثرِ وَالمعرفَةِ بِعِلَلِ الحَدِيْثِ وَأَسمَاءِ الرِّجَالِ.

দারাকুতনী রহ. ছিলেন সে যুগের অনন্য, অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। হাদীস ও আছারের জ্ঞানে এবং ইলাল ও রিজাল শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে।[২৬৯]

হাফেয যাহাবী রহ. বলেন–

وَأَمَّا الدَّارَقُطْنِيُّ فَمَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ.

দারাকুতনী রহ. নিজে তাঁর মতো কোনো আলেম দেখেননি।[২৭০]

অর্থাৎ তাঁর সমসাময়িকদের মাঝে এত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন না এবং তাঁর উস্তাযগণের মধ্যেও কেউ এত উচ্চস্তরের আহলে হাদীস ছিলেন না।

এই মহান আহলে হাদীস যে শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব অনুসারে আমল করতেন তা তো সকল তালেবে ইলমেরই জানা।

---

২৬৮. তারীখে বাগদাদ ৪৩/১০৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/৪৫৭
২৬৯. তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৮৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৬/৪৫২
২৭০. তবাকাতুশ শাফিইয়্যা, সুবকী ১০/২২১

১২. আবু সুলায়মান খাত্তাবী শাফেয়ী রহ. (৩৮৮ হিজরী)

ফিক্‌হ ও হাদীস উভয় ময়দানে যাদের ছিল সমান পদচারণা ও গ্রহণযোগ্যতা, তাঁদের অন্যতম হলেন হাম্‌দ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবু সুলায়মান খাত্তাবী রহ.। তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন–

كَانَ إِمَامًا فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَاللُّغَةِ.

তিনি ছিলেন হাদীস, ফিক্‌হ ও আরবী ভাষার ইমাম।[২৭১]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন, তিনি শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী ফিক্‌হ অর্জন করেছেন।[২৭২]

১৩. হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী শাফেয়ী রহ. (৩২১-৪০৫ হিজরী)

হাদীসের শিক্ষার্থীদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম হাকেম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী রহ.। আবদুল গাফের ইবনে ইসমাঈল রহ. (৪৫১-৫২৯ হিজরী) বলেন–

هُوَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي عَصْرِهِ، اَلْعَارِفُ بِهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ.

হাকেম আবু আবদুল্লাহ রহ. স্বযুগের আহলে হাদীসের ইমাম, হাদীসশাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী।[২৭৩]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন–

اَلْإِمَامُ الْحَافِظُ النَّاقِدُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِيْنَ.

হাদীসের হাফেয, হাদীসশাস্ত্রে বোদ্ধা-সমালোচক ও মুহাদ্দিসগণের শায়েখ।[২৭৪]

তিনি যে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী তা সর্বজনস্বীকৃত।

---

২৭১. তবাকাতুশ শাফিইয়্যা ৩/২৮২

২৭২. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/২৪

২৭৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ৩/১৬৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/১৬৯; তবাকাতুশ শাফেয়ীয়্যীন, ইবনে কাছীর ১/৩৬০

২৭৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/১৬৩

১৪. ইবনে আবদুল বার মালেকী রহ. (৩৬৮-৪৬৩ হিজরী)

ইমাম আবু উমর ইবনে আবদুল বার রহ. ছিলেন হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রের সম্রাট। ইমাম ইবনে বাশকুয়াল খালাফ ইবনে আবদুল মালিক রহ. (৪৯৪-৫৭৮ হিজরী) বলেন–

اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِمَامُ عَصْرِهِ وَوَاحِدُ دَهْرِهِ.

ইবনে আবদুর বার রহ. আপন সময়ের ইমাম, স্বযুগের অদ্বিতীয়।[২৭৫]

ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

خَضَعَ لِعِلْمِهِ عُلَمَاءُ الزَّمَانِ.

সেযুগের সমস্ত আলেম তাঁর ইলমের সামনে মাথা নত করেছেন।[২৭৬]

তাঁর পরিচয়ের জন্য মুয়াত্তা মালেকের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আততামহীদ' ও 'আলইস্তিযকার'ই যথেষ্ট। আততামহীদ সম্পর্কে আবু আলী গাস্সানী রহ. (৪২৭-৪৯৮ হিজরী) ও আবুল ওয়ালীদ বাজী (৪০৩-৪৭৪ হিজরী) রহ. বলেন–

هُوَ كِتَابٌ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهِ.

এটি এমন গ্রন্থ, তাঁর পূর্বে এমন ব্যাখ্যাগ্রন্থ আর কেউ লেখেননি।[২৭৭]

ইবনে হাযম যাহেরী রহ. বলেন–

لَا أَعْلَمُ فِي الْكَلَامِ عَلَى فِقْهِ الْحَدِيْثِ مِثْلَهُ، فَكَيْفَ أَحْسَنَ مِنْهُ؟

আমার জানামতে হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর মতো কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। যদি থাকতো এর চেয়ে সুন্দর হওয়ার কথা![২৭৮]

পরবর্তীতে হাদীসের এমন কোনো ব্যাখ্যাকার নেই, যিনি তাঁর এই গ্রন্থদ্বয় হতে উপকৃত হননি এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেননি।

---

২৭৫. আছছিলাহ ২/৬৭৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৫৭

২৭৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৫৪

২৭৭. আছছিলাহ ২/৬৭৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৫৮; ওফায়াতুল আয়ান ৭/৬৭; আদদীবাজুল মুযহাব ২/৩৬৭

২৭৮. আছছিলাহ ২/৬৭৮; বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃ. ৪৯০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/১৫৮; আদদীবাজুল মুযহাব ২/৩৬৭; আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ১১৩

তিনি যে ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী এবং সে মাযহাবের অনেক বড় ইমাম, এর জন্য দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

১৫. আবু বকর খতীব বাগদাদী শাফেয়ী রহ. (৩৯২-৪৬৩ হিজরী)

হাদীস ও তারীখের জগতে একটি অতি পরিচিত নাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ.। 'তারীখে বাগদাদ' কিতাব তাঁকে সবার কাছে প্রসিদ্ধি দান করেছে। ইলমের ময়দানে তাঁর মাকাম বোঝার জন্য দুটি মন্তব্য পেশ করছি। ইমাম আবু বকর ইবনে নুকতা হাম্বলী রহ. (৫৭৯-৬২৯ হিজরী) বলেন–

كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِيْنَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ.

যে কেউ ইনসাফের সাথে দৃষ্টি করবে সেই জানতে পারবে যে, খতীব বাগদাদীর পরের সকল মুহাদ্দিস তাঁর কিতাবসমূহের উপর নির্ভরশীল।[২৭৯]

শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

صَارَ أَحْفَظَ أَهْلِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

অর্থাৎ তিনি ছিলেন স্বযুগে সারা দুনিয়ার সবচে' বড় হাফিযুল হাদীস।[২৮০]

তাঁর মাযহাব সম্পর্কে হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

كَانَ مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ.

তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের বড় ব্যক্তিত্ব।[২৮১]

তিনি শাফেয়ী মাযহাব অনুসরণ করতেন, আবার আহলে হাদীসও ছিলেন। ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. 'মুরসাল' হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে একটি মত উল্লেখ করে বলেন–

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ

আহলে হাদীসের মধ্যে খতীব বাগদাদী রহ. এই মত গ্রহণ করেছেন।[২৮২]

---

২৭৯. আততাকঈদ লিমারিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল মাদানীদ ১/১৫৪; নুযহাতুন নাযার, পৃ. ৩

২৮০. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/২৭১

২৮১. প্রাগুক্ত ১৮/২৭৪

২৮২. মারিফাতু আনওয়াই ইলমিল হাদীস, ইবনুস সালাহ, পৃ. ৫২

হাদীসশাস্ত্রের একটি উসূল উল্লেখ করে ইবনুস সালাহ রহ. বলেন–

وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ

এই উসূলটি আহলে হাদীসের মধ্য থেকে যারা উল্লেখ করেছেন, তাদের একজন হলেন খতীব বাগদাদী রহ.।[২৮৩]

১৬. কাযী ইবনে সুক্কারা সারাকুসতী মালেকী রহ. (৫১৪ হিজরী)

আবু আলী সাদাফী হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুক্কারা সারাকুসতী রহ. ছিলেন ইলমুল হাদীসের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং মালেকী মাযহাবের অনুসারী ইমাম। ইমাম ইবনে ফারহুন মালেকী রহ. (৭৯৯ হিজরী) বলেন–

> إِمَامُ عَصْرِهِ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، وَآخِرُ أَئِمَّتِهِ فِي الْأَنْدَلُسِ، وَكَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيْثِ وَأَسْمَاءِ رِجَالِهِ وَعِلَلِهِ.
>
> আবু আলী সাদাফী ইবনে সুক্কারা সারাকুসতী রহ. ছিলেন হাফিযুল হাদীস মুহাদ্দিস, ইলমুল হাদীসে যমানার ইমাম, স্পেনের সর্বশেষ হাদীসবিশারদ এবং রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রদ্বয়ে পারদর্শী।[২৮৪]

১৭. আবু আলী জায়্যানী গাস্সানী মালেকী রহ. (৪২৭-৪৯৮ হিজরী)

মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইমাম হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আবু আলী জায়্যানী রহ. সম্পর্কে ইবনে ফারহুন মালেকী রহ. বলেন–

> إِمَامُ عَصْرِهِ فِي الْحَدِيثِ، رَأَسَ فِيهِ أَهْلَ عَصْرِهِ، وَحَازَ السَّبْقَ لِمَعْرِفَتِهِ بِرِجَالِهِ وَصَحِيحه وَسَقِيْمِهِ وَلُغَتِهِ.
>
> তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্রে আপন যুগের ইমাম এবং উলূমুল হাদীস ও লুগাতুল হাদীসে সবার সেরা। এসব বিষয়ে তিনি স্বযুগের নেতৃত্ব দিয়েছেন।[২৮৫]

২৮৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

২৮৪.আদদীবাজুল মুযহাব ১/৩৩০

২৮৫.আদদীবাজুল মুযহাব ১/৩৩৩

১৮. কাযী ইয়ায আবুল ফযল মালেকী রহ. (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী)

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবুল ফযল ইয়ায ইবনে মূসা ইবনে ইয়ায ইয়াহছুবী রহ. ছিলেন হাদীসের জগতে বিজ্ঞ ও বিখ্যাত ইমাম। ইবনে ফারহুন রহ. বলেন–

كَانَ القَاضِي أَبُو الْفَضْلِ إِمَامَ وَقْتِهِ فِي الْحَدِيثِ وَعُلُوْمِهِ، عَالِمًا بِالتَّفْسِيْرِ وَجَمِيعِ عُلُوْمِهِ.

আবুল ফযল কাযী ইয়ায রহ. ছিলেন হাদীস ও উলূমে হাদীসে সে সময়ের ইমাম এবং তাফসীরের সকল শাখায় অভিজ্ঞ।[২৮৬]

শামসুদ্দীন ইবনে খাল্লিকান রহ. (৬০৮-৬৮১ হিজরী) বলেন–

هُوَ إِمَام الحَدِيْث فِي وَقْتِهِ، وَأَعْرَفُ النَّاس بِعُلُوْمِهِ، وَبِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَكَلَامِ العَرَبِ وَأَيَّامِهِم وَأَنسَابِهِم.

কাযী ইয়ায রহ. তাঁর সময়ে হাদীসের ইমাম এবং উলূমুল হাদীসের সর্ববিষয়ে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। আরবী ব্যাকরণ, আরবী ভাষা, আরবী গদ্য-পদ্য এবং আরবদের ইতিহাস ও বংশপরিচয় সম্পর্কে সবচে বেশি পারদর্শী।[২৮৭]

১৯. ইবনে আসাকির দামেশ্‌কী শাফেয়ী রহ. (৪৯৯-৫৭১ হিজরী)

তারীখ ও হাদীসশাস্ত্রে বিশ্ববিশ্রুত একটি নাম আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির দামেশ্‌কী রহ.। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর মতো প্রবাদতুল্য হাফেযুল হাদীস বলেছেন–

لَا يُلْحَقُ شَأْوُهُ، وَلَا يُشَقُّ غُبَارُهُ، وَلَا كَانَ لَهُ نَظِيْرٌ فِي زَمَانِهِ.

তাঁর উচ্চতায় পৌঁছা অসম্ভব, দৌড়িয়ে তাঁর ধূলির নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। সে যুগে তিনি ছিলেন নযিরবিহীন।[২৮৮]

২৮৬.আদদিবাজুল মুযহাব ২/৪৭

২৮৭.ওফায়াতুল আয়ান ৩/৪৮৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২০/২১৫

২৮৮.সিয়ারু আলামিন নুবালা ২০/৫৫৬

তিনি উলূমে শরইয়্যার মূল্যবান বহু গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁর ইলমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি 'তারীখে দিমাশ্ক'-এর মতো বিশাল গ্রন্থের রচয়িতা, যা দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন থেকে আশি খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

তাজুদ্দীন সুবকী রহ. (৭২৭-৭৭১ হিজরী) বলেন–

إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي زَمَانِهِ، وَخِتَامُ الجَهَابِذَةِ الحُفَّاظِ، وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ مِنْهُ مَكَانَهُ.

তিনি ছিলেন স্বযুগের আহলে হাদীসের ইমাম এবং সর্বশেষ বিজ্ঞ হাফেযুল হাদীস। তাঁর ইলমের উচ্চতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।[২৮৯]

তিনিও মাযহাব মানতেন। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অনুসরণ করতেন।[২৯০]

২০. আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী হাম্বলী রহ. (৫৯৭ হিজরী)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনুদ দুবায়সী রহ. বলেন–

إِلَيْهِ انْتَهَتْ مَعْرِفَةُ الْحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَالْوُقُوْفُ عَلَى صَحِيْحِهِ مِنْ سَقِيْمِهِ.

হাদীস, উলূমে হাদীসের পারদর্শিতায় এবং হাদীসের স্তর নির্ণয় জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশীর্ষে।[২৯১]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

وَكَانَ بَحْرًا فِي التَّفْسِيْرِ، عَلَّامَةً فِي السِّيَرِ وَالتَّارِيْخِ، مَوْصُوْفًا بِحُسْنِ الحَدِيثِ وَمَعْرِفَةِ فُنُونِهِ.

তিনি ছিলেন তাফসীরের সাগর, সীরাত ও ইতিহাসের মিনার, হাদীসের সকল শাস্ত্রে বিজ্ঞ।[২৯২]

তিনি যে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করে আমল করতেন তা তো প্রসিদ্ধ।

২৮৯.আততবাকাতুল কুবরা ৭/২১৫; তারীখে দিমাশ্ক (মুকাদ্দিমা) ১/২৫
২৯০.দ্রষ্টব্য : সিয়ারু আলামিন নুবালা ২০/৫৫৪; তবাকাতুশ শাফিইয়া, সুবকী ৭/২১৫
২৯১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ২১/৩৭৩
২৯২.প্রাগুক্ত ২১/৩৬৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সালাফের যুগে ইমাম আবু হানীফার অনুসারী কিছুসংখ্যক বিশ্ববরেণ্য আহলে হাদীস মুহাদ্দিস ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এ দেশের মুসলিমগণ সাধারণত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ব্যাখ্যা ও মাযহাব অনুসারে কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান পালন করে থাকেন। তাই এই মাযহাবের অনুসারী কতিপয় আহলে হাদীস মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরা হলো, যাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ ও প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, বরিত ও সমাদৃত বিদ্বান।

১. শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. (৮২-১৬০ হিজরী)

আবু বিসতাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ ওয়াসেতী রহ. ছিলেন যুগের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিস। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. (৯৭-১৬১ হিজরী), যিনি ছিলেন আপন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুহাদ্দিসগণ যাকে হাদীস জগতের সম্রাট উপাধি দিয়েছেন, সেই মহান মুহাদ্দিস শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. সম্পর্কে বলেছেন–

شُعْبَةُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ.

শু'বা হলেন মুহাদ্দিসগণের সম্রাট।[২৯৩]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (১৬৪-২৪১ হিজরী) বলেন–

كَانَ شُعْبَةُ أُمَّةً وَحْدَهُ فِي هٰذَا الشَّأْنِ.

হাদীসশাস্ত্রে শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. ছিলেন একাই এক উম্মত।[২৯৪]

২৯৩.আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/১২৬; তারীখে বাগদাদ ১০/৩৫৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২০৮; তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩২৪

২৯৪.তারীখে বাগদাদ ১০/৩৫৩; তাহযীবুল আসমা, নববী ১/২৪৫

তিনি আরও বলেন–

وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ شُعْبَةَ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيْثِ، وَلاَ أَحْسَنُ حَدِيْثًا مِنْهُ.

হাদীসের জগতে শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ.-এর মতো কেউ ছিলেন না, তাঁর চেয়ে উত্তম হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।[২৯৫]

হাদীস ও আছারের সনদ নিয়ে সর্বপ্রথম যিনি ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ করেন, তিনি হলেন ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ.। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৭৪৮ হিজরী) বলেন–

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَرَّحَ وَعَدَّلَ.

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. সর্বপ্রথম রাবীদের জারহ ও তাদীল তথা বর্ণনাকারীদের স্তরনির্ণয় শুরু করেন।[২৯৬]

অর্থাৎ শু'বা রহ. হলেন ইলমুল জারহ ওয়াততাদীল তথা হাদীস বর্ণনারাকীদের স্তর পর্যালোচনা শাস্ত্রের আবিষ্কারকদের অন্যতম। ভাবা যায়, হাদীসশাস্ত্রে কত গভীর ও বিস্তৃত ইলমের অধিকারী ছিলেন তিনি!

এরপর হাফেয যাহাবী রহ. বলেন–

أَخَذَ عَنْهُ هَذَا الشَّأْنَ: يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانِ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَطَائِفَةٌ.

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকেই ইলমুল জারহ ওয়াততাদীল শাস্ত্রের বিদ্যা অর্জন করেছেন।[২৯৭]

অর্থাৎ শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. থেকেই ইলমুল হাদীসে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. ও আবদুর রহামান ইবনে মাহদী রহ., যারা ছিলেন স্বযুগের সারাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং ইলমুল হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। এবার একটু ভাবুন, যিনি হলেন যুগের শ্রেষ্ঠতম দুই মুহাদ্দিসের জনক, এই বিদ্যায় কোন্ উচ্চতায় অধিষ্ঠিত ছিল তাঁর মাকাম ও মর্যাদা!

২৯৫.আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/১২৮; তাহযীবুল আসমা, নববী ১/২৪৫
২৯৬.সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২০৬
২৯৭.প্রাগুক্ত

আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন যে, এই উস্তাযুল মুহাদ্দিসীনের ব্যাপারে ইতিহাসের বাস্তবতা হলো–

وَكَانَ شُعْبَةُ رَأْيُهُ رَأْيُ الْكُوفِيِّيْنَ.

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ.-এর মাযহাব ছিল কূফীদের (আবু হানীফার) মাযহাব।[২৯৮]

২. সুফিয়ান ছাওরী রহ. (৯৭-১৬১ হিজরী)

ইমাম সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাওরী রহ. ছিলেন স্বযুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বিখ্যাত ফকীহ ও বুযুর্গ। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন–

لا أَعْلَمُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَدًا أَعْلَم مِنْ سُفْيَانَ.

আমার জানামতে পৃথিবীতে সুফিয়ান ছাওরী থেকে বড় কোনো আলেম নেই।[২৯৯]

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আরও বলেন–

> كَتَبْتُ عَلَى أَلْفٍ ومِائَة شَيْخٍ، مَا كَتَبْتُ عَنْ أَفْضَلَ مِنْ سُفْيَانَ ابْنِ سَعِيد الثَّوْرِيِّ.
>
> আমি এগারো শ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লেখেছি, কিন্তু সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো মুহাদ্দিসের কাছ থেকে আমার হাদীস লেখা হয়নি।[৩০০]

আব্বাস দূরী রহ. বলেন–

> رَأَيتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ، لاَ يُقدِّمُ عَلَى سُفْيَانَ أَحَداً فِي زَمَانِهِ فِي الفِقْهِ، وَالحَدِيْثِ، وَالزُّهدِ، وَكُلِّ شَيْءٍ.

---

২৯৮. আল-কামেল, ইবনে আদী ৩/৪৪; মীযানুল ই'তিদাল, ১/৫৯৩; আল-ইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, পৃ. ১২৮

২৯৯. আল-কামেল ফিয্যুআফা, ইবনে আদী ১/১৫৬; তারীখে কাবীর, বুখারী ৪/৯২; তাহযীবুল কামাল ৪/৭৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৩৮

৩০০. আল-কামেল ফিয্যুআফা, ইবনে আদী ১/১৬৭; তারীখে বাগদাদ ১০/২১৯; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী ১/২২২; তাহযীবুল কামাল, মিয্যী ৪/৭০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৩৭

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-কে দেখেছি, ফিকহ হাদীস যুহদ কোনো ক্ষেত্রেই সুফিয়ান ছাওরীর যমানায় কাউকে তাঁর উপর প্রাধান্য দিতেন না।[৩০১]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

وَقَالَ شُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَغَيْرُهُم: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ.

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ., সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ., আবু আছেম রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. এবং আরও অনেক ইমাম বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী রহ. হলেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস তথা হাদীস-জগতের সম্রাট।[৩০২]

ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. বলেছেন–

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ مَهْدِيٍّ ذَكَرَ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، وَمَالِكاً، وَابْنَ المُبَارَكِ، فَقَالَ: أَعْلَمُهُم بِالعِلْمِ سُفْيَانُ.

ইমাম আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী রহ.-কে শুনেছি, সুফিয়ান ছাওরী রহ., শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ., ইমাম মালেক রহ. ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হলেন সুফিয়ান ছাওরী রহ.।[৩০৩]

এই সুফিয়ান ছাওরী সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ ও মত জানার চেষ্টা করতেন, সে অনুযায়ী আমল করতেন, ফতোয়া দিতেন এবং আবু হানীফার ফিকহের আলোকে তিনি রচনা করতেন।

---

৩০১. তারীখে ইবনে মাঈন, রেওয়ায়েত দূরী ৩/৯৬; তারীখে বাগদাদ ১০/২৩৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৩৭

৩০২. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৩৬

৩০৩. হিলইয়াতুল আওলিআ ৬/৩৬০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৩৯

অজানা কোনো কারণে তিনি সরাসরি আবু হানীফা রহ.-এর মজলিসে হাজির হতেন না। কিন্তু আবু হানীফা রহ. কূফার যে মসজিদে ফিকহের দরস দিতেন, সুফিয়ান ছাওরী রহ. সে মসজিদের এক কোণে একটা খুঁটির পেছনে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন এবং শুয়ে শুয়ে আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ ও মতামত সম্পর্কে অবগত হতেন।

আবদুল হামীদ হিম্মানী রহ. বলেন–

بَلَغَ أَبَا حَنِيْفَةَ أَنَّ سُفْيَانَ يَتَدَثَّرُ بِثَوْبِهِ، وَيَنَامُ خَلْفَ أُسْطَوَانَتِهِ، فَيَسْمَعُ مَسَائِلَهُ، فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: إِذَا جَاءَ فَآذِنُوْنِيْ، فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ جَاءَ سُفْيَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ أَبُوْ هَذَا الْمُسَجَّى.

সুফিয়ান ছাওরী রহ. চাদর মুড়ি দিয়ে মসজিদের একটি স্তম্ভের পিছনে শুয়ে থেকে আবু হানীফা রহ. যেসব মাসআলা বলেন তা শুনতে থাকতেন। আবু হানীফা রহ. একসময় বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি বললেন, আবার যখন সুফিয়ান ছাওরী আসবে, তোমরা আমাকে জানাবে। তারপর এক মজলিসে আবু হানীফা রহ.-কে বলা হলো, সুফিয়ান ছাওরী এসেছেন। তখন আবু হানীফা রহ. সুফিয়ানের দিকে ইশারা করে 'এই বস্ত্রাবৃত লোকটির পিতা সাঈদ ইবনে মাসরূক আমাকে বর্ণনা করেছেন' বলে সুফিয়ান ছাওরীর পিতার সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

আবদুল হামীদ হিম্মানী রহ. বলেন–

فَلَمْ يَرْجِعْ سُفْيَان بَعْدَ ذٰلِكَ.

এরপর (আবু হানীফা রহ. থেকে মাসআলা-মাসাইল শোনার জন্য) সুফিয়ান ছাওরী রহ. আর আসেননি।[৩০৪]

৩০৪.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ৭৩

في إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، تكلم فيه علي بن المديني وغيره، ورماه الإمام أحمد بن حنبل. ووثقه يحيى بن معين جدا، وقال في رواية الدوري عنه: صدوق مشهور ما بالكوفة مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلا من حسد.=

এবার যেহেতু সরাসরি আবু হানীফা রহ. থেকে শোনার পথ বন্ধ হয়ে গেল, তাই আবু হানীফা রহ.-এর শিষ্য-শাগরেদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবাদি সংগ্রহ করে তিনি কপি তৈরি করে নিতেন। আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী ছয়মারী রহ. (৪৩৬ হিজরী) মুহাদ্দিস আলী ইবনে মুসহির রহ.-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন–

> وَهُوَ الَّذِيْ أَخَذَ عَنْهُ سُفْيَانَ عِلْمَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَنَسَخَ مِنْهُ كُتُبَهُ، وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.
>
> আলী ইবনে মুসহিরের মাধ্যমেই সুফিয়ান ছাওরী রহ. ইমাম আবু হানীফার ইলম হাছিল করেছেন; তাঁর মাধ্যমে আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবাদি নিয়ে সেগুলোর নুসখা (কপি) তৈরি করে নিয়েছেন। আবু হানীফা রহ. আলী ইবনে মুসহিরকে সুফিয়ান ছাওরীর নিকট তাঁর কিতাবসমূহ পৌঁছাতে বারণ করতেন।[৩০৫]

বলখের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. বলেন–

> كَانَ سُفْيَانَ يَأْخُذُ الْفِقْهَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَأَنَّهُ اسْتَعَانَ بِهِ وَبِمُذَاكَرَتِهِ عَلَى كِتَابِهِ الَّذِيْ سَمَّاهُ «الْجَامِعَ».
>
> সুফিয়ান ছাওরী রহ. আলী ইবনে মুসহিরের সূত্রে আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ হাছিল করতেন। তিনি 'আলজামে' নামে যে হাদীসগ্রন্থ লিখেছেন, তাতে আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ এবং আবু হানীফা রহ.-এর সাথে কৃত আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে সাহায্য নিয়েছেন।[৩০৬]

= وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى الحماني، فقال: هو ثقة، هو أكبر من هؤلاء كلهم، فاكتب عنه. وفي رواية قال: سألت ابن نمير عن يحيى الحماني وهاهنا علي بن حكيم، ومنجاب وأصحابنا متوافرون، فقال: هو أكبر من هؤلاء كلهم. وقال ابن عدي: ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير فأذكرها وأرجو أنه لا بأس به.

৩০৫.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১৫৮

৩০৬.মুকাদ্দিমাতু কিতাবিত তালীম, মাসউদ ইবনে শায়বা, পৃ. ১৩৩; ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, আবদুর রশীদ নুমানী, পৃ. ১৮৪-১৮৫

'আলজামে' গ্রন্থটি যেহেতু আবু হানীফার ফিকহের আলোকে রচনা করেছেন, তাই এর মাসআলাগুলো হানাফী মাযহাবের সাথে মিল রাখে। এ জন্য আবু হানীফার শিষ্য ইমাম যুফার ইবনে হুযায়ল রহ. গ্রন্থটি দেখে মন্তব্য করেছেন–

هذا كلامنا ينسب إلى غيرنا.

অর্থাৎ কিতাবটিতে উল্লিখিত বক্তব্য ও ফিকহ তো হলো আবু হানীফা রহ.-এর কথা, কিন্তু এর সম্বন্ধ করা হচ্ছে সুফিয়ান ছাওরীর দিকে।[৩০৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর শিষ্য মাওয়াযী রহ. আহমাদ রহ. -এর কাছে জানতে চান, কুতবা ইবনে আলা ইবনে মিনহাল কেমন ব্যক্তি?

উত্তরে আহমাদ রহ. বলেছেন–

كَانَ جَلِيسَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ جَالَسَ أَبَا حَنِيفَةَ، وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ يُخْبِرُ سُفْيَان بِقَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ.

وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا عَرَفَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ بِهِ.

ثُمَّ قَالَ: قُطْبَةُ مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ.

কুতবা ইবনে আলা ছিলেন সুফিয়ান ছাওরীর শিষ্য। তাঁরা (আবু হানীফার শিষ্য ও অনুসারীগণ) বলেন, তিনি আবু হানীফারও শাগরেদ ছিলেন এবং তিনিই সুফিয়ান ছাওরীকে আবু হানীফা রহ.-এর মত ও রায় সম্পর্কে অবগত করতেন।

তাঁদের বক্তব্য হলো, কুতবা ইবনে আলার মাধ্যমেই সুফিয়ান ছাওরী আবু হানীফার মাযহাব সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

এরপর আহমাদ রহ. বলেন, কুতবা ইবনে আলা হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী।[৩০৮]

৩০৭.মানাকিবু আবী হানীফা, কারদারী, পৃ, ৪৫৮; যায়লুল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা, মোল্লা আলী কারী ২/৫৩৫

৩০৮.আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/৪১৩

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উস্তায ইমাম ইউসুফ ইবনে খালেদ সামতী রহ.[৩০৯] বলেন–

إِنَّ كُتُبَ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَت تُعْرَضُ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَيَقُولُ: هَذَا قَوْلِيْ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ «كِتَابُ الرَّهْنِ»، وَفِيه الْمَسَائِل الدقاق، فَقَالَ: هَذَا قَوْلِيْ.

আবু হানীফার কিতাবাদি সুফিয়ান ছাওরীর কাছে পেশ করা হতো, তিনি শুনে বলতেন, এটা আমারও মত। একবার তাঁর সামনে আবু হানীফার 'কিতাবুর রাহ্ন' পেশ করা হলো, যাতে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল বিধি-বিধান আছে। শুনেই তিনি বলে দিয়েছেন, এসব আমারও মত।[৩১০]

মোটকথা, সুফিয়ান ছাওরী রহ. আবু হানীফার সামনে বসে তাঁর মাযহাব ও ফিকহ গ্রহণ করেননি; কিন্তু বিভিন্নভাবে আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ ও মাযহাব সংগ্রহ করেছেন এবং সে অনুসারে আমল করেছেন; বরং তার মত ও রায় অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন এবং কখনো নিজের রায় বর্জন করে আবু হানীফা রহ.-এর রায় গ্রহণ করতেন।[৩১১]

তাই ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন–

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَكْثَرُ مُتَابَعَةً لأَبِي حَنِيفَةَ مِنِّي.

---

৩০৯. وهو من أجلة الأئمة، وإنما كانوا يتقون حديثه من أجل دخوله في علم الكلام. قال ابن سعد في الطبقات: وكان الناس يتقون حديثه لرأيه. وقال علي بن المديني كما في ذم الكلام للهروي: يوسف بن خالد سقط حديثه من أجل الكلام، وكل من كان صاحب كلام فليس بشيء. وقال البزار في مسنده: يوسف بن خالد كان رجلاً قد كتب الحديث رحل فيه إلى الكوفة فكتب عن الأعمش، وَكان أول من وضع الكتب المبسوطة في الوثائق، وَلكن دخل في الكلام فجاوز حد أهل العلم فضعف حديثه من أجل ذلك.

৩১০. যায়লুল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা, মোল্লা আলী কারী ২/২২৭

৩১১. দ্রষ্টব্য : আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিছ ছালাছাতিল আইম্মাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৯৭-১৯৮, ২৬৯

সুফিয়ান ছাওরী আবু হানীফাকে আমার চেয়ে বেশি অনুসরণ করতেন।[৩১২]

সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন–

إِنَّهُ كَانَ يُفْتِيْ بِقَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

সুফিয়ান ছাওরী রহ. আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[৩১৩]

৩. মিসআর ইবনে কিদাম রহ. (১৫৫ হিজরী)

মিসআন ইবনে কিদাম রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমসাময়িক ইমাম। হাদীস বর্ণনার বিশুদ্ধতায় সে যুগে তাঁর কোনো তুলনা ছিলো না; এমনকি যুগসেরা মুহাদ্দিস সুফিয়ান ছাওরীর চেয়েও তিনি অধিক নিখুঁত বর্ণনাকারী। ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. বলেন–

كُنَّا نُسَمِّي مِسْعَراً: الْمُصْحَفَ -يَعْنِي مِنْ إِتْقَانِهِ-.

দৃঢ় ও নিপুণ বর্ণনার কারণে মিসআর ইবনে কিদামকে আমরা 'কুরআন' নামে পরিচয় দিতাম।[৩১৪]

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. বলেন, কতক মুহাদ্দিস আমাশ রহ.-কে বললেন–

إِنَّ مِسْعَراً يَشُكُّ فِي حَدِيْثِهِ.

মিসআর তো হাদীস বর্ণনায় দ্বিধা প্রকাশ করেন।

তখন আমাশ রহ. বলেছেন–

شَكُّهُ كَيَقِيْنِ غَيْرِهِ.

মিসআরের দ্বিধা-সংশয় করে বর্ণনা করা আর অন্য মুহাদ্দিসের নিশ্চয়তার সাথে বর্ণনা করা সমান।[৩১৫]

---

৩১২. আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৯৮; মাগানিল আখইয়ার, আইনী ১/৪১৭

৩১৩. মাগানিল আখইয়ার ১/৪১৭

৩১৪. আলজারহু ওয়াততাদীল ১/১৫৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/১৬৬; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/২১২

৩১৫. সিয়ারু আমামিন নুবালা ৭/১৬৫; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/২১২

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ أَثْبَتَ مِنْ مِسْعَرٍ.

মিসআর ইবনে কিদামের চেয়ে অধিক নিখুঁত বর্ণনাকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।[৩১৬]

ইবনে আবু হাতেম রহ. বলেন, আমি আমার পিতা আবু হাতেম রাযীকে প্রশ্ন করলাম–

إِذَا اخْتَلَفَ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ؟

কোনো হাদীসের বর্ণনায় যদি সুফিয়ান ছাওরী ও মিসআরের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়, তখন কাকে প্রাধান্য দেব?

তিনি উত্তর দিয়েছেন–

يُحْكَمُ لِمَسْعَرٍ، فَإِنَّهُ قِيلَ: مِسْعَرٌ مُصْحَفٌ.

মিসআরের বর্ণনা অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। কেননা, বলা হয়েছে, মিসআর হলো (হাদীসের ক্ষেত্রে) কুরআন।[৩১৭]

পুস্তিকাটির শুরুতে এও উদ্ধৃত হয়েছে যে, সুফিয়ান ছাওরী রহ. ও শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. ছিলেন স্বযুগের সেরা মুহাদ্দিস, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। তাঁদের ইলম মাপার নিক্তি ও তুলাদণ্ড হলেন মিসআন ইবনে কিদাম রহ.। তাঁদের মধ্যে কোনো হাদীসের বিষয়ে মতবিরোধ হলে তাঁরা মিসআর ইবনে কিদামের শরণাপন্ন হতেন। ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জাওহারী রহ. বলেন–

كَانَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ إِذَا اخْتَلَفَا قَالَا: اذْهَبَا بِنَا إِلَى الْمِيزَانِ مِسْعَرٍ.

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ ও সুফিয়ান ছাওরীর মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে তাঁরা বলতেন, চলুন, বিষয়টির সমাধানের জন্য আমাদের দাঁড়িপাল্লা মিসআরের কাছে যাই।[৩১৮]

---

৩১৬. তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/২১২

৩১৭. আল-জারহু ওয়াততাদীল ৮/৩৬৯

৩১৮. আল-মুহাদ্দিসুল ফাছেল, পৃ. ৩৯৫; তাহযীবুল আসমা ওয়াছ ছিফাত, নববী ২/৮৯; শারহু ইলালুত তিরমিযী ১/৪৪৭; তাহযীবুল কামাল ৮/৪২২; তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮

আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব সম্পর্কে এই বরেণ্য মুহাদ্দিসের মন্তব্য পড়ে এসেছেন যে–

> مَنْ جَعَلَ أَبَا حَنِيفَةَ إِمَامًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، رَجَوْتُ أَنْ لَا يَخَافَ، وَلَا يَكُوْنُ فَرَّطَ فِي الِاحْتِيَاطِ لِنَفْسِهِ.
>
> যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার মধ্যে আবু হানীফাকে ইমাম বানাবে, আশা করি তার কোনো ভয় নেই এবং সে (দ্বীনের বিধি-বিধান পালন করার ক্ষেত্রে) সতর্কতা অবলম্বনে কোনো ত্রুটি করেনি।[৩১৯]

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন–

> كَانَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ الإِمَامُ الْكَبِيرُ يَقُولُ: جَعَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
>
> মহান ইমাম মিসআর ইবনে কিদাম রহ. বলতেন, আমি আবু হানীফা রহ.-কে আমার এবং আল্লাহর মধ্যে দলীলরূপে গ্রহণ করেছি।[৩২০]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেম ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী রহ. বলেন, মিসআর ইবনে কিদাম রহ.-কে বলা হলো–

> لِمَ تَرَكْتَ رَأْيَ أَصْحَابِكَ، وَأَخَذْتَ بِرَأْيِهِ؟
>
> আপনি অন্যান্য ইমামের মাযহাব বাদ দিয়ে আবু হানীফার মাযহাব কেন গ্রহণ করেছেন?

মিসআর রহ. বলেছেন–

> لِصِحَّتِهِ، فَأْتُوا بِأَصَحَّ مِنْهُ لِأَرْغَبَ عَنْهُ إِلَيْهِ.
>
> কারণ হলো তাঁর মাযহাব সঠিক। তোমরা এর চেয়ে বিশুদ্ধ মাযহাব উপস্থিত কর। তাহলে আমি তা বর্জন করে সে মাযহাব গ্রহণ করব।[৩২১]

---

৩১৯. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআসহাবিহি, ছয়মারী, পৃ. ৯; তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৯; আল-আনসাব, সামআনী ৬/৬৫; তাবঈযুছ ছহীফা, সুয়ূতী, পৃ. ১১৬

৩২০. যায়লুল জাওয়াহিরিল মুযিয়্যা ২/৫৬৩

৩২১. আল-খায়রাতুল হিসান, ইবনে হাজার হায়তামী, পৃ. ৩৫

৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. (১১৮-১৮১ হিজরী)

মানুষ যত জ্ঞানী, গুণী ও প্রতিভাধরই হোক, কারও না কারও সমালোচনার পাত্র হন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. জ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে অনন্য সাধারণ সাধুতা, সততা, চরিত্র, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, নির্ভীকতা ও চিন্তার ভারসাম্যতা ইত্যাদি উত্তম গুণে নিজেকে এমনভাবে সজ্জিত করেছিলেন যে, তিনি হয়েছিলেন সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজন বরিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যাপারে কারও কোনো বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় না। ইলম ও আমলে এমন উচ্চতায় উপনীত হয়েছিলেন যে, ইমাম ইবনে উয়ায়না রহ. (১০৭-১৯৮ হিজরী) বলেছেন–

نَظَرْتُ فِي أَمْرِ الصَّحَابَةِ وَأَمْرِ عَبْدِ اللهِ، فَمَا رَأَيْتُ لَهُمْ عَلَيْهِ فَضْلًا، إِلَّا بِصُحْبَتِهِمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَزْوِهِمْ مَعَهُ.

আমি সাহাবা কেরামের জীবনচরিত অধ্যয়ন করেছি। দেখেছি, তাঁরা নবীজীর স্বর্ণসান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন এবং নবীজীর সাথে জিহাদ করেছেন, আর ইবনুল মুবারক রহ.-এর সে সৌভাগ্য হয়নি। এ ছাড়া তাঁর ও সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।[৩২২]

ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন–

وَهُوَ أَكْثَرُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْمًا فِيمَا نَعْرِفُ.

আমাদের জানামতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হলেন স্বযুগে কুরআন ও সুন্নাহর সবচেয়ে বড় আলেম।[৩২৩]

হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী রহ. (৩২১-৪০৫ হিজরী) বলেন–

هُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ فِي الْآفَاقِ.

ইবনুল মুবারক রহ. ছিলেন সমকালে সারা দুনিয়ার ইমাম।[৩২৪]

---

৩২২. তারীখে বাগদাদ ১১/৪০০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৩৯০; তাহযীবুত তাহযীব ৪/১৪৩

৩২৩. রাফউল ইয়াদাইন, পৃ. ৯৮ (৮৭)

৩২৪. তাহযীবুত তাহযীব ৪/১৪৪

ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. ছিলেন সমকালীন সমগ্র বিশ্বের অন্যতম মুহাদ্দিস। তিনি বলেছেন–

كُلُّ حَدِيْثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَإِنَّنَا لَا نَعْرِفُهُ

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. যে হাদীস জানেন না, তা আমরাও জানি না।[৩২৫]

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো, নবীজীর প্রায় সমস্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর জানা ছিল। এমন কোনো হাদীস বিরল, যা আমরা জানি আর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. জানেন না।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস রহ. বলেন–

كُلُّ حَدِيْثٍ لَا يَعْرِفُهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ.

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. যে হাদীস চিনেন না, আমরা তা থেকে মুক্ত।[৩২৬]

অর্থাৎ দুনিয়াতে যত সহীহ হাদীস আছে, সব আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর জানা ছিল। কেউ যদি এমন কোনো হাদীস পেশ করে যা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. চিনেন না, তাহলে বুঝতে হবে, এটি নবীজীর হাদীস নয়, কারও বানোয়াট কথা।

আপনি জেনে অভিভূত হবেন, উম্মাহর গৌরব এই মহান মনীষী আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। ইলমুল ফিকহসহ একাধিক শাস্ত্রের ইমাম সুলতান ঈসা ইবনে আবু বকর আইয়ুবী রহ. (৫৭৬-৬২৪ হিজরী) লেখেন–

إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللهُ.

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অবিচল ছিলেন।[৩২৭]

---

৩২৫. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, ছয়মারী, পৃ. ১৪০

৩২৬. তারীখে দিমাশক ৩২/৪২১; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/৮৮২; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৪০৩

৩২৭. আসসাহমুল মুছীব ফিররাদ্দি আলাল খতীব, পৃ. ৯৫, ৯৯, ১১৩

গাইরে মুকাল্লিদ আলেম ছিদ্দীক হাসান খান রহ. (১৩০৭ হিজরী)ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-কে হানাফী ইমামগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন–

مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ:

اَلْإِمَامُ الْقَاضِيْ: أَبُوْ يُوْسُفَ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ.

وَالْإِمَامُ: مُحَمَّدٌ، وَقَد بَلَغَ رُتْبَةَ الْاِجْتِهَادِ أَيْضًا.

وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْمُحَدِّثُ الْمَرْوَزِيُّ.

وَالْإِمَامُ: دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرِ الطَّائِيُّ الْكُوْفِيُّ.

وَوَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا.

হানাফী ইমামগণের মধ্য থেকে অন্যতম হলেন–

ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহ.। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ।

ইমাম মুহাম্মহ রহ.। তিনিও মুজতাহিদের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন।

মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মারওয়াযী রহ.।

ইমাম দাউদ ইবনে নুছায়র তাঈ কূফী রহ.।

ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ.।

ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ.।[৩২৮]

ইবনুল মুবারক রহ. আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী শুধু আমলই করতেন না, বরং আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দিতেন এবং আবু হানীফা রহ.-এর উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর খণ্ডন করতেন।[৩২৯]

---

৩২৮. আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৩৯

৩২৯. দেখুন— ফাযায়েলে আবু হানীফা, ইবনে আবিল আউওয়াম, ইবনুল মুবারক রহ. -এর জীবনী অংশ, পৃ. ২৬৪-২৯০; তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৮; মানাকিবে আবু হানীফা, কারদারী পৃ. ৪৫-৪৬; আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/৩২৪-৩২৬ (৭২০); আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ১২৪-১২৫; আল-মাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ২০৩

৫. আবু ইউসুফ রহ. (১১৩-১৮২ হিজরী)

কাযিল কুযাত আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম রহ. হলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.সহ ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.-এর অন্যান্য বিখ্যাত উস্তাযগণের উস্তায। ছিলেন প্রখর ধীশক্তির অধিকারী। স্মৃতিশক্তির উপমা হিসাবে তার নাম উল্লেখ করা হতো। ইমাম ইবনে সা'দ রহ. বলেন–

> وَكَانَ يُعْرَفُ بِالْحِفْظِ لِلْحَدِيْثِ، وَكَانَ يَحْضُرُ الْمُحَدِّثَ فَيَحْفِظُ خَمْسِيْنَ وَسِتِّيْنَ حَدِيْثًا، فَيَقُومُ، فَيُمْلِيهَا عَلَى النَّاسِ.
>
> হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। উস্তাযের যবান থেকে ৫০/৬০টি হাদীস শুনে দাঁড়াতেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের তা মুখস্থ লেখাতেন।

হাসান ইবনে আবু মালেক রহ. ও আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ রহ. বলেন, আমরা মুহাদ্দিস আবু মুআবিয়ার নিকট হাদীস শিখতে যেতাম। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কি আবু ইউসুফ নেই?

বললাম, জি, আছেন।

তিনি বললেন, তোমরা আবু ইউসুফকে ছেড়ে আমার থেকে হাদীস লেখতে আস! অথচ আমরা যখন হাজ্জজ থেকে হাদীস শুনতে যেতাম, তিনি হাদীস শোনাতে থাকতেন আর আবু ইউসুফ মুখস্থ করতে থাকতেন। এরপর আমরা হাজ্জাজের নিকট থেকে বের হলে আবু ইউসুফের স্মৃতি থেকে আমরা সেই হাদীসগুলো লিখে নিতাম।

> فَكَانَ أَبُوْ يُوْسُفَ يَحْفَظُ، ـوَالحَجَّاجُ يُمْلِيْ عَلَيْنَاـ، فَإِذَا خَرَجْنَا كَتَبْنَا مِنْ حِفْظِ أَبِيْ يُوْسُفَ.[৩৩০]

হানাস ইবনে যিয়াদ রহ. বলেন, আবু ইউসফ রহ.-এর সাথে হজ্জে রওয়ানা হয়েছি। রাস্তায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা 'বিরে মায়মুন'-এ

৩৩০.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১০১; হুসনুত তাকাযী ফী সীরাতিল ইমামি আবী ইউসুফ আলকাযী, পৃ. ৩৩

যাত্রাবিরতি করি। তাকে দেখার জন্য সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. আসেন এবং বলেন–

> خُذُوْا حَدِيْثَ أَبِيْ مُحَمَّدٍ، فَرَوٰى لَنَا أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا، فَلَمَّا قَامَ سُفْيَانُ، قَالَ لَنَا أَبُوْ يُوْسُفَ: خُذُوْا مَا رَوٰى لَكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْنَا الْأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا حِفْظًا، عَلٰى سِنِّهِ وَضَعْفِهِ وَعِلَّتِهِ وَشُغْلِهِ بِسَفَرِهِ.
>
> আমার থেকে তোমরা আমর ইবনে দীনারের হাদীস শোন। এ কথা বলে তিনি চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান চলে যাওয়ার পর আবু ইউসুফ রহ. বললেন, সুফিয়ান তোমাদের যা বর্ণনা করেছেন, আমার থেকে শুনে নাও। এরপর তিনি চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। অথচ তিনি তখন বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ, সফরের কারণে ক্লান্ত।[৩৩১]

ইমাম আলী ইবনে জা'দ রহ. হাদীসের অনেক বড় ইমাম। 'আলমুসনাদ' নামে মুদ্রিত একটি হাদীসগন্থের লেখক। ইবনে আবু ইমরান রহ. বলেন, আলী ইবনে জা'দ আমাদের হাদীস লেখানো শুরু করেছেন। হাদীসের ছাত্রদের দ্বারা তাঁর মজলিস ছিল ভরপুর। তিনি বললেন, 'আবু ইউসুফ আমাদের বর্ণনা করেছেন'। তখন একছাত্র বলল, আপনি আবু ইউসুফ থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন!

হয়তো আলী ইবনে জা'দ রহ. বুঝেছেন, এই লোক আবু ইউসুফ রহ. সম্পর্কে অনুচিত ধারণা রাখে। তাই ছাত্রটাকে বললেন–

> إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ أَبَا يُوْسُفَ، فَاغْسِلْ فَمَكَ بِأُشْنَانٍ وَمَاءٍ حَارٍّ.
>
> তুমি যখন আবু ইউসুফ রহ.-এর নাম উচ্চারণ করার ইচ্ছে করবে, তখন সাবান ও গরম পানি দিয়ে তোমার মুখ আগে ধুয়ে নেবে।

---

৩৩১. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১০০-১০১; হুসনুন তাকাযী ফী সীরাতিল ইমামি আবী ইউসুফ আলকাযী, পৃ. ৩৩

এরপর আলী ইবনে জা'দ বলেন–

وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ. وَقَدْ رَأَى الثَّوْرِيَّ، وَالْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، وَمَالِكًا، وَابْنَ أَبِيْ ذِئْبٍ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَشُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ.

আল্লাহ কসম! আমি আবু ইউসুফ রহ.-এর মতো কোনো মুহাদ্দিস দেখিনি।

(ইবনে আবী ইমরান বলেন–) অথচ, তিনি সুফিয়ান ছাওরী রহ., হাসান ইবনে ছালেহ রহ., ইমাম মালেক রহ., লায়ছ ইবনে সা'দ রহ. ও শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ.-এর মতো যুগসেরা মুহাদ্দিসদের দেখেছেন![৩৩২]

আবু ইউসুফ রহ. বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন, এ তো সবাই জানেন। ফিকহ নিয়ে অধিক ব্যস্ততার কারণে এ বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি শুধু ফিকহ নয়; আরও অনেক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইমাম হেলাল ইবনে ইয়াহইয়া রহ. বলেন–

أَبُوْ يُوْسُفَ يَحْفَظُ التَّفْسِيْرَ وَالْمَغَازِيَ وَأَيَّامَ الْعَرَبِ، وَكَانَ أَقَلَّ عُلُوْمِهِ الْفِقْهُ.

আবু ইউসুফ রহ. তাসফীর, মাগাযী ও আরব-ইতিহাসেরও হাফেয ছিলেন। তাঁর মধ্যে সমচেয়ে কম ছিল ফিকহের জ্ঞান।[৩৩৩]

ওযীর ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ রহ. বলেন–

قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ، وَأَقَلُّ مَا فِيهِ الْفِقْهُ، وَقَدْ مَلأَ بِفِقْهِهِ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ

আবু ইউসুফ আমাদের নিকট আগমণ করেছেন। তাঁর মধ্যে যেসব বিদ্যার সমাহার ঘটেছিল, এর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল ফিকহ। অথচ এই ফিকহের মাধ্যমেই সারা দুনিয়া ভরে দিয়েছেন।[৩৩৪]

৩৩২.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১০২

৩৩৩.আখবারু আবী হানীফা ওয়া-আছহাবিহি, পৃ. ৯৯

৩৩৪.ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়াআখবারুহু ওয়ামানাকিবুহু, ইবনে আবুল আউওয়াম, পৃ. ৩০২; মানাকিবু আবী হানীফা ওয়াছাহিবাইহি, যাহাবী, পৃ. ৬৩

ইমাম আবু সা'দ সামআনী রহ. (৫০৬-৫৬২ হিজরী) লেখেন–

لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِيْ زَمَانِهِ، وَكَانَ النِّهَايَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْحُكْمِ وَالرِّئَاسَةِ وَالْقَدْرِ.

অর্থাৎ সে যুগে তাঁর থেকে কুরআন-হাদীসের বড় কোনো আলেম ছিলেন না। ইলম-বিদ্যা, বিচারকার্য এবং (ইলমী) নেতৃত্ব ও সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩৩৫]

ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

بَلَغَ أَبُوْ يُوْسُفَ مِنْ رِئَاسَةِ الْعِلْمِ مَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ আবু ইউসুফ রহ. কুরআন-হাদীসের ইলমী নেতৃত্বে এত উর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন যে, এর উপরে আর কোনো স্তর নেই।[৩৩৬]

এটা তো সকলেরই জানা যে, এই মহামনীষী ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রধান শিষ্য এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারী।

৬. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা রহ. (১৮৩ হিজরী)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা রহ. হলেন– আলী ইবনুল মাদীনী রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., আবু বকর ইবনে আবু শায়বা রহ. প্রমুখ বড় বড় হাদীসবিশারদ মুহাদ্দিসের উস্তায। ছিলেন স্বযুগের প্রথিতযশা ইমাম। অন্যতম যুগসেরা মুহাদ্দিস। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন–

اِنْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ زَمَانِهِ، وَإِلَى الشَّعْبِيِّ فِي زَمَانِهِ، وَإِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي زَمَانِهِ، وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ فِي زَمَانِهِ.

(কুরআন ও হাদীসের) ইলম পুঞ্জীভূত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট, আমের ইবনে শারাহীল শাবী রহ.-এর যুগে

৩৩৫.আল-আনসাব ৪/৪১৩; আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন ২০/৪৯৭৯

৩৩৬.সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/৪৭১

আমের ইবনে শারাহীল শাবী রহ.-এর নিকট, সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর যুগে সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর নিকট এবং **ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদা রহ.-এর যুগে ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ.-এর নিকট।**[৩৩৭]

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. আরও বলেন, আমি গবেষণা করে দেখেছি, হাদীসের ইলমের ভিত্তি হলো ছয়জনের উপর।[৩৩৮] ...

এরপর এই ছয়জনের ইলম সঞ্চিত হয়েছে বারোজন মুহাদ্দিসের নিকট।[৩৩৯] ...

পরের যুগে এই বারোজন আলেমের ইলম পুঞ্জীভূত হয়েছে ছয়জন ইমামের নিকট।

এখানে ইবনুল মাদীনী রহ. যে ছয়জন ইমামের নাম পেশ করেছেন তাঁদের দ্বিতীয়জন হলেন ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা রহ.।[৩৪০]

৩৩৭.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১৩৪, ১৫৬; তারীখে বাগদাদ ১৬/১৭২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ৮/৩৩৯; আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/৫৪১; মানাকিবু আবী হানীফা, কারদারী, পৃ. ৪৮৫

৩৩৮.তাঁরা হলেন, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী রহ., আবু মুহাম্মাদ আমর ইবনে দীনার রহ., আবু নছর ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর রহ., কাতাদা ইবনে দিআমা রহ., আবু ইসহাক আমর ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ও সুলায়মান ইবনে মিহরান আমাশ রহ.।

৩৩৯.তাঁরা হলেন, মালেক ইবনে আনাস রহ., মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ., আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরায়জ রহ., সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না রহ., সাঈদ ইবনে আবী আরুবা রহ., হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ., আবু আওয়ানা ওয়ায্যাহ রহ., শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ., মা'মার ইবনে রাশেদ রহ., সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাওরী রহ., আবদুর রহমান ইবনে আমর আওযাঈ রহ. ও হুশাইম ইবনে বাশীর রহ.।

৩৪০.আল-ইলাল, ইবনুল মাদীনী, পৃ. ৭৬-৯০; শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দা, পৃ. ৩৩-৩৯; আল-মুহাদ্দিসুল ফাছিল, রামাহুরমুযী, পৃ. ২৯৩-২৯৫

ছালেহ ইবনে সুহাইল রহ. বলেন–

كَانَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا ابْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ أَحْفَظَ أَهْلِ زَمَانِهِ لِلْحَدِيْثِ، وَأَفْقَهَهُمْ، مَعَ مُجَالَسَةٍ كَثِيْرَةٍ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، وَدِيْنٍ وَوَرَعٍ.

ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা রহ. ছিলেন স্বযুগের সবচেয়ে বড় হাফেযুল হাদীস এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ। দীর্ঘ সময় আবু হানীফা ও ইবনে আবী লায়লার সোহবত উঠিয়েছেন। দ্বীনদারি ও তাকওয়াতে ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[৩৪১]

কালের গর্ব এই আহলে হাদীস ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ. -এর বিশেষ শিষ্যদের অন্যতম এবং হানাফী মাযহাবের প্রথম শ্রেণির ইমাম।

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

وَتَفَقَّهَ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلَزِمَهُ مُدَّةً حَتّٰى بَرَعَ فِي الرَّأْيِ، وَصَارَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِهِ

তিনি আবু হানীফা রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে ফকীহ হয়েছেন। দীর্ঘদিন আবু হানীফা রহ.-এর সোহবতে থেকেছেন। এভাবে কিয়াস ও ফিকহে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এবং আবু হানীফা রহ-এর শীর্ষস্থানীয় শাগরেদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।[৩৪২]

আসাদ ইবনে ফুরাত রহ. বলেন–

كَانَ أَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الّذِينَ دَوَّنُوا الْكُتُبَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَكَانَ فى الْعَشْرَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَبُو يُوسُف، وَزُفَرُ وَدَاوُدُ الطَّائِيُّ وَأَسَدُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُوْسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِي وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ابْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ

আবু হানীফা রহ.-এর যে শিষ্যগণ কিতাবাদি সংকলন করেছেন তারা ছিলেন চল্লিশজন। এদের মধ্যে প্রথম দশজনের মধ্যে ছিলেন আবু ইউসুফ রহ., যুফার রহ.,

৩৪১.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১৫৬
৩৪২.তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/১০০০

দাউদ আততায়ী রহ., আসাদ ইবনে আমর রহ., ইউসুফ ইবনে খালেদ সামতী রহ. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে যায়েদা রহ.।[৩৪৩]

পূর্বে গাইরে মুকাল্লিদ আলেম ছিদ্দীক হাসান খান রহ.-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে তিনি ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে যায়েদা রহ.-কে হানাফী ইমামগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন–

مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ:

اَلْإِمَامُ الْقَاضِيْ: أَبُوْ يُوْسُفَ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ.

وَالْإِمَامُ: مُحَمَّدٌ، وَقَد بَلَغَ رُتْبَةَ الْاِجْتِهَادِ أَيْضًا.

وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْمُحَدِّثُ الْمَرْوَزِيُّ.

وَالْإِمَامُ: دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرِ الطَّائِيُّ الْكُوْفِيُّ.

وَوَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا.

হানাফী ইমামগণের মধ্য থেকে অন্যতম হলেন–

- ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহ.। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ।
- ইমাম মুহাম্মহ রহ.। তিনিও মুজতাহিদের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন।
- মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মারওয়াযী রহ.।
- ইমাম দাউদ ইবনে নুছায়র তাঈ কূফী রহ.।
- ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ.।
- ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ.।[৩৪৪]

৩৪৩.দ্রষ্টব্য : আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/২১১-২১২ (৬৬৫)
৩৪৪.আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৩৯

৭. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. (১৩২-১৮৯ হিজরী)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. মুজতাহিদ ইমাম। ইমাম আবু হানীফা রহ. ও আবু ইউসুফ রহ.-এর শিষ্য। হানাফী মাযহাবের প্রথম সারির ইমাম। প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমামুল জার্হ ওয়াততাদীল ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর উস্তায। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস। তাঁর মজলিসে ছিল হাদীসের ছাত্রদের বিপুল সমাগম। আসাদ ইবনে ফুরাত রহ. (১৪৪-২১৩ হিজরী) বলেন–

> وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ مَالِكٍ بَعْدَ ذٰلِكَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَانْسَدَّتْ إِلَيْهِ الطُّرُقُ.
>
> ইমাম মালেক রহ.-এর ওফাতের পর তিনি যখন ইরাকে মুয়াত্তা মালেকের দরস দিতেন, তখন তাঁর কাছে মুহাদ্দিসগণের ভিড় জমে যেত এবং তাঁদের এত সমাগম হতো যে, রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে যেত।[৩৪৫]

ইমাম শাফেয়ী রহ., যাঁকে অনেক আলেম হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর 'মুজাদ্দিদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যাঁর মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক আলেম, তিনি ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর স্নেহাস্পদ ও অনুগ্রহধন্য শিষ্য। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর সান্নিধ্য থেকেই তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ জন্য ইমাম শাফেয়ী রহ. কৃতজ্ঞচিত্তে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর গুণকীর্তন করেছেন।

তিনি বলেছেন–

> حَمَلْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ حِمْلَ بُخْتِيٍّ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا سَمَاعِي.
>
> আমি ইমাম মুহাম্মাদ থেকে এক 'বুখতী' উট বোঝাই করে কিতাব এনেছি। এসব কিতাব তাঁর থেকে আমি ব্যতীত আর কেউ শুনেনি।[৩৪৬]

---

৩৪৫. বুলূগুল আমানী ফী সীরাতিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশশায়বানী, পৃ. ৫৬

৩৪৬. আদাবুশ শাফেয়ী ওয়ামানাকিবুহু, পৃ. ৩৩; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/৭৮; তারীখে দিমাশক ৫১/২৯৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/১৪; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/৯৫৪; ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়াআখবারুহু, ইবনে আবুল আউওয়াম, পৃ. ৩৫০

শাফেয়ী রহ. বলেন, আমি 'বুখতী' উট এ জন্য বলেছি যে, এই উট অন্যান্য উট থেকে বেশি বোঝা বহণ করতে পারে।[৩৪৭]

তিনি আরও বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ، وَلا أَفْقَهَ، وَلا أَزْهَدَ، وَلا أَوْرَعَ، وَلا أَحْسَنَ نُطْقًا وَإِيرَادًا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(৩৪৮).

মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (ইমাম মুহাম্মাদ রহ.) থেকে বড় জ্ঞানী, বড় মুজতাহিদ, অধিক দুনিয়াবিমুখ, অধিক পরহেযগার এবং উচ্চারণে ও উত্তর প্রদানে তাঁর থেকে বেশি সুন্দর আর কাউকে দেখিনি।[৩৪৯]

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর আরেকটি বক্তব্য হলো–

أَمَنُّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي الْفِقْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.

ফিকহের ক্ষেত্রে আমার উপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী হলেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.।[৩৫০]

ইবরাহীম হারবী রহ. বলেন, আমি আহমদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম–

مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ الدِّقَاقُ؟

আপনি এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা-মাসায়েল কোথায় থেকে অর্জন করেছেন?

---

৩৪৭. ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়াআখবারুহু, ইবনে আবুল আউওয়াম, পৃ. ৩৫০

৩৪৮. علق عليه الذهبي: لم يرو هذا عن الربيع إلا أحمد بن حماد، وهو قول منكر. وتعقبه الكوثري في تعليقه عليه بقوله: لا وجه لقول الذهبي هذا، لأن ابن كأس ثقة، وأحمد بن حماد بن سفيان وثقه الخطيب على تعنته، وقال الدارقطني: لا بأس به. ولم ينقل فيه جرح. وللخبر شواهد عديدة، فلا يكون كلام الذهبي متمشيا مع قواعد النقد.

৩৪৯. মানাকিবুল ইমামি আবী হানীফা ও ছাহিবাইহি, পৃ. ৮৭

৩৫০. তারীখে বাগদাদ ২/৫৬১

আহমদ রহ. বলেছেন–

مِنْ كُتُبِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ.

ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কিতাবাদি থেকে।[৩৫১]

আবু ওবায়দ রহ. বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنْهُ.

কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ থেকে বড় কোনো আলেম আমি দেখিনি।[৩৫২]

ইমাম শাফেয়ী রহ.ও বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ، كَأَنَّ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ نَزَلَ.

কুরআনে কারীমের তাফসীর সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ থেকে বড় কোনো আলেম আমি দেখিনি। যেন কুরআনে কারীম তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে।[৩৫৩]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.ও ছিলেন তাঁর বিশেষ শিষ্য। তিনি বলেন–

كَتَبْتُ الْجَامِعَ الصَّغِيْرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ.

আমি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে তাঁর কিতাব 'আলজামিউছ ছগীর' লেখেছি।[৩৫৪]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

وَكَانَ إِمَامًا مُجْتَهِدًا.

ইমাম মুহাম্মাদ ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম।[৩৫৫]

৩৫১.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১২৯; আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়ালউমাম ৯/১৭৫; তারীখুল ইসলাম ৪/৯৫৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৩৬; আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/২১৯

৩৫২.মানাকিবু আবী হানীফা ওয়াছাহিবাইহি, পৃ. ৮০; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/৯৫৪

৩৫৩.ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু, ইবনে আবুল আউওয়াম, পৃ. ৩৫০; মানাকিবু আবী হানীফা ওয়াছাহিবাইহি, যাহাবী পৃ. ৮১

৩৫৪.ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহু, পৃ. ৩৫০; আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, ছায়মারী, পৃ. ১২৯; তারীখে বাগদাদ ২/৫৬১; তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত, নববী ১/৮১; তারীখুল ইসলাম ৪/৯৫৪

৩৫৫.তারীখুল ইসলাম ৪/৯৫৪

গাইরে মুকাল্লিদ আলেম ছিদ্দীক হাসান খাঁন রহ.-এর বক্তব্য পেছনে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি মুজতাহিদ ইমাম।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. শুধু মুজতাহিদ ছিলেন না; মুজতাহিদদের উস্তায ছিলেন। আমরা দেখেছি, ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ থেকেই ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন করেছি। আরও দেখেছি, ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন করেই ইমাম আহমাদ রহ. সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিধি-বিধান আহরণ করেছেন।

৮. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. (১২০-১৯৮ হিজরী)

মুহাদ্দিসীনে কেরাম যাদেরকে 'আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীস' উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ.। ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. যাদের থেকে ইলমুল হাদীস অর্জন করেছেন তিনি সেই তবকার প্রায় সকলের উস্তায। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. লেখেন–

> وَمِنْهُ تَعَلَّمَ عِلْمُ الحَدِيثِ أَحْمَدُ بْن حَنْبَل، وَيَحْيَى بْنُ مَعِين، وَعَلِيُّ بْن الْمَدِينِيِّ، وَسَائِرُ شُيُوخِنَا.
>
> ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. থেকেই ইলমুল হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও আলী ইবনুল মাদীনী রহ.সহ আমাদের অন্যান্য আসাতিযা কেরাম।[৩৫৬]

আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এবং এই স্তরের অন্যান্য মুহাদ্দিস হলেন ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-এর শিক্ষক, যাঁদের থেকে ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। ইবনে হিব্বান রহ.-এর ভাষ্যমতে তাঁদের সকলের উস্তায হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ.। অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. হলেন ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-এর উস্তাযগণের উস্তায।

---

৩৫৬. আছছিকাত ৪/৩৯০; আল-আনসাব, সামআনী ১০/৪৫০; তাহযীবুত তাহযীব ৭/৫৫১

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

وَكَانَ رَأْسًا فِي مَعْرِفَةِ الْعِلَلِ، أَخَذَ ذٰلِكَ عَنْهُ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ، وَأَخَذَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ الْمَدِيْنِيِّ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ.

তিনি ছিলেন ইলালুল হাদীসশাস্ত্রের প্রধান। এ শাস্ত্র তাঁর থেকে গ্রহণ করেছেন আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এবং আলী ইবনুল মাদীনী রহ. থেকে গ্রহণ করেছেন ইমাম বুখারী রহ.।[৩৫৭]

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীজীর সমস্ত হাদীস জমা হয়েছে ছয়জন মুহাদ্দিসের নিকট। তাদের পরের যুগে বারোজন মুহাদ্দিসের নিকট। তাদের পর ছয়জন ইমামের নিকট।

এরপর ইবনুল মাদীনী রহ. তৃতীয় স্তরে ইলমুল হাদীসের স্তম্ভপুরুষ হিসাবে যে ছয় ইমামের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রথম ইমাম হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ.।[৩৫৮]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেছেন–

لا تَرَى بِعَيْنَيْكَ مِثْلَ يَحْيى بْنِ سَعِيد الْقَطَّانِ أَبَدًا.

তোমার দুই চোখে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানের মতো মুহাদ্দিস কখনো দেখতে পাবে না।[৩৫৯]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন–

مَا رَأَيْنَا مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ.

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানের মতো হাদীসবিশারদ আমরা দেখিনি।[৩৬০]

---

৩৫৭. তারীখুল ইসলাম ৪/১২৪৯

৩৫৮. আল-ইলাল, ইবনুল মাদীনী, পৃ. ৭৬-৯০; আল-জারহু ওয়াততাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৩৪-২৩৫; শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দা, পৃ. ৩৩-৩৯; আল-মুহাদ্দিসুল ফাছিল, রামাহুরমুযী, পৃ. ২৯৩-২৯৫

৩৫৯. আল-কামেল ফিয্যুআফা, ইবনে আদী ১/১৮৫; তারীখে বাগদাদ ১৬/২০৩; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/১২৪৪

৩৬০. সুআলাতুস সুলামী লিদ্দারাকুতনী, পৃ. ৩২৮ (৪১৮); আল-কামেল, ইবনে আদী ১/১৮৫; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/১২৪৪

তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেছেন–

وَلَا رَأَى أَحْمَدُ وَرُفَقَاؤُهُ مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ القَطَّانِ.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এবং তাঁর যমানার মুহাদ্দিসগণ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান রহ.-এর মতো কোনো মুহাদ্দিস দেখেননি।[৩৬১]

জেনে আনন্দিত হবেন যে, ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ.-এর উস্তাযগণের উস্তায, যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ এই ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ.-এর মতো মহান আহলে হাদীসও মাযহাব মানতেন, ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে অনুসরণ করতেন। তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন–

كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَذْهَبُ فِي الْفَتْوَى مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. ফিকহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে কূফাবাসী (তথা আবু হানীফা রহ.)-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন।[৩৬২]

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. আরও বলেন–

وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَذْهَبُ فِي الفَتْوَى إِلَى قَوْلِ الكُوفِيِّينَ، وَيَخْتَارُ قَوْلَهُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ، وَيَتْبَعُ رَأْيَهُ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ.

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. ফতোয়ার ক্ষেত্রে কূফাবাসীদের মাযহাব গ্রহণ করতেন। এরপর কূফার আলেমদের মধ্য থেকে ইমাম আবু হানীফার মত নির্বাচন করতেন এবং আবু হানীফার সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে আবু হানীফার রায় অনুসরণ করতেন।[৩৬৩]

---

৩৬১. তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা, ১০/২২১

৩৬২. আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, পৃ. ২০৪

৩৬৩. তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৩; তাহযীবুল কামাল ২৯/৪৩৩; মাগানিল আখইয়ার, বদরুদ্দীন আইনী ৩/১৩৫; আততবাকাতুস সানিয়্যা, তাকিউদ্দীন গায্যী, পৃ. ২৯; মাকানাতুল ইমামি আবী হানীফা ফিল হাদীস, পৃ. ৯৯

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. নিজে আবু হানীফা রহ.-এর তাকলীদ করতেন– শুধু একটুকু নয়; বরং আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী অন্যদেরও ফতোয়া দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন–

وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِيْ حَنِيفَةَ.

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. আবু হানীফা রহ.-এর মত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[৩৬৪]

এমনিভাবে শাফেয়ী মাযহাবের বরিত ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.ও একই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো–

كَانَ يُفْتِيْ بِرَأْيِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. আবু হানীফা রহ.-এর মত অনুসারে ফতোয়া প্রদান করতেন।[৩৬৫]

তাছাড়া, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. নিজেই বলেছেন–

لا نَكْذِبُ اللهَ، مَا سَمِعْنَا أَحْسَنَ مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَخَذْنَا بِأَكْثَرِ أَقْوَالِهِ.

আল্লাহ তাআলার সামনে আমরা মিথ্যা বলতে পারব না। আবু হানীফার রায় থেকে উত্তম রায় অন্য কারও থেকে আমরা শুনিনি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতই গ্রহণ করেছি।[৩৬৬]

৩৬৪.আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১৫৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফায (ওয়াকী রহ.-এর জীবনী) ১/৩০৫; আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/২১২

৩৬৫.তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৩০৭; আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ১০২; ফিকহু আহলিল ইরাক পৃ. ১৭৯

৩৬৬. তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৩; মানাকিবু আবী হানীফা, মুওয়াফ্ফাক আলমাক্কী, পৃ. ২৮৪; তাহযীবুল কামাল ২৯/৪৩৩; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৩/৯৯০; আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১৪৪
এখানে এই প্রশ্ন করলে বোকামি হবে যে, তিনি যদি আবু হানীফা রহ.-এর অনুসরণ করতেন তাহলে তাঁর সব মত কেন গ্রহণ করেননি?
এই প্রশ্ন সঠিক নয়। কেননা, তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম। আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মত মহান ইমাম। আর এই ধরনের আলেমগণ সব ক্ষেত্রে =

৯. ইমাম ওয়াকী ইবনে জার্রাহ রহ. (১২৯-১৯৭ হিজরী)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَوْعَى لِلْعِلْمِ، وَ لَا أَفْضَلَ مِنْ وَكِيْعٍ.

(কুরআন-হাদীসের) ইলম ওয়াকী রহ. থেকে অধিক সংরক্ষণকারী ও তাঁর চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখিনি।[৩৬৭]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন–

مَا رأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ وَكِيْعٍ.

ওয়াকী রহ. থেকে শ্রেষ্ঠ আলেম আর দেখিনি।

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, তাহলে ইবনুল মুবারক রহ.?

তিনি বললেন, ইবনুল মুবারক রহ.-এর অনেক মর্যাদা ছিল, তবে আমি ওয়াকী রহ. থেকে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখিনি।[৩৬৮]

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. আরও বলেন–

وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْهُ.

আল্লাহর কসম! ওয়াকী রহ. থেকে বড় হাফীযুল হাদীস আর দেখেনি।[৩৬৯]

= তাকলীদ করেন না। তাদের গবেষণায় যেসব বিষয়ে ইমামের মত দুর্বল বিবেচিত হয়, সেসব বিষয়ে নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু এর কারণে এই কথা বলা ভুল যে, তিনি সেই ইমামের তাকলীদ করেন না।

আবু ইউসুফ রহ., মুহাম্মাদ রহ. ও তহাবী রহ. প্রমুখ ইমামগণ এভাবেই ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর তাকলীদ করেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা আবু হানীফা রহ. -এর রায় অনুসারে আমল করেন না। বরং সব মাযহাবেই এমন বহু বিজ্ঞ আলেম রয়েছেন, যারা একাধিক মাসআলায় সেই ইমামের তাকলীদ করেন না। কিন্তু এর কারণে কেউ এ কথা বলেন না যে, তিনি সেই মাযহাবের অনুসারী নন।

৩৬৭. তাহযীবুল আসমা ওয়াছছিফাত ২/১৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৩০৬

৩৬৮. তারীখে বাগদাদ ১৩/৫০১ ও ৫০৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৩০৬; তাহযীবুত তাহযীব ৭/৪৭১; ফিকহু আহলিল ইরাক পৃ. ১৭৮-১৭৯

৩৬৯. তাহযীবুত তাহযীব ৭/৪৭১

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর শিষ্য সুফিয়ান ইবনে আবদুল মালিক রহ. বলেন–

كَانَ وَكِيعٌ أَحْفَظَ مِنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

ওয়াকী রহ. ছিলেন ইবনুল মুবারক রহ. থেকেও বড় হাফীযুল হাদীস।[৩৭০]

কুরআন-হাদীসের এই শ্রেষ্ঠ আলেমও আবু হানীফা রহ.-এর অনুসরণ করতেন এবং তাঁর রায় মোতাবেক ফতোয়া দিতেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.-এর উস্তায ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন–

كَانَ يُفْتِيْ بِرَأْيِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

ওয়াকী রহ. আবু হানীফা রহ.-এর রায় অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[৩৭১]

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. আরও বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ وَكِيْعٍ، كَانَ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَحْفَظُ حَدِيْثَهُ، وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَيسرُدُ الصَّوْمَ، وَيُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ كَثِيْراً.

ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ. থেকে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে আমি দেখিনি। কেবলামুখী হয়ে হাদীস মুখস্থ করতেন। রাত জেগে নামায পড়তেন। লাগাতার রোযা রাখতেন। **আবু হানীফার মত অনুসারে ফতোয়া দিতেন**। আবু হানীফা রহ. থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন।[৩৭২]

পূর্বে গাইরে মুকাল্লিদ আলেম ছিদ্দীক হাসান খান রহ.-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে তিনি ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ.-কে হানাফী ইমামগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন–

---

৩৭০. তাহযীবুত তাহযীব ৭/৪৭৪

৩৭১. আল-ইনতকা, ইবনে আবদুল বার, পৃ. ২১১; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ১/৩০৭; তাহযীবুত তাহযীব ৭/৪৭১; আবু হানীফা ওয়া-আছহাবুহুল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ১১৩; ফিকহু আহলিল ইরাক, পৃ. ১৭৮

৩৭২. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, পৃ. ১৫৫; তারীখে বাগদাদ ১৫/৬৪৭; তারীখে দিমাশক ৬৩/৭৬; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৪/১২৩০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৪৮; আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ২/২২১

مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ:

اَلْإِمَامُ الْقَاضِيْ: أَبُوْ يُوْسُفَ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ.

وَالْإِمَامُ: مُحَمَّدٌ، وَقَد بَلَغَ رُتْبَةَ الْاِجْتِهَادِ أَيْضًا.

وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْمُحَدِّثُ الْمَرْوَزِيُّ.

وَالْإِمَامُ: دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرِ الطَّائِيُّ الْكُوْفِيُّ.

وَوَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا.

হানাফী ইমামগণের মধ্য থেকে অন্যতম হলেন–

- ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহ.। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ।
- ইমাম মুহাম্মহ রহ.। তিনিও মুজতাহিদের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন।
- মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মারওয়াযী রহ.।
- ইমাম দাউদ ইবনে নুছায়র তাঈ কূফী রহ.।
- ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ.।
- ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ.।[৩৭৩]

১০. ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ. (২০৩ হিজরী)

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আদম আলকূফী রহ. ছিলেন হাদীসের ছয় স্তম্ভপুরুষের একজন। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীজীর হাদীস জমা হয়েছে ছয়জন মুহাদ্দিসের নিকট। তাঁদের পর বারোজন, তাঁদের পরের যুগে ছয়জন ইমামের নিকট।

এরপর ইবনুল মাদীনী রহ. ইলমুল হাদীসের স্তম্ভপুরুষ হিসাবে শেষে যে ছয়জনের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের একজন হলেন ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ.।[৩৭৪]

৩৭৩.আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৩৯

৩৭৪.আল-ইলাল, ইবনুল মাদীনী, পৃ. ৭৬-৯০; আল-জারহু ওয়াত তাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৩৪-২৩৫; শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দা, পৃ. ৩৩-৩৯; আল-মুহাদ্দিসুল ফাছিল, রামাহুরমুযী, পৃ. ২৯৩-২৯৫।

ইমাম আবু উসামা হাম্মাদ ইবনে উসামা ইবনে যায়েদ আলকূফী রহ. বলেন–

مَا رَأَيْتُ يَحْيَى بنَ آدَمَ قَطُّ إِلَّا ذَكَرتُ الشَّعْبِيَّ.

যখনই আমি ইয়াহইয়া ইবনে আদমকে দেখেছি, শাবী রহ. -এর কথা মনে হয়েছে।[৩৭৫]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. আবু উসামার এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে বলেন–

يُرِيْدُ: أَنَّهُ كَانَ جَامِعاً لِلْعِلْمِ.

আবু উসামা রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো, শাবী রহ.-এর মতো ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ.ও ছিলেন সকল ইলমের খাযানা।[৩৭৬]

ইমাম আবু উসামা হাম্মাদ ইবনে উসামা আলকূফী রহ. আরও বলেন–

كَانَ عُمَرُ فِي زَمَانِهِ رَأْسَ النَّاسِ، ـوَهُوَ جَامِعٌـ وَكَانَ بَعْدَهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ فِي زَمَانِهِ، وَبَعدَهُ: الشَّعْبِيُّ فِي زَمَانِهِ، وَكَانَ بَعْدَهُ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَكَانَ بَعْدَ الثَّوْرِيِّ: يَحْيَى بنُ آدَمَ.

উমর রাযি. ছিলেন স্বযুগের সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি ছিলেন সমস্ত ইলমের ভাণ্ডার। তাঁর পরের যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ছিলেন শ্রেষ্ঠতম আলেম। তাঁর পরের যুগে আমের ইবনে শারাহীল শাবী রহ. ছিলেন শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। শাবী রহ.-এর পর সুফিয়ান ছাওরীর রহ. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। **আর সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর পর সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ.।**[৩৭৭]

৩৭৫.সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৫২৪; তারীখুল ইসলাম ৫/২১৬; আল-জাওয়াহিরুল নাকিয়্যা ফী তারাজিমিল হুফ্ফাযিল হানাফিয়্যা, পৃ. ৩৯৯।

৩৭৬.প্রাগুক্ত

৩৭৭.তারীখে দিমাশক ২৫/৩৫২; আততাকমীল ফিলজারহি ওয়াততাদীল, ইবনে কাছীর ২/১৫৪-১৫৫; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫/২১৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৫২৫

আবু উসামা রহ.-এর বাণীটি উল্লেখ করে হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. মন্তব্য করেন–

قَدْ كَانَ يَحْيَى بنُ آدَمَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الاجْتِهَادِ.

ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ. ছিলেন বিজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামগণের অন্যতম।[৩৭৮]

ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন এই ইমামও আবু হানীফা রহ.-এর তাকলীদ করতেন।[৩৭৯] সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হিজরী) বলেন–

ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِى جُمْلَةِ الْحَنَفِيَّةِ فِيْ طَبَقَاتِهِمْ.

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ. হানাফী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩৮০]

৩৭৮.সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৫২৫

৩৭৯.ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহ ও মাযহাবের প্রশংসা সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ.-এর অনেক বাণী বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : কাশফুল আছারিশ শারীফা ফী মানাকিবিল ইমামি আবী হানীফা ১/৩৬৫-৩৬৭ (১১৬৩-১১৭১); মানাকিবু আবী হানীফা, মুয়াওফ্‌ফাক মাক্কী, পৃ.২৯৩, ২৯৫-২৯৬

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর গুণকীর্তন করে হাসান ইবনে ছালেহ রহ. থেকে এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন–

كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ فِيمَا نَعْلَمُ مُتَثَبِّتًا فِيهِ، إِذا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْدُ إِلَى غَيْرِهِ.

আমাদের জানামতে আবু হানীফা রহ. ছিলেন হাদীসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে প্রমাণিত হলে তিনি অন্য কোনো দলীল তালাশ করতেন না।

–আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/২৮; মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়াছাহিবাইহি, যাহাবী, পৃ. ৩০

৩৮০.মাগানিল আখইয়ার ফী শারহি আসামী রিজালি মাআনিল আছার ৩/১৯৬; আল-জাওয়াহিরুল নাকিয়্যা ফী তারাজিমিল হুফ্‌ফাযিল হানাফিয়্যা, পৃ. ৩৯৭

১১. ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. (১১৮-২০৬ হিজরী)

ইমাম ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. 'ওয়াসিতে'র শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., আলী ইবনুল মাদীনী রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. ও আবু বকর ইবনে আবী শায়বা রহ. প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের উস্তায। ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন–

مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَحْفَظَ مِنْ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ.

আমি ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে বড় হাফেযুল হাদীস আর দেখিনি।[৩৮১]

আগে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, 'আল্লাহর কসম! ওয়াকী রহ. থেকে বড় হাফেযুল হাদীস আর দেখেনি'। কিন্তু ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া তামিমী রহ. বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.-এর হিফযুল হাদীসের পরিমাণ ছিল ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ. থেকেও বেশি। তিনি বলেন–

يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنُ أَحْفَظُ مِنْ وَكِيْعٍ.

ইয়াযীদ ইবনে হারূন ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ. থেকেও বড় হাফেযুল হাদীস।[৩৮২]

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শায়বা রহ. বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَتقَنَ حِفْظاً مَنْ يَزِيْدَ بنِ هَارُوْنَ.

ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. থেকে দৃঢ় ও নিখুঁত বর্ণনাকারী হাফেযে হাদীস আর কাউকে দেখিনি।[৩৮৩]

---

৩৮১. তারীখে বাগদাদ ১৬/৪৯৩; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫/২২৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩৫৯; তাহযীবুল কামাল ২৩/২৬৭; তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩১

৩৮২. তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫/২২৮; তারীখে বাগদাদ ১৬/৪৯৩; তবাকাতু উলামাইল হাদীস, ইবনে আবদুল হাদী ১/৪৬০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩৫৯; তাহযীবুল কামাল ২৩/২৬৭; তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩১

৩৮৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩৯১, ৩৭০

ইয়াহইয়া ইবনে আবু তালেব রহ. বলেন–

سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ فِي الْمَجْلِسِ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ فِي الْمَجْلِسِ سَبْعِيْنَ أَلْفًا.

আমি ইয়াযীদ ইবনে হারূনকে বাগদাদের এক মজলিসে (হাদীস বর্ণনা করতে) শুনেছি। বলা হতো, সে মজলিসের উপস্থিতির পরিমাণ ছিল সত্তর হাজার।[৩৮৪]

এই বরেণ্য আহলে হাদীস ছিলেন আবু হানীফা রহ.-এর শিষ্য এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী। হাসান ইবনে আলী বলেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূনকে প্রশ্ন করা হলো–

مَنْ أَفْقَهُ مَنْ رَأَيْتَ.

আপনি যাদের দেখেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুজতাহিদ কে?

তিনি উত্তর দিয়েছেন–

أَبُو حَنِيْفَةَ

আবু হানীফা রহ.।

এরপর বলেছেন–

وَلَيَصِيْرَنَّ أَبُو حَنِيْفَةَ أُسْتَاذًا كَإِبْرَاهِيْمَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِيْ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ مَسْئَلَةٍ، قَالَ: وَجَالَسْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِجُمْعَةٍ.

কোনো সন্দেহ নেই, আবু হানীফা রহ. ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর মতো মহামনীষীরূপে পরিগণিত হবে। আমি ভালোবাসি যে, আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত একলক্ষ মাসআলা আমার সংগ্রহে থাকবে! তিনি আরও বলেন, আবু হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের এক সপ্তাহ আগে আমি তাঁর সোহবত গ্রহণ করতে পেরেছি।[৩৮৫]

৩৮৪.তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৪৬; তাহযীবুল কামাল ৩২/২৬৮; তাহযীবুল তাহযীব ৭/৩২
৩৮৫.আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ২/২২০

মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ মাক্কী রহ. বলেন–

اِتَّفَقَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ وَاسِطًا مَا أَخْرَجَتْ مِثْلَ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ فِي حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ وَزُهْدِهِ وَأَنْوَاعِ فَضَائِلِهِ. رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ مَعَ فَضْلِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ الْفِقْهِ، وَكَانَ مَائِلًا إِلَيْهِ.

মুহাদ্দিসীনে কেরাম একমত যে, হাদীস মুখস্থ করা, নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা, দুনিয়াবিমুখতা ও যাবতীয় উত্তম গুণে ওয়াসিত শহরে ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ.-এর মতো মনীষী জন্ম হয়নি। তিনি আপন শ্রেষ্ঠত্ব ও বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও আবু হানীফা রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার নিকট অসংখ্য মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন এবং আবু হানীফা রহ.-এর ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।[৩৮৬]

১২. আবু আছেম নাবীল রহ. (১২২-২১২ হিজরী)

ইমাম যাহ্হাক ইবনে মাখলাদ আবু আছেম আননাবীল রহ. ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., আলী ইবনুল মাদীনী রহ., বুখারী রহ. প্রমুখ হাদীসবিশারদ ইমামগণের উস্তায। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ أَجَلُّ شُيُوْخِهِ وَأَكْبَرُهُمْ.

আবু আছেম নাবীল রহ. থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম বুখারী রহ.। তিনি বুখারী রহ.-এর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবার চেয়ে বড় উস্তায।[৩৮৭]

ইমাম উমর ইবনে শাব্বা রহ. (১৭৩-২৬২ হিজরী) বলেন–

وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ.

আল্লাহর কসম! আমি তাঁর মতো মুহাদ্দিস দেখিনি।[৩৮৮]

৩৮৬.মানাকিবু আবী হানীফা, পৃ. ৩০৩

৩৮৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৪৮১

৩৮৮.তাহযীবুল কামাল ১৩/২৮৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৪৮১; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/২৬৯; তাহযীবুত তাহযীব ৩/৪২১

ইমাম মুহিউস্‌সুন্নাহ বগবী রহ. (৫১৬ হিজরী) বলেন–

مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

একজন মহান আহলে হাদীস।[৩৮৯]

সায়্যেদ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর কাত্তানী রহ. (১৩৪৫ হিজরী) বলেন–

شَيْخُ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ.

তিনি হাফেযুল হাদীস ইমামগণের শায়েখ।[৩৯০]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. আবু আছেম নাবীল রহ.-এর জীবনী আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে–

الإِمَامُ، الحَافِظُ، شَيْخُ المُحَدِّثِيْنَ الأَثْبَاتِ.

ইমাম, হাফেযুল হাদীস, বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের শায়েখ।[৩৯১]

তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বিশেষ শিষ্য।[৩৯২]

আবু হানীফার শাগরেদ যুফার ইবনে হুযাইল রহ.-এর কাছেও আবু আছেম নাবীলের অনেক আসা-যাওয়া ছিল। আবু আবদুল্লাহ ছয়মারী রহ. বলেন–

وَلزِمَ أَبُو عَاصِمٍ زُفَرَ بْنَ الْهُذَيْلِ بَعْدَ أَبِيْ حَنِيفَةَ، وَعَلِيهِ تَفَقَّهَ، وَهُوَ الَّذِي لَقَّبَهُ بِـ«النَّبِيلِ».

আবু হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের পর আবু আছেম রহ. যুফার ইবনে হুযায়ল রহ.-এর সোহবত গ্রহণ করেছেন। যুফার রহ.-এর নিকটই তিনি ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনিই আবু আছেমকে 'নাবীল' উপাধি দিয়েছেন।[৩৯৩]

---

৩৮৯. শরহুস সুন্নাহ ৫/১৯৭

৩৯০. আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ৮৬

৩৯১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৪৮০

৩৯২. আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/২৬৩

৩৯৩. নাবীল অর্থ : অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, মহৎ ইত্যাদি। যুফার রহ.-এর এক বাঁদি যুফার রহ.-এর নিকট এসে আবু আছেমকে 'নাবীল' বলে পরিচয় করিয়েছিল। আর সে থেকেই তিনি নাবীল উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সে ঘটনা বেশ চমৎকার। =

কাযী আবদুর রহমান ইবনে নায়েল রহ. বলেন–

كُنْتُ أَسْأَلُ هِلَالًا وَأَبَا عَاصِمٍ عَنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، فَكَانَ أَبُو عَاصِمٍ أَحْفَظَ لَهَا مِنْ هِلَالٍ.

আমি হেলাল ও আবু আছেমকে 'আলজামিউল কাবীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যেসব মাসআলা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। লক্ষ করেছি, এই কিতাবের মাসআলাগুলো হেলাল থেকে আবু আছেমের বেশি মুখস্থ।[৩৯৪]

= আবু আছেম নাবীল রহ. বেশভূষায় আভিজাত্য পছন্দ করতেন। যুফার রহ.-এর মজলিসে আবু আছেম নামে আরেকজন আলেমের আনাগোনা ছিল। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল জীর্ণশীর্ণ। একদিন যুফার রহ.-এর বাঁদি এসে বলল, দরজায় আবু আছেম দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। যুফার রহ. জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আবু আছেম? বাঁদি উত্তরে বলেছে–

ذَاكَ النَّبِيلُ.

ওই যে নাবীল (অভিজাত) আবু আছেম।

আবু আছেম রহ. বলেন, এরপর অনুমতি হলে আমি ভেতরে প্রবেশ করি। দেখি, যুফার রহ. হাসছেন। জিজ্ঞেস করলাম, হযরত, হাসছেন কেন?
উত্তর দিয়েছেন–

إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ لَقَّبَتْكَ بِلَقَبٍ لَا أَرَاهُ يُفَارِقُكَ أَبَدًا، فِي حَيَاتِكَ، وَلَا بَعْدَ مَوْتِكَ.

এই বাঁদি তোমাকে একটি উপাধি দিয়েছে। আমার মনে হয় না এই উপাধি কখনো তোমার থেকে পৃথক হবে; না তোমার জীবদ্দশায়, না মৃত্যুর পর।
আবু আছেম নাবীল রহ. বলেন–

فَسُمِّيتُ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ النَّبِيلَ.

এ কারণে সেদিন থেকে আমি 'নাবীল' উপাধিতে পরিচিতি হয়ে গেছি। –আখবারু আবী হানীফা ওয়া-আছহাবিহি, পৃ. ১৫৯; তাকঈদুল মুহমাল ওয়াতাময়ীযুল মুশকিল, আবু আলী আলগাস্যানী ৩/১১৪৪; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫/৩৩২; ইকমালু তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৫; আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা ১/২৬৪

৩৯৪. আখবারু আবী হানীফা ওয়াআছহাবিহি, ছয়মারী, পৃ. ১৫৯

১৩. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বলখী রহ. (২১৫ হিজরী)

আবুস সাকান মাক্কী ইবনে ইবরাহীম ইবনে বাশীর বলখী রহ. ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ যুহলী রহ., আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., বুখারী রহ. প্রমুখ বড় বড় হাদীসবিশারদ ইমামের উস্তায। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

لَمْ يَلْقَ الْبُخَارِيُّ بِخُرَاسَانَ أَحَداً أَكْبَرَ مِنْهُ.

ইমাম বুখারী রহ. খুরাসানে তাঁর চেয়ে বড় কোনো মুহাদ্দিসের সাক্ষাৎ পাননি।[৩৯৫]

সনদের দিক থেকে সহীহ বুখারীর সর্বোচ্চ স্তরের হাদীস হলো ওইসব হাদীস, যেগুলোর সনদে ইমাম বুখারী রহ. থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মাধ্যম মাত্র তিনজন। তিনজন রাবীর মাধ্যম হয়ে ইমাম বুখারী রহ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বুখারী রহ. তার উস্তায থেকে, তিনি তার উস্তায থেকে, তিনি সাহাবী থেকে এবং সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে— এভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের তিন রাবীর ওয়াসিতায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়, পরিভাষায় সেগুলোকে ثُلَاثِيّ (ছুলাছী) বলা হয়, যা সহীহ বুখারীর সর্বোচ্চ সনদ। এই ثُلَاثِيّ হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে সর্বমোট ২২টি। এর মধ্যে ১১টিই বর্ণিত হয়েছে মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বলখী রহ. থেকে।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী রহ. বলেন–

لَا يَذْهَبُ عَلَيْكَ: أَنَّهُمْ يَعُدُّوْنَ ثُلَاثِيَّاتِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ بِتِلْكَ الشِّدَّةِ وَالْاِهْتِمَامِ، وَيَكْتُبُوْنَ عَلَى هَامِشِهِ بِالْقَلَمِ الْوَاضِحِ: أَنَّ الْحَدِيْثَ الْفُلَانِيَّ مِنَ الثُّلَاثِيَّاتِ، وَلَا يَدْرُوْنَ أَنَّ الْعِشْرِيْنَ مِنْهَا عَنْ تَلَامِذَةِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَوْ تَلَامِذَةِ تَلَامِذَتِهِ؛ فَإِنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَ مِنْهَا إِحْدٰى عَشَرَةَ رِوَايَةً عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ.

৩৯৫.সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৫৫৩

ভুলে গেলে চলবে না, মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইমাম বুখারী রহ.-এর ছুলাছী হাদীসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গণনা করেন এবং টীকায় পরিষ্কার লেখে দেন, এই হাদীসটি ছুলাছী। অথচ তাঁদের খবর নেই, ২২টি ছুলাছী হাদীসের মধ্যে ২০টিই ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের থেকে বা তাঁর শিষ্যগণের শিষ্যদের থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী রহ. শুধু মাক্কী ইবনে ইবরাহীম থেকেই ১১টি ছুলাছী হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৯৬]

এই মাক্কী ইবনে ইবরাহীম, যিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর প্রথম সারির উস্তায[৩৯৭], যার থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি ছুলাছী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হানীফা রহ.-এর শিষ্য এবং আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। ইমাম মুয়াওফ্ফাক ইবনে আহমাদ মাক্কী রহ. বলেন–

هُوَ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَلْخِيُّ، إِمَامُ بَلْخ، دَخَلَ الْكُوْفَةَ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ وَمِأَةٍ، وَلَزِمَ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيْث وَالْفِقْهَ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ الرِّوَايَةَ، وَكَانَ جَاوَرَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً. وَكَانَ يُحِبُّ أَبَا حَنِيْفَةَ حُبًّا شَدِيْدًا، وَيَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ.

মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বলখী রহ. বলখ শহরের ইমাম। ১৪০ হিজরীতে কূফায় প্রবেশ করেন এবং আবু হানীফা রহ. সোহবতে পড়ে থাকেন। তাঁর থেকে হাদীস ও ফিকহ শুনেছেন এবং অনেক রেওয়ায়েত করেছেন। ১২ বছর বায়তুল্লাহর নিকট অবস্থান করেছেন। তিনি আবু হানীফা রহ.-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং খুব দৃঢ়তার সাথে তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন।[৩৯৮]

---

৩৯৬. লামিউদ্দারারী আলা জামিইল বুখারী (মুকাদ্দিমা) ১/২৮

৩৯৭. হাফেয ইবনে হাজার রহ. ইমাম বুখারী রহ.-এর শায়েখদের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে বলেন, ইমাম বুখারী রহ. আসাতিযা কেরামের পাঁচটি স্তর। এরপর তিনি মাক্কী ইবনে ইবরাহীমকে প্রথম স্তরে গণ্য করেছেন। –ফাতহুল বারী (মুকাদ্দিমা), পৃ. ৫০৩

৩৯৮. মানাকিবু আবী হানীফা, পৃ. ১৭৯

১৪. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. (১৫৮-২৩৩ হিজরী)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ইমাম বুখারী রহ., মুসলিম রহ. ও আবু দাউদ রহ.-এর উস্তায, দশ লক্ষ হাদীসের হাফেয। ইলালুল হাদীসশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. (২৩৪ হিজরী) বলেন–

> لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ لَدُنِ آدَمَ كَتَبَ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا كَتَبَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ.
>
> ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. যে পরিমাণ হাদীস লিখেছেন, আমাদের জানামতে– আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে অদ্যাবধি অন্য কেউ এত হাদীস লেখেনি।[৩৯৯]

আগে ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদা রহ.-এর আলোচনায় গত হয়েছে যে, আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, নবীজীর সকল হাদীস জমা হয়েছে ছয়জন মুহাদ্দিসের নিকট। এরপর তাঁদের সকল হাদীস জমা হয়েছে বারোজন মুহাদ্দিসের নিকট। এরপর তাঁদের সকল হাদীস একত্রিত হয়েছে ছয়জন মুহাদ্দিসের নিকট।[৪০০]

এরপর ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন–

ثُمَّ صَارَ حَدِيثُ هٰؤُلَاءِ كُلِّهِمْ إِلَى ابْنِ مَعِيْنٍ.

অতঃপর তাঁদের সকলের সব হাদীস এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর নিকট।[৪০১]

---

৩৯৯. তারীখে বাগদাদ ১৬/২৬৩; তারীখে দিমাশক ৬৫/১২; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ১৭/৪০৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ২/১৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৯১; মাগানিল আখইয়ার ৩/২২৪; আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ১২৯

৪০০. আল-ইলাল, ইবনুল মাদীনী, পৃ. ৭৬-৯০; আল-জারহু ওয়াত তাদীল (মুকাদ্দিমা) ১/২৩৪-২৩৫, ২৫২-২৫৩; শুরুতুল আইম্মাহ, ইবনে মান্দা, পৃ. ৩৩-৩৯; আল-মুহাদ্দিসুল ফাছিল, পৃ. ২৯৩-২৯৫

৪০১. আল-কামেল, ইবনে আদী ১/২১৭; তারীখে দিমাশক ৬৫/১৬-১৭; ওফায়াতুল আয়ান, ইবনে খাল্লিকান ৫/১১৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১২৭; তাহযীবুল কামাল ৩/৫৫০; তাহযীবুত তাহযীব ৭/৬০৪; বুহুসুন ফী তারীখিস সুন্নাতিল মুশার্‌রাফা, পৃ. ২৯

অন্যত্র এসেছে, ইমাম আবু যুরআ রাযী রহ. আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-এর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন–

'নির্ভরযোগ্য সমস্ত হাদীসের কেন্দ্র হলেন ছয়জন মুহাদ্দিস। তাদের সমস্ত হাদীস একত্র হয়েছে বারোজন ইমামের নিকট।'

এরপর আবু যুরআ রাযী রহ. বলেছেন–

وَصَارَ حَدِيثُ هَؤُلاءِ كُلُّهُمْ إِلَى يَحْيى بْنِ مَعِين.

এবং উক্ত সকল ইমামের সমস্ত হাদীস সঞ্চিত হয়েছে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর নিকট।[৪০২]

অর্থাৎ দুনিয়াতে যত হাদীস ছিল, প্রায় সব হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর জানা ছিল। তাই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন–

كُلُّ حَدِيْثٍ لَا يَعْرِفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَلَيْسَ بِحَدِيْثٍ.

যে হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন জানেন না, তা কোনো হাদীসই নয়।[৪০৩]

ইমাম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ছালেহ আবুল হাসান ইজলী রহ. বলেন–

> مَا خَلَقَ اللهُ أَحَدًا كَانَ أَعْرَفَ بِالْحَدِيْثِ مِنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ، وَلَقَدْ كَانَ يَجْمَعُ مَعَ ابْنِ حَنْبَلٍ، وَابْنِ الْمَدِيْنِيِّ، وَنُظَرَائِهِمْ، فَكَانَ هُوَ يَنْتَخِبُ الْأَحَادِيْثَ، لَا يَتَقَدَّمُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.
>
> আল্লাহ তাআলা এমন কোনো মুহাদ্দিস সৃষ্টি করেননি, যিনি হাদীস সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. থেকে বেশি পারদর্শী। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ও তাঁদের সময়ের অন্যান্য ইমামগণের সাথে মুযাকারার

৪০২.আল-কামেল ফিয্যুআফা, ইবনে আদী ১/২৬৫; তারীখে দিমাশক ৬৫/১৭; আল-মুলিম বিশুয়ূখিল বুখারী ওয়া মুসলিম, পৃ. ৫৭৯

৪০৩.তারীখে দিমাশক ৬৫/২৭; আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম ১১/২০৩; ওফায়াতুল আয়ান, ইবনে খাল্লিকান /৫/১১৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১২৮; তাহযীবুত তাহযীব ৭/৬০৬

জন্য বসতেন। তখন তিনিই মুযাকারার জন্য হাদীস নির্বাচন করতেন। তাঁর থেকে অগ্রগামী হতে পারতেন না কেউই।[৪০৪]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন–

هَاهُنَا رَجُلٌ خَلَقَهُ اللهُ لِهَذَا الشَّأْنِ، يُظْهِرُ كَذِبَ الْكَذَّابِيْنَ -يَعْنِي: ابْنَ مَعِيْنٍ-.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-কে সৃষ্টিই করেছেন হাদীসশাস্ত্রের জন্য, যেন মিথ্যুকদের জালিয়াতি প্রকাশ করেন।[৪০৫]

সায়্যেদ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর কাত্তানী রহ. (১৩৪৫ হিজরী) লেখেন–

سَيِّدُ الْحُفَّاظِ وَمَلِكُهُمْ وَإِمَامُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ.

তিনি হাফেযুল হাদীসগণের সর্দার, বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের সম্রাট এবং ইলমুল জারহ ওয়াততাদীলের ইমাম।[৪০৬]

আশ্চর্য হলেও বাস্তবতা হলো– হাদীসের জগতের এই মহান সম্রাটও নিজে নিজে ইজতিহাদ করতেন না; বরং মাযহাবের আলোকে আমল করতেন এবং আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন–

قَدْ كَانَ أَبُوْ زَكَرِيَا -ابْنُ مَعِيْنٍ- حَنَفِيًّا فِي الْفِقْهِ.

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৪০৭]

---

৪০৪. আল-মুলিম বিশুয়ূখিল বুখারী ওয়া মুসলিম, পৃ. ৫৭৭; ইকমালু তাহযীবুল কামাল ১২/৩৬৬

৪০৫. তারীখে বাগদাদ ১৬/২৬৩; তারীখে দিমাশক ৬৫/২৪; আল-আনসাব, সামআনী ১২/২১৬; তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ২/১৫৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৮০

৪০৬. আররিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ১২৯

৪০৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৩৩

হাফেয যাহাবী রহ. আরও বলেন–

قَدْ كَانَ أَبُو زَكَرِيَّا -رَحِمَهُ اللهُ- حَنَفِيًّا فِي الفُرُوْعِ

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে হানাফী ছিলেন।[৪০৮]

অন্যত্র হাফেয যাহাবী রহ. বলেছেন–

إِنَّ ابْنَ مَعِيْنٍ كَانَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ الْغُلَاةِ فِيْ مَذْهَبِهِ.

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ছিলেন দৃঢ়চেতা হানাফী।[৪০৯]

১৫. ইমাম আবু জাফর তহাবী রহ. (২৩৯-৩২১ হিজরী)

হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রে যাদের সমান গভীরতা ও পারদর্শিতা ছিল, তাঁদের অন্যতম ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা তহাবী রহ.। সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হিজরী) বলেন, তাঁর সময়ে যেসব মুহাদ্দিস 'সহীহ' বা 'সুনান' শিরোনামে হাদীসের কিতাব লিখেছেন, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম আহরণের ক্ষেত্রে তহাবী রহ. ছিলেন তাঁদের সবার চেয়ে বিজ্ঞ। নীতি ও ইনসাফ আছে এমন কেউ এতে সন্দেহ করবে না। আর হাদীসশাস্ত্র, এটা তো স্পষ্টই যে, এতে ছিলেন তিনি ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ.-এর মতো মহান শক্তিশালী ইমাম।[৪১০]

হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থসমূহই তাঁর অগাধ জ্ঞানের সাক্ষী। বিশেষভাবে তাঁর 'শারহু মুশকিলিল আছার' কিতাবটি উল্লেখযোগ্য। এ কিতাবের বিষয়বস্তু হলো বাহ্যিক বৈপরীত্যপূর্ণ হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় বিধান। ইমাম যাহেদ কাউছারী রহ. বলেন–

هُوَ كِتَابٌ لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ فِي هٰذَا الْبَابِ، قَدِيْمًا وَلَا حَدِيْثًا.

এটি আপন বিষয়ে এমন গ্রন্থ, যার মতো কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি; অতীতেও না, বর্তমানেও না।[৪১১]

৪০৮.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৮৮

৪০৯.মারিফাতুর রুওয়াতিল মুতাকাল্লামি ফীহিম, পৃ. ৪৯; ফিকহু আহলিল ইরাক, পৃ. ১৯১

৪১০.আল-হাবী ফী সীরাতিল ইমাম আবী জাফর তহাবী, পৃ. ৫১

৪১১.যুয়ূলু তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, (মুকাদ্দিমা), পৃ. ১৯৫; আসারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ১৬৫

ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ.-কে মুহাদ্দিসগণ 'ইমামুল আইম্মাহ' তথা 'মুহাদ্দিসকুল শিরমণি' উপাধি দান করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জের বিবরণে একটি রিসালা (পুস্তিকা) লিখেছেন। এ রিসালার পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশ বা কিছু কমবেশি হবে। একই বিষয়ের আলোচনার জন্য ইমাম তহাবী রহ. যে কিতাব লিখেছেন এর 'ওরাকা' হাজারের অধিক। অর্থাৎ এর পৃষ্ঠা প্রায় সহীহ বুখারীর সমান।[৪১২]

শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ ফকীহ কাযী আবুল হাসান সানজানী রহ. ইবনে খুযাইমা রহ.-এর হজ্জ সম্পর্কিত পুস্তিকাটি দেখে মন্তব্য করেছেন—

> نَظَرْتُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، فَتَيَقَّنْتُ أَنَّهُ عِلْمٌ لَا نُحْسِنُهُ نَحْنُ.
>
> ইবনে খুযাইমা রহ.-এর রিসালা দেখে আমার একীন হয়েছে যে, এ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব না।[৪১৩]

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু) বলেন, আবুল হাসান সানজানী যদি ইবনে খুযাইমার সমসাময়িক মুহাদ্দিস ইমাম তহাবী রহ.-এর কিতাব দেখতেন (যা ইবনে খুযাইমা রহ.-এর কিতাব থেকে কয়েক গুণ বড়) তাহলে তিনি কী বলতেন?[৪১৪]

হাফেয সুয়ূতী রহ. বলেন—

> وَكَانَ ثِقَةً، ثَبْتًا، فَقِيهًا، لَمْ يَخْلُفْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

তহাবী রহ. ছিলেন হাদীসের ক্ষেত্রে সিকাহ, শক্তিশালী এবং ফকীহ। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর মতো কোনো আলেম ছিলেন না।[৪১৫]

---

৪১২. দ্রষ্টব্য : ইকমালুল মু'লিম ৪/২৩৩; শরহে মুসলিম, নববী ৮/১৩৬; আসারুল হাদীসিস শরীফ, পৃ. ১৬৩, ১৬৪

৪১৩. মারিফাতু উলূমিল হাদীস, হাকেম, পৃ. ৮৩

৪১৪. আসারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ১৬৩

৪১৫. হুসনুল মুহাযারাহ ফী আখবারি মিছরি ওয়ালকাহিরাহ ১/২৬৯; আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যা ১/১৩৯

এই মহান আহলে হাদীস ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসারে আমল করতেন, তা সকলেরই জানা।

জেনে রাখা ভালো

এখানে যেসব ইমামের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম তহাবী রহ. ব্যতীত সবাই হলেন সিহাহ সিত্তার রচয়িতা তথা ইমাম বুখারী রহ., মুসলিম রহ., তিরমিযী রহ., আবু দাউদ রহ., নাসায়ী রহ. ও ইবনে মাজাহ রহ.-এর আগের ইমাম। এসব ইমাম হলেন সিহাহ সিত্তার রচয়িতাগণের উস্তায, দাদা উস্তায বা আরও ঊর্ধ্বতন পুরুষ, যাঁদের থেকে তাঁরা হাদীসশাস্ত্র অর্জন করেছেন।

দুটি শিক্ষা

এক. তাকলীদ করে, ইমামের ব্যাখ্যা অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা নিন্দনীয় নয়; নন্দিত। অন্যথায় এই সব মহান মুহাদ্দিস তাকলীদ করতেন না।

দুই. হাদীসশাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমামগণ আবু হানীফার তাকলীদ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, সাধারণ আলেম ও সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা অতি জরুরি।

দুটি আরয

সালাফী ভাইদের কাছে দুটি আরয :

এক. এসব ইমাম যদি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করতে পারেন, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কীভাবে আমল করবে? তাদের মতো মহান ইমামগণের মাযহাব অনুসারে আমল করা কি প্রমাণ করে না যে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব অনুসরণ করে আমল করা শুধু জায়েযই নয়; বরং অপরিহার্য?

সালাফী আলেমদের খেদমতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানতে চাই তা হলো– যে আবু হানীফা রহ.-কে শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ., সুফিয়ান ছাওরী রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ., ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ. ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. -এর মতো হাদীসশাস্ত্রের সম্রাটগণ নিজেদের ইমামরূপে বরণ করেছেন, সে-ই আবু হানীফা রহ.-এর সমালোচনা করা, তাঁর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মাঝে বৈরি মনোভাব তৈরির অপচেষ্টা করার অধিকার কি কারও আছে? আর এমন কাজ যে করবে, তা তার ইলমী ও ঈমানী যিন্দেগিতে তারাক্কি ও উন্নতি দান করবে নাকি অবনতি ও ধ্বংস ডেকে আনবে—তা নিয়ে একটু ভাবলে কি ভালো হতো না?

* * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যুগে যুগে মাযহাবের অনুসারী

কতিপয় বরিত আহলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি

উপরে যেভাবে মাযহাবের অনুসারী কিছু ইমামের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবে তাকলীদকারী বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের নাম ও সামান্য পরিচিত উল্লেখ করলেও আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কারণ, প্রত্যেক মাযহাবেই সেই মাযহাবের আলেমগণের পরিচয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেখান থেকে মুহাদ্দিসগণের আলোচনা উপস্থাপন করলে বহু খণ্ডের কিতাব রচিত হয়ে যাবে। তাই এখানে প্রসিদ্ধ কিছু আহলে হাদীস মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকের মাযহারেব শুধু নিসবত পেশ করা হচ্ছে :

১. হাফস ইবনে গিয়াছ নাখায়ী হানাফী রহ. (১৯৪ হিজরী)

২. আবু ইসহাক ইবরাহীম হারবী শাফেয়ী রহ. (২৮৫ হিজরী)

৩. ইবরাহীম ইবনে মাকিল নাসাফী হানাফী রহ. (২৯৫ হিজরী)

৪. আবু ইয়ালা মাউছীলী হানাফী রহ. (৩০৭ হিজরী)

৫. আবু বিশর দূলাবী হানাফী রহ. (৩১০ হিজরী)

৬. আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু বকর খাল্লাল হাম্বলী রহ. (৩১১ হিজরী)

৭. আবু আওয়ানা ইসফারাঈনী শাফেয়ী রহ. (৩১৬ হিজরী)

৮. হাফেয জিআবী হানাফী রহ. (৩৫৫ হিজরী)

৯. আবু বকর জাস্‌সাস হানাফী রহ. (৩৭০ হিজরী)

১০. আবু আহমাদ হাকেমে কাবীর নিশাপুরী শাফেয়ী রহ. (৩৭৮ হিজরী)

১১. আবুল আব্বাস মুসতাগফিরী হানাফী রহ. (৪৩২ হিজরী)

১২. আবু বকর বায়হাকী শাফেয়ী রহ. (৪৫৮ হিজরী)

১৩. আবুল ওয়ালিদ বাজী মালেকী রহ. (৪৭৪ হিজরী)

১৪. আলী ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আলী আবু নছর ইবনে মাকূলা হানাফী রহ. (৪৭৫ হিজরী)

১৫. ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক জুওয়াইনী শাফেয়ী রহ. (৪৭৮ হিজরী)

১৬. আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী রহ. (৫৪৩ হিজরী)

১৭. আবু সা'দ আবদুল কারীম সামআনী শাফেয়ী রহ. (৫৬২ হিজরী)

১৮. আবদুল হক ইশবীলী মালেকী রহ. (৫৮১ হিজরী)

১৯. আবু তাহের ইবনুল আনমাতী শাফেয়ী রহ. (৬১৯ হিজরী)

২০. মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবনে কুদামা মাকদীসী হাম্বলী রহ. (৬২০ হিজরী)

২১. আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ফাসী মালেকী রহ. (৬২৮ হিজরী)

২২. আবু বকর ইবনে নুকতা হাম্বলী রহ. (৬২৯ হিজরী)

২৩. আবু আবদুল্লাহ ইবনুদ দুবায়সী শাফেয়ী রহ. (৬৩৭ হিজরী)

২৪. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ছারীফিনী হাম্বলী রহ. (৬৪১ হিজরী)

২৫. আবু আমর ইবনুছ ছালাহ শাফেয়ী রহ. (৬৪৩ হিজরী)

২৬. আবুল হাজ্জাজ ইবনে খলীল হালাবী হাম্বলী রহ. (৬৪৮ হিজরী)

২৭. রশীদুদ্দীন আত্তার আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া মালেকী রহ. (৬৬২ হিজরী)

২৮. যাকিউদ্দীন আবদুল আযীম মুনযীরী শাফেয়ী রহ. (৬৫৬ হিজরী)

২৯. আবুল কাসেম ইবনুল আদীম উমর ইবনে আহমদ হানাফী রহ. (৬৬০ হিজরী)

৩০. আবু শামা আবুদর রহমান মাকদীসী শাফেয়ী রহ. (৬৬৫ হিজরী)

৩১. মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া নববী শাফেয়ী রহ. (৬৭৬ হিজরী)

৩২. আবুল আব্বাস ইবনুয যাহেরী আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ হানাফী রহ. (৬৯৬ হিজরী)

৩৩. আবুল আব্বাস ইশবীলী আহমদ ইবনে ফারাহ শাফেয়ী রহ. (৬৯৯ হিজরী)

৩৪. ইবনে দাকীকুল ঈদ মালেকী ছুম্মাশ শাফেয়ী রহ. (৭০২ হিজরী)

৩৫. আবদুল মুমিন দিময়াতী শাফেয়ী রহ. (৭০৫ হিজরী)

৩৬. সা'দুদ্দীন হারেসী আবু মুহাম্মাদ মাসউদ ইবনে আহমাদ হাম্বলী রহ. (৭১১ হিজরী)

৩৭. ছফীউদ্দীন কারাফী শাফেয়ী রহ. (৭২৩ হিজরী)

৩৮. আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া আহমাদ ইবনে আবদুর হালীম হাম্বলী রহ. (৭২৮ হিজরী)

৩৯. ইবনে সায়্যিদুন্নাস শাফেয়ী রহ. (৭৩৪ হিজরী)

৪০. আবুল হাজ্জাজ মিয্যী শাফেয়ী রহ. (৭৪২ হিজরী)

৪১. ইবনে আবদুল হাদী হাম্বলী রহ. (৭৪৪ হিজরী)

৪২. শামসুদ্দীন যাহাবী শাফেয়ী রহ. (৭৪৮ হিজরী)

৪৩. আলাউদ্দীন তুরকমানী হানাফী রহ. (৭৪৪ হিজরী)

৪৪. সিরাজুদ্দীর আবু হাফস কাযবীনী হানাফী রহ. (৭৫০ হিজরী)

৪৫. আবু আবদুল্লাহ ইবনুল কাইয়িম হাম্বলী রহ. (৭৫১ হিজরী)

৪৬. তকিউদ্দীন সুবকী আলী ইবনে আবদুল কাফী শাফেয়ী রহ. (৭৫৬ হিজরী)

৪৭. ছালাহুদ্দীন আলাঈ শাফেয়ী রহ. (৭৬১ হিজরী)

৪৮. জামালুদ্দীন ইউসুফ যায়লায়ী হানাফী রহ. (৭৬২ হিজরী)

৪৯. আলাউদ্দীন মুগলাতাই হানাফী রহ. (৭৬২ হিজরী)

৫০. আবুল মাহাসিন হুসাইনী মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাফেয়ী রহ. (৭৬৫ হিজরী)

৫১. তাজুদ্দীন সুবকী শাফেয়ী রহ. (৭৭১ হিজরী)
৫২. তাকীউদ্দীন ইবনে রাফে' শাফেয়ী রহ. (৭৭৪ হিজরী)
৫৩. ইমামুদ্দীন ইবনে কাছীর শাফেয়ী রহ. (৭৭৪ হিজরী)
৫৪. আবদুল কাদের কুরাশী হানাফী রহ. (৭৭৫ হিজরী)
৫৫. ইবনে রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫ হিজরী)
৫৬. আবুল বারাকাত ইয্‌যুদ্দীন আহমাদ ইবনে ইবরাহীম হাম্বলী রহ. (৮৭৬ হিজরী)
৫৭. সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন শাফেয়ী রহ. (৮০৪ হিজরী)
৫৮. যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইরাকী শাফেয়ী রহ. (৮০৬ হিজরী)
৫৯. নুরুদ্দীন হায়ছামী শাফেয়ী রহ. (৮০৭ হিজরী)
৬০. অলীউদ্দীন ইবনুল ইরাকী শাফেয়ী রহ. (৮২৬ হিজরী)
৬১. তাকীউদ্দীন ফাসী মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ মালেকী রহ. (৮৩২ হিজরী)
৬২. শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাফেয়ী রহ. (৮৩৩ হিজরী)
৬৩. বুরহানুদ্দীন হালাবী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ শাফেয়ী রহ. (৮৪১ হিজরী)
৬৪. ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী রহ. (৮৫২ হিজরী)
৬৫. বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহ. (৮৫৫ হিজরী)
৬৬. ইবনুল হুমাম হানাফী রহ. (৮৬১ হিজরী)
৬৭. তাকীউদ্দীন শুমুন্নী হানাফী রহ. (৮৭২ হিজরী)
৬৮. কাসেম ইবনে কতলূবুগা হানাফী রহ. (৮৭৯ হিজরী)
৬৯. শামসুদ্দীন সাখাবী শাফেয়ী রহ. (৯০২ হিজরী)
৭০. জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী রহ. (৯১১ হিজরী)
৭১. আলী আলমুত্তাকী হিন্দী ছুম্মাল মাদানী ওয়ালমাক্কী হানাফী রহ. (৯৭৫ হিজরী)

৭২. মুহাম্মাদ ইবনে তাহের পাটনী হানাফী রহ. (৯৭৬ হিজরী)

৭৩. মোল্লা আলী কারী হানাফী রহ. (১০১৪ হিজরী)

৭৪. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী হানাফী (১০৫২ হিজরী)

৭৫. আবুল হাসান মুহাম্মাদ সাদেক সিন্দী মাদানী হানাফী রহ. (১১৩৮ হিজরী)

৭৬. মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী আলমাদানী হানাফী রহ. (১১৬৩ হিজরী)

৭৭. ইবনে হিম্মাত দামেশকী হানাফী (১১৭৫ হিজরী)

৭৮. ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী হানাফী রহ. (১১৭৬ হিজরী)

৭৯. আবদুল হাই লখ্নোবী হানাফী রহ. (১৩০৪ হিজরী)

৮০. মোল্লা আবেদ সিন্দী হানাফী রহ. (১২৭৫ হিজরী)

এখানে খুব স্বল্প সংখ্যক ইমামগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় যদি চার মাযহাবের ইমামগণের শুধু নামের তালিকা পেশ করা হয়, তাহলে বিশাল কলেবরের কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। গাইরে মুকাল্লিদ আলেম ছিদ্দীক হাসান খান রহ. বলেন–

> قَالَ فِي الْمَدِينَةِ: إِنَّ الأَئِمَّةَ الْحَنَفِيَّةَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصٰى؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ طَبَّقُوا أَكْثَرَ الْمَعْمُوْرَةِ حَتَّى قِيْلَ: إِنَّ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- سَبْعُمِائَةٍ وَثَلَاثِيْنَ رَجُلًا مِنْ تَلَامِذَتِهِ. وَهٰذَا مَا عُرِفَ مِنْهُمْ. وَمَا لَمْ يُعْرَفْ فَأَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ.

মদীনাতুল উলূম কিতাবের লেখক বলেছেন, হানাফী ইমামগণের সংখ্যা গণে শেষ করা যাবে না। কেননা, দুনিয়ার অধিকাংশ ভূমিতে তারাই ছড়িয়ে আছেন। এমনকি বলা হয়েছে, আবু হানীফা রহ.-এর সোহবতপ্রাপ্ত ইমামগণের সংখ্যা হলো ৭৩০ জন। এই সংখ্যা তো হলো তাদের, যাদের পরিচয় জানা গেছে। অন্যথায় যাদের নাম জানা যায়নি তাদের পরিমাণ তো আরও বেশি।[৪১৬]

---

৪১৬. আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৩৯

এরপর ছিদ্দীক হাসান খান রহ. বলেন–

> وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِقْصَاءَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَتَصَانِيْفِهِمْ خَارِجٌ عَنْ طَوْقِ هٰذَا الْمُخْتَصَرِ.
>
> হানাফী ইমামগণের সকলের নাম এবং তাদের কিতাবের তালিকা পেশ করা এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে সম্ভব নয়।[৪১৭]

তদ্রূপ, অন্য তিন মাযহাবের ইমামগণের সংখ্যাও অগণিত, অসংখ্য। তাদের সকলের শুধু নাম পেশ করতেই বিশাল আয়তনের কিতাবের প্রয়োজন।

এখানে যাঁদের নাম পেশ করা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকই হাদীসের বিজ্ঞ ইমাম, সত্যিকার অর্থের আহলে হাদীস, যাঁদের মাধ্যমে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ পেয়েছি। তাঁরা মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন। তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ.ও মাযহাব অনুসরণ করতেন

'ইবনে তাইমিয়া রহ.' ও 'ইবনুল কাইয়িম রহ.' সালাফী ভাইদের খুবই প্রিয় নাম, 'আপন' মানুষ। কিন্ত তাঁরাও মাযহাব মানতেন, ইমাম আহমদ রহ.-এর তাকলীদ করতেন। তাঁদের কিতাবসমূহ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। শায়েখ ছালেহ ইবনে ফাওযান লেখেন–

> هَاهُمُ الْأَئِمَّةُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ الْكِبَارِ كَانُوْا مَذْهَبِيِّيْنَ: فَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَ ابْنُ الْقَيِّمِ كَانَا حَنْبَلِيَّيْنِ، ...
>
> বড় বড় হাদীসবিশারদ ইমামগণ মাযহাব অনুসরণ করতেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ. ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।...[৪১৮]

---

৪১৭. প্রাগুক্ত

৪১৮. ইয়ানাতুল মুস্তাফীদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ ১/১২

একই কথা বলেছেন সৌদি আরবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম সালাফী আলেমগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব শায়েখ উসাইমীন রহ. (১৪২১ হিজরী)।[৪১৯]

মোটকথা, প্রখ্যাত আহলে হাদীস ইমামগণ কোনো না কোনো মাযহাব অনুসরণ করেই কুরআন-সুন্নাহর বিধান পালন করতেন, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসার এবং শির্ক ও বিদআতের মূলোৎপাটনে নিজেদের যিন্দেগি ওয়াকফ করেছিলেন এবং যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর বদৌলতে আজ আমরা কুরআন-সুন্নাহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত পেয়েছি।

তাদের কাছে একটি প্রশ্ন

সালাফী আলেমদের কাছে আমাদের প্রশ্ন– যাঁদের মাধ্যমে আমরা কুরআন-হাদীস যথাযথভাবে পেয়েছি, মাযহাব অনুসরণ করে তাঁরাই কি সারা জীবন শিরক ও বিদআতের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিলেন?

❋ ❋ ❋

৪১৯. দ্রষ্টব্য : মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়ারাসাইলিল উসাইমীন ২৬/২৮৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের লেখকগণ ও তাঁদের মাযহাব

হাদীসের ময়দানে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব হলো ছয়টি : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ। এগুলো 'কুতুবে সিত্তা', 'উছূলে সিত্তা' ও 'সিহাহ সিত্তা' নামে সুপরিচিত। এই কিতাবসমূহের সংকলকদের কেউই গাইরে মুকাল্লিদ বা মাযহাবের বিরোধী ছিলেন না; বরং কোনো না কোনো মাযহাব মানতেন বা মাযহাবের ব্যাখ্যার আলোকে যারা আমল করে, তাদের সমর্থন করতেন। তবে কে কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন সে সম্পর্কে পরবর্তী ইমামগণের মতভেদ হয়েছে। এখানে ইমামগণের উদ্ধৃতিতে কুতুবে ছিত্তার লেখকগণের মাযহাবের বিবরণ পেশ করা হলো।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. (১৯৪ হিজরী-২৫৬ হিজরী)

কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, ইমাম বুখারী রহ. ছিলেন আবু হানীফা রহ., মালেক রহ., শাফেয়ী রহ. ও আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতো মুজতাহিদে মুতলাক, স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ। তিনি কারও তাকলীদ করতেন না; নিজেই ইজতিহাদ করে সে অনুযায়ী আমল করতেন।

কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.-এর ব্যাপারে এই দাবি অনেক আলেম খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন, তিনি মুজতাহিদ ছিলেন না। কোনো মাযহাব অনুসারে আমল করতেন। এই মতের প্রবক্তাদের মৌলিক দলীল দুটি।

অনেকের মতে ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ ছিলেন না : দুটি দলীল

এক. ইমাম বুখারী রহ. যদি মুজতাহিদ হতেন, উলামায়ে কেরাম মাসআলা-মাসায়েলের বিবরণ দিতে গিয়ে যখন অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের মত উল্লেখ করেন, তখন সেখানে নিজের মতও উল্লেখ করতেন, বিশেষ করে মতবিরোধপূর্ণ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে।

তেমনি মুজতাহিদগণের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের বিবরণ প্রদানের জন্য অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। এসব কিতাবে প্রত্যেক মতের প্রবক্তা মুজতাহিদ ইমামগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও ইমাম বুখারী রহ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অথচ, সেখানে গুমনাম ও অপ্রসিদ্ধ অনেক ইমামের মাযহাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ হলে অবশ্যই তাঁর মতো বিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ ইমামের মাযহাবের বর্ণনা বাদ দেওয়া হতো না।

তদ্রূপ, হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থগুলোতে এবং চার মাযহাবের প্রত্যেক মাযহাবের ফিকহী বড় বড় কিতাবসমূহে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদের বিবরণ এসেছে। সেই বিবরণেও দেখা যায়, প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমামগণের পাশাপাশি এমনও অনেক ইমামের মাযহাব উল্লেখ করা হয়, যাদের নাম শুধু কিতাবের শোভা বর্ধন করছে, মানুষের জীবনের পাতায় তথা আমল ও আলোচনার মধ্যে সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সেখানেও ইমাম বুখারী রহ.-এর মাযহার ও রায়ের কোনো বর্ণনা নেই। তিনি যদি মুজতাহিদ হতেন, নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করতেন, তাহলে এখতেলাফী বিধানাবলির বিবরণ পেশ করার সময় অপরাপর ইমামগণের পাশাপাশি তাঁর মাযহাবের বিবরণ অবশ্যই আসত। কিন্তু কোথায়! তাঁর মত ও মাযহাবের কোনো বর্ণনা তো কোথাও নেই!

এমনকি ইমাম তিরমিযী রহ., যিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য, তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব সুনানে তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ.সহ অনেক এমন ইমামের মত ও রায় উল্লেখ করেছেন, যাদের মাযহাবের তেমন পরিচিতি নেই; কিন্তু তিনিও

সেই কিতাবে আপন উস্তায ইমাম বুখারী রহ.-এর মত ও ফিকহ উল্লেখ করেননি। এতে স্পষ্ট যে, ইমাম তিরমিযী রহ.-এর দৃষ্টিতেও তাঁর উস্তায ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ ছিলেন না। যদি মুজতাহিদ হতেন, তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিটি পরিচ্ছেদেই বুখারী রহ.-এর মত উল্লেখ করতেন।

দুই. ইজতিহাদের অনেক উছূল-কাওয়ায়েদ এবং নিয়মনীতি আছে। একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদ করার সময় সেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. অনেক এমন ধরনের দলীল পেশ করেন, যা ইজতিহাদের নীতির সাথে মিলে না। মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ নুমানী রহ. বলেন, তুমি যদি ইমাম বুখারীর কিতাব সহীহ বুখারী গবেষণা করে অধ্যয়ন কর, তাহলে তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাঁর অধিকাংশ ইজতিহাদ মুজতাহিদ ইমামগণের উছূল অনুযায়ী হয় না। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেছেন, ইমাম বুখারী রহ.-এর দলীলাদির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের এমন দলীল আছে, মুজতাহিদগণ যা গ্রহণ করেন না।[৪২০]

ইমাম বুখারী রহ.-এর মাযহাব

যাই হোক, অনেক ইমামের মতে ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ ছিলেন না। তাঁদের দাবির পক্ষে শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান। এখন জানার বিষয়, তাহলে তিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করতেন। তো এ সম্পর্কেও স্পষ্ট কোনো দলীল নেই। তাই বিষয়টিতে একাধিক মত পাওয়া যায়।

ইবনে আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ. ও ইবনুল কায়্যিম রহ. ইমাম বুখারী রহ.-কে হাম্বলী গণ্য করেছেন।[৪২১]

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. তাঁকে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হিসাবে গণ্য করেছেন।[৪২২]

৪২০.আল-ইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, পৃ. ১৩০
৪২১.দ্রষ্টব্য : তবাকাতুল হানাবিলা ১/২৫৪; ইলামুল মুআক্কিঈন ৩/১০৯-১১০
৪২২.দ্রষ্টব্য : তবাকাতুশ শাফিইয়্যা ২/২১২

প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান রহ.-এর মতেও ইমাম বুখারী রহ. ছিলেন ইমাম শাফেয়ী-এর অনুসারী।[৪২৩]

ইমাম বুখারী রহ. প্রথম জীবনে হানাফী ছিলেন

ইমাম বুখারী কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন সে এখতেলাফ হলো তাঁর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে। প্রথম জীবনে তিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ীই আমল করতেন। বুখারী রহ.-এর জন্মস্থান হলো বুখারা। এই শহরের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁবে বুখারী বলা হয়। বুখারা শহরের উলামায়ে কেরাম এবং ইমাম বুখারী রহ.-এর পরিবারের লোকজন ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম বুখারী রহ. প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান ও হাদীসের অনেক গ্রন্থ বুখারার হানাফী আলেমদের থেকেই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হাফস কাবীর আহমদ ইবনে হাফস রহ. ছিলেন তাঁর বিশেষ উস্তায। আবু হাফস কাবীর রহ. ছিলেন বুখারার সবচেয়ে বড় আলেম এবং বুখারার প্রতিটি গ্রামে ছিল তাঁর অসংখ্য শিষ্য-শাগরেদ। হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ এই আবু হাফস কাবীর রহ. থেকে ইমাম বুখারী রহ. হাদীস ও ফিকহের অনেক ইলম অর্জন করেছেন এবং আবু হাফসের ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ছিলেন ইমাম বুখারী রহ.-এর সহপাঠী ও সফরসঙ্গী।

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আবু হাতেম রহ. বলেন, আমার পিতা আবু হাতেমকে বলতে শুনেছি–

> كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي حَفْصٍ أَحْمَدَ بنِ حَفْصٍ البُخَارِيِّ ـوَهُوَ صَغِيْرٌـ، فَسَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ يَقُوْلُ: هَذَا شَابٌّ كَيِّسٌ، أَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ لَهُ صِيتٌ وَذِكْرٌ.
>
> মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (ইমাম বুখারী রহ.) বাল্যকালে আবু হাফস আহমাদ ইবনে হাফস বুখারীর নিকট আসা-যাওয়া করতেন। একদিন শুনেছি, আবু হাফস রহ. বলেছেন,

---

৪২৩.আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৪০

> এই যুবকটি বুদ্ধিমান। আশা করি, তার অনেক সুনাম, সুখ্যাতি হবে।[৪২৪]

মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ নুমানী রহ. এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আবু হাফস রহ.-এর জীবনী আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বুখারার প্রত্যেকটা গ্রাম আবু হাফস কাবীরের শিষ্য-শাগরেদদের দ্বারা মুখরিত ছিল। ইমাম সামআনী রহ. লিখেছেন, বুখারার শুধু খারাজারী গ্রামেই তাঁর এত বিপুল পরিমাণ ছাত্র ছিল, যা গনে শেষ করা যাবে না।

আবু হাফস কাবীর রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে ফিকহ অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'য় তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে হাফস রহ.-এর জীবনী আলোচনা করতে দিয়ে লেখেন–

> وَكَانَ أَبُوْهُ مِنْ كِبَارِ تَلَامِذَةِ مُحَمَّد بن الحَسَنِ، انْتَهَت إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْأَصْحَابِ بِبُخَارَى.
>
> তাঁর পিতা আবু হাফস রহ. ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য এবং তিনি ছিলেন বুখারায় হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম।

এই মহান ইমাম এবং ইমাম বুখারী রহ.-এর পিতা ইসমাঈল রহ.-এর মধ্যে ছিল খুব নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক। ইসমাঈল রহ.-এর যখন ইন্তেকাল হয়, তখন আবু হাফস রহ. তাঁর শিয়রেই ছিলেন। ...

তাঁদের মধ্যকার এই সম্পর্ক ইমাম বুখারী রহ.-এর পিতার ইন্তেকালের পরও উভয় পরিবারের মধ্যে পূর্বের মতোই প্রাণবন্ত ছিল। এমনকি আবু হাফস রহ.-এর ছেলে আর ইমাম বুখারী রহ. দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠী ছিলেন, তলবে হাদীসের জন্য একসাথে তারা সফর করতেন।

---

৪২৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১২/৪২৫-৪২৬

হাফেয ইবনে হাজার রহ. আবু হাফস কাবীর রহ.-কে ইমাম বুখারী রহ.-এর শায়েখদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৪২৫]

পারিবারিক সূত্রের ভিত্তিতে শুরু জীবনে ইমাম বুখারী রহ.-এর হৃদয়ে ছিল ফিকহে হানাফীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই অল্প বয়সেই তিনি হানাফীদের কিতাবাদি মুখস্থ করে নেন। তাঁর নিজেরই বক্তব্য–

لَمَّا طَعَنْتُ فِي سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً حَفِظْتُ كُتُبَ ابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيْعٍ، وَعَرَفْتُ كَلَام هٰؤُلَاءِ –يَعْنِي أَصْحَابَ الرَّأْيِ–.

আমার বয়স যখন মাত্র ষোলো তখনই (হানাফী আলেম) আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ও ওয়াকী ইবনে জাররাহ রহ.-এর কিতাবসমূহ মুখস্থ করে ফেলি এবং **আছহাবুর রায় তথা হানাফীদের মাযহাব সম্পর্কে অবগতি লাভ করি।**[৪২৬]

ইমাম বুখারী রহ.-এর বক্তব্যে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো, ষোলো বছর বয়সে তিনি হানাফী মাযহাবের বিধি-বিধান যেমন জ্ঞাত হয়েছেন, তেমনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ও ওয়াকী ইবনে জাররাহ রহ.-এর কিতাবাগুলোও মুখস্থ করেছেন। আর এঁরা দু'জনই হলেন হানাফী ইমাম। এঁদের কিতাবাদিতে, বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের গ্রন্থাবলিতে ছিল হানাফী ফিকহ ও মাযহাবের বিবরণ। এ দুই ইমামের কিতাবাদি মুখস্থ করার অর্থও হলো হানাফীদের কিতাব, হানাফীদের ফিকহ ও বক্তব্য মুখস্থ করা।

মোটকথা, বুখারা শহরে ছিল হানাফী মাযহাবের ব্যাপক প্রচলন। হানাফীদের শীর্ষস্থানীয় আলেমের সাথে ইমাম বুখারী রহ.-এর পরিবারের ছিল প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। ইমাম বুখারী রহ. নিজে হানাফীদের বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবু হাফস কাবীর রহ. থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। হানাফী আলেমের সাথে ইলমের জন্য সফর করেন। হানাফীদের কিতাবাদি পাঠ করেন এবং হানাফী মাযহাবের মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, জীবনের শুরুতে

৪২৫ ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ১৮৫-১৮৬

৪২৬. মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, পৃ. ৫০২

হানাফী মাযহাব অনুযায়ীই আমল করবেন, যা তাঁর পরিবার, তাঁর উস্তায, তাঁর সফরসঙ্গী ও তাঁর শহর বুখারার মাহযাব।[৪২৭]

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম কুশাইরী রহ. (২০৪-২৬১ হিজরী)

ইবনে আবু ইয়ালা রহ. ও ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন, মুসলিম রহ. ছিলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী।[৪২৮]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ., আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ও গাইরে মুকাল্লিদ আলেম ছিদ্দীক হাসান খান রহ.-এর মতে মুসলিম রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী।[৪২৯]

---

৪২৭. ইমাম যাহেদ কাওছারী রহ. বলেন, আবু হাফস কাবীর রহ. ছিলেন উচুঁমাপের ইমাম। তিনি বুখারা শহরে প্রচুর ইলম বহন করে এনেছেন এবং ইলমের প্রচার করেছেন। এমনকি তাঁর চেষ্টার বরকতে বুখারা শহর উন্নীত হয়েছে ইসলামের মিনাররূপে। বুখারাবাসী তাঁর নিকট সুফিয়ান ছাওরীর 'আলজামে' এবং ইবনুল মুবারক রহ. ও ওয়াকী রহ.-এর কিতাবসমূহ গ্রহণ করেছেন। তাঁর থেকে ফিকহ ও মাযহাবের জ্ঞান অর্জন করেছেন। ফলে বুখারা প্রতিটি গ্রামে পয়দা হয়েছে তাঁর ফকীহ শিষ্যদের এক জামাত।
আবু হাফস রহ. ইমাম বুখারী রহ.-এর প্রাথমিক উস্তাযগণের অন্যতম। জীবনের শুরুতে ইলমের জন্য সফর শুরু করার আগে তাঁর থেকেই ইলম অর্জন করেছেন। তারীখে বাগদাদে আছে, ইমাম বুখারী রহ. ষোলো বছর বয়সে ইবনুল মুবারক রহ. ও ওয়াকী ইবনুল জাররাহ. রহ.-এর কিতাবসমূহ মুখস্থ করেছেন।
তারীখে বাগদাদে আরও আছে যে, ইমাম বুখারী রহ. আবু হাফস কাবীর রহ.-এর নিকট সুফিয়ান ছাওরীর 'আলজামে' গ্রন্থটি পড়েছেন। –হুসনুত তাকাযী ফী সীরাতিল ইমামি আবী ইউসুফ আলকাযী, পৃ. ১৯৪-১৯৫
মোটকথা, এভাবে ইমাম বুখারী রহ. প্রথম জীবনে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী আমল করতে থাকেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি হানাফীদের উপর নারায হয়ে পড়েন এবং ফিকহে হানাফী থেকে বিমুখ হয়ে যান। কেন, কী কারণে এমন হয়েছে? উলামায়ে কেরাম এর একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। সে সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করার জন্য দেখতে পারেন– কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, (আবদুল ফাত্তাহ রহ.-এর টীকাসহ) পৃ. ৩৮০-৩৮৪

৪২৮. দ্রষ্টব্য : তবাকাতুল হানাবিলা ১/৩৩৮; ইলামুল মুআক্কিঈন ৩/১০৯-১১০

৪২৯. দ্রষ্টব্য : আল-ইনসাফ ফী বয়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃ. ৮০; ফয়যুল বারী ১/৫৮; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহিস সিত্তাহ, পৃ. ১২৩

মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ নুমানী রহ. বলেন, ইতহাফুল আকাবির কিতাব থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে, মুসলিম রহ. ছিলেন মালেকী মাযহাবের ইমাম।[৪৩০]

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশ্‌আছ সিজিস্তানী রহ. (২০২-২৭৫ হিজরী)

তাজুদ্দীন সুবকী রহ. ও ছিদ্দীক হাসান খান রহ.-এর মতে আবু দাউদ রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।[৪৩১]

ইবনে আবু লায়লা রহ., ইবনে তাইমিয়া রহ., ইবনুল কায়্যিম রহ., শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ও আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর মতে আবু দাউদ রহ. ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।[৪৩২]

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা তিরমিযী রহ. (২১০-২৭৯ হিজরী)

ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, কোনো সন্দেহ নেই, ইমাম তিরমিযী রহ. ছিলেন শাফেয়ী।[৪৩৩]

কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেলহবী রহ.-এর মতে তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।[৪৩৪]

ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব নাসায়ী রহ. (২১৫-৩০৩ হিজরী)

তাজুদ্দীন সুবকী রহ., ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ও ছিদ্দীক হাসান খান রহ. তাঁকে শাফেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৪৩৫]

৪৩০.দ্রষ্টব্য : আল-ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, পৃ. ১২৪

৪৩১.দ্রষ্টব্য : তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ২/২৯৩; আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৪০

৪৩২.দ্রষ্টব্য : তবাকাতুল হানাবিলা ১/১৫৩; মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/৪০; ইলামুল মুআক্কিঈন ৩/১০৯-১১০; আল-ইনছাফ ফী বায়ানি সাবালিল ইখতিলাফ, পৃ. ৮০; ফয়যুল বারী ১/৫৮; আল-আরফুশ শাযী ১/৭০

৪৩৩.দ্রষ্টব্য : ফয়যুল বারী ১/৫৮; আল-আরফুশ শাযী ১/৭০

৪৩৪.দ্রষ্টব্য : আল-ইনছাফ ফী বায়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃ. ৮০

৪৩৫.দ্রষ্টব্য : তবাকাতুশ শাফিইয়্যা ৩/১৪; আল-ইনছাফ ফী বয়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃ. ৭৯-৮০; আবজাদুল উলূম, পৃ. ৬৪০

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর মতে তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ইমাম।[৪৩৬]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ কাযভীনী রহ. (২০৯-২৭৩)

ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হয়তো শাফেয়ী মাযহাবের মুহাদ্দিস।[৪৩৭]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, তিনি ছিলেন ইমাম আহমদ রহ.-এর অনুসারী।[৪৩৮]

মুহাক্কিক আবদুর রশীদ নুমানী রহ. বলেন, সঠিক হলো এই ছয় ইমামের কেউই চার মাযহাবের কারও অনুসারী ছিলেন না। হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ, যারা ছিলেন তাঁদের উস্তায, তাঁদের মাযহাব অনুসরণ করতেন। তবে, কোনো সন্দেহ নেই, এই ছয়জন ইমামের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ রহ. ইলমুল ফিকহ বেশি বুঝতেন।[৪৩৯]

মোটকথা, সিহাহ সিত্তা তথা হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মুছান্নিফগণের কেউই সালাফী, গাইরে মুকাল্লিদ বা বর্তমানের আহলে হাদীস ছিলেন না। তাঁরা মাযহাব অনুযায়ীই আমল করতেন। তবে কে কোন্ মাযহাবের আলেম ছিলেন তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। তাই এ সম্পর্কে পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আর তাদের কেউ মুজতাহিদ হলে ইজতিহাদ করে আমল করেছেন; কিন্তু যারা মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব অনুযায়ী দ্বীনের বিধি-বিধান পালন করতেন তাদেরকে নিন্দা করতেন না, সাধারণ মানুষকে ইমামের ব্যাখ্যা ও তাফসীর ছেড়ে নিজে নিজে ইজতিহাদ করার পরামর্শ দিতেন না।

* * *

৪৩৬.দ্রষ্টব্য : আল-আরফুশ শাযী ১/৭০; ফয়যুল বারী ১/৫৮

৪৩৭.দ্রষ্টব্য : আল-আরফুশ শাযী ১/৭০

৪৩৮.আল-ইনছাফ ফী বায়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃ. ৭৯-৮০

৪৩৯.দ্রষ্টব্য : আল-ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, পৃ. ১২৬-১২৯

নবম পরিচ্ছেদ

আরবের আলেমগণের মাযহাব অনুসরণ

গুটিকয়েক মাসআলায় আরবের আলেমদের সাথে সালাফী বন্ধুদের আমলের মিল আছে। এটা দিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেন যে, আরবের আলেমগণও তাদের মতো আমল করেন। সালাফী আলেমগণ এই প্রসিদ্ধ মাসআলাগুলো দেখিয়ে আম মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আরবের আলেমগণ গাইরে মুকাল্লিদ, মাযহাব মানেন না। সুতরাং এ দেশের উলামায়ে কেরাম যেভাবে আমল করেন তা ঠিক না।

অথচ হাতেগনা কয়েকটি মাসআলায় তাঁরা আরবের সাথে মিল থাকলেও বহু বিষয়ে তাদের আমল আরবের আলেমদের থেকে ভিন্ন।

এর চেয়েও বড় কথা হলো, আরবের আলেমগণের সাথে গাইরে মুকাল্লিদদের গোড়াতেই মিল নেই। উভয় শ্রেণির চেতনা ও আদর্শ বিপরীতমুখী। আরবের লোকেরা মাযহাব অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম আহমাদ রহ.-এর ব্যাখ্যা অনুসারে শরীআতের পাবন্দি করেন। তারা মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করেন না, সাধরণ মানুষকে সরাসরি কুরআন হাদীস গবেষণার দাওয়াত দেন না এবং অন্য ইমামের মাযহাব ও ব্যাখ্যা বর্জন করে নিজেদের ইজতিহাদ ও মাযহাব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন না। সালাফী আলেমদের অবস্থা ভিন্ন।

তারা মাযহাব মানেন না, সালাফের কোনো ইমামের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ করেন না; বরং নিজেরাই মুজতাহিদ সেজে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষ, যারা হাদীস কাকে বলে, তা-ও ভালো করে বলতে পারবে না, তাদেরকে মুজতাহিদ বনে নিজে নিজে কুরআন-হাদীস থেকে বিধানাবলি আহরণ করার নির্দেশ দেন বা কোনো সালাফী আলেমের নির্দেশনা ও মাযহাব অনুসরণ করার দাওয়াত দেন।

সুতরাং আরবের উলামায়ে কেরাম আর আহলে হাদীসের মধ্যে মূলেই বিস্তর ফারাক। উভয়ের পথ ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। হ্যাঁ, কিছু কিছু বিষয়ে সালাফী আলেমগণ হাম্বলী মাযহাবের রায় গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাই এসব ক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের আমল একধরনের মনে হয়। বস্তুত চেতনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে একে অপরের উল্টো মেরুতে অবস্থানরত।

যাই হোক, দু'একটা বিষয়ে গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে আরবের আলেমগণের মিল থাকার কারণে আরবের আলেমগণ মাযহাবের বিরোধী হয়ে যাননি। উলামায়ে আরবও মাযহাব অনুযায়ীই আমল করেন। তাঁদের অধিকাংশ হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করেন। অতএব আরবের আলেমগণ আর ওই বন্ধুদের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই; বরং উভয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। তাঁরা মাযহাব মানেন, এরা মাযহাব মানে না।

বরং নীতি ও মতাদর্শের দিক দিয়ে আমরা ও আরবের আলেমগণ এক, অভিন্ন। আমরাও মাযহাব মানি, তাঁরাও মাযহাব মানেন। আমরা যেমন সালাফের কোনো ইমামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করি, তাঁরাও কোনো মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যা অনুসারে আমল করেন। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবু হানীফা রহ-এর ব্যাখ্যা আর আহমাদ রহ.-এর ব্যাখ্যার মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। তাই সেসব বিষয়ে আরবের উলামায়ে কেরামের সাথে আমলগত দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের ও তাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে কোনো বিভেদ নেই। তাঁরা যেমন নিজেদের উপর ভরসা না করে নির্ভরযোগ্য ইমামের ব্যাখ্যা অনুসারে আমল করেন, আমরাও নিজেরা মুজতাহিদ হওয়ার দাবি না করে মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যা মোতাবেক আমল করি। আরবের আলেমগণ-যে মাযহাব অনুযায়ী আমল করেন এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

১. সৌদি আরবের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম যে মহান ব্যক্তিত্বের নীতি ও মতাদর্শ আঁকড়ে আছেন, তিনি হলেন শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. (১১১৫-১২০৬ হিজরী)। তাঁর সম্পর্কে শায়েখ ইবনে বায রহ. বলেন–

وَهُوَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْعَقِيْدَةِ عَلٰى مَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَفِي الْفُرُوْعِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. আকীদার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের মাযহাবের অনুসারী এবং ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী।[৪৪০]

২. শায়েখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায রহ. (১৩৩০-১৪২০ হিজরী) ছিলেন সৌদি আরবের প্রধান মুফতী। তিনি নিজের মাযহাব সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন–

مَذْهَبِيْ فِي الْفِقْهِ هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ.

ফিকহের ক্ষেত্রে আমার মাযহাব হলো আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাব।[৪৪১]

৩. সৌদি আরবের অধিকাংশ আলেম শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ.-এর চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী। তাঁর অনুসরী আলেমদের সম্পর্কে শায়েখ ইবনে বায রহ. বলেন–

وَأَتْبَاعُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ كُلُّهُمْ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَيَعْتَرِفُوْنَ بِفَضْلِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَيَعْتَبِرُوْنَ أَتْبَاعَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ إِخْوَةً لَهُمْ فِي الدِّيْنِ.

অর্থাৎ শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ.-এর অনুসারীগণ সকলেই (অর্থাৎ আরবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম) হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করেন। তাঁরা চারও মাযহাবের ইমামগণকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন এবং চারও মাযহাবের অনুসারীদেরকে নিজেদের ধর্মীয় ভাই মনে করে থাকেন।[৪৪২]

---

৪৪০. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১/৩৭৪

৪৪১. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ৪/১৬৬

৪৪২. মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে বায ৫/১৫০

৪. শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আলউসাইমীন রহ. (১৩৪৭-১৪২১ হিজরী) বলেন–

نَحْنُ الأٰنَ مَذْهَبُنَا مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ.

> বর্তমানে আমাদের অর্থাৎ আরবের আলেমদের মাযহাব হলো আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাব।[৪৪৩]

এসব তথ্য প্রমাণ করে—সৌদি আরবের নির্ভরযোগ্য আলেমগণ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার জন্য আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ-এর ফিকহ ও মাযহাবের শরণাপন্ন হন।

আরবের আলেমগণ যে তাকলীদ করেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করাকে জরুরি মনে করেন, এ সম্পর্কে বন্ধুবর মাওলানা রাইয়ান ইবনে লুৎফুর রহমান "আরবের আলেমগণ কি মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধী?" শিরোনামে প্রামাণিক ও তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি মাসিক আলকাউসার, বর্ষ ১২, সংখ্যা ০১, জানুয়ারি, ২০১৬-এ ছেপেছে। আমি তাঁর সে প্রবন্ধ থেকে পরের দুটি মন্তব্য পেশ করেছি। এ পুস্তিকায় আরবের শায়েখদের আরও কয়েকটি মন্তব্য মাওলানার এ প্রবন্ধের কল্যাণে পরিবেশন করা হয়েছে।

فجزاه الله خيرا، ووفقه للمزيد من خدمة الدين والأمة في أمن وعافية. آمين.

* * *

৪৪৩.লিকাআতু বাবিল মাফতূহ ১২/১০০

একটি প্রশ্নের উত্তর

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, উপরে দেখানো হয়েছে, বড় বড় অনেক মুহাদ্দিস কোনো না কোনো মুজতাহিদের মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন। এ দাবি যুক্তিসম্মত নয়। কেননা, তাঁরা অনেক মাসআলায় নিজ ইমারের সাথে মতবিরোধ করেছেন। তাঁরা যদি কোনো ইমামের মাযহাব অনুযায়ী আমল করে থাকেন, তাহলে ওই ইমামের সাথে তাঁদের ইখতিলাফ হলো কেন?

এ প্রশ্নের ভিত্তি হলো– এই ভুল ধারণার উপর যে, মাযহাব অনুসরণ করলে ইজতিহাদ ও গবেষণার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কোনো বিষয়ে অনুসরণীয় ইমামের সাথে মতানৈক্য করা যায় না। এ ধারণা ঠিক নয়। যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, তাঁদের জন্য মাযহাব অনুসরণ করলে ইজতিহাদ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। তাই তো চার মাযহাবের বিজ্ঞ ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমগণ ইজতিহাদ ও গবেষণা করেছেন। গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন মাসআলায় নিজ ইমামের সাথে মতবিরোধও করেছেন। আর উল্লিখিত মুহদ্দিসগণও হাদীসের ইমাম হওয়ার পাশাপাশি ফিক্‌হেরও ইমাম ছিলেন। তাঁরা যেমন তাঁদের চেয়ে বড় কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ করতেন, তেমনি নিজেদের রায় দ্বারা ইজতিহাদও করতেন। তাই বিভিন্ন মাসআলায় তাঁরা অনুসৃত ইমামের সাথে মতানৈক্যও করেছেন।

এই এখতেলাফের কারণে বলা যায় না যে, এখতেলাফকারী মুহাদ্দিস ওই ইমামের মাযহাবের অনুসারী নন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বহু মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সেই এখতেলাফ মূলনীতি ও শাখাগত মাস্‌আলা উভয় ক্ষেত্রে হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ যাহেদ ইবনে হাসান কাওছারী রহ. বলেন, ইমাম নববী রহ. 'তাহযীবুল আসমা ওয়াছছিফাত' কিতাবে (২/২৮৫) ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী জুওয়াইনী রহ.-এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُولَ صَاحِبِهِمَا.

তাঁরা আবু হানীফার সাথে উছূল ও মূলনীতিতেও এখতেলাফ করেছেন।[৪৪৪]

৪৪৪.হুসনুত তাকাযী ফী সীরাতিল ইমামি আবী ইউসুফ আলকাযী, পৃ. ২২৮-২২৯

ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন–

كَانَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ فِيْ ثُلُثَيْ مَذْهَبِهِ.

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের দুই তৃতীয়াংশে তাঁর অনুসরণ করতেন।[৪৪৫]

অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. হানাফী মাযহাবের তিন ভাগের দুইভাগের ক্ষেত্রে আবু হানীফা রহ.-এর তাকলীদ করতেন আর একতৃতীয়াংশ বিধি-বিধানে আবু হানীফা রহ.-এর তাকলীদ করতেন না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُمَا صَاحِبَا أَبِيْ حَنِيفَةَ، وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِهِ، كَاخْتِصَاصِ الشَّافِعِيِّ بِمَالِكٍ. وَلَعَلَّ خِلَافَهُمَا لَهُ يُقَارِبُ خِلَافَ الشَّافِعِيِّ لِمَالِكٍ.

আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. আবু হানীফা রহ.-এর ছাত্র এবং তাঁর বিশেষ শিষ্য, যেমন শাফেয়ী রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর খাছ শাগরেদ। শাফেয়ী রহ. ইমাম মালেকের সাথে যে পরিমাণ এখতেলাফ করেছেন, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদও ইমাম আবু হানীফার সাথে প্রায় সে পরিমাণ এখতেলাফ করেছেন।[৪৪৬]

উছূল ও ফুরূ তথা মূলনীতি ও বিধি-বিধান উভয় অঙ্গনে আবু হানীফা রহ.-এর সাথে এত এখতেলাফ করা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁরই অনুসারী, হানাফী মাযহাবের ইমাম।

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন–

اَلْمُحَمَّدُوْنَ الْأَرْبَعَةُ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنِ جَرِيْرٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَقد بلغُوا دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُمْ ذَلِكَ عَن كَوْنِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ،

৪৪৫.আলমানখুল, পৃ. ৬০৮

৪৪৬.মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/৩৩২

> الْمُخَرِّجِيْنَ عَلَى أُصُولِهِ الْمُتَمَذْهِبِيْنَ بِمَذْهَبِهِ، إِنَّهُم وَإِن خَرَجُوا عَن رَأيِ الإِمَام الْأَعْظَمِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ، فَلم يَخْرُجُوا فِي الْأَغْلَبِ، فَاعْرِفْ ذٰلِكَ، وَاعْلَم أَنَّهُمْ فِي أَحْزَابِ الشَّافِعِيَّةِ مَعْدُوْدُوْنَ، وَعَلٰى أُصُولِهِ فِي الْأَغْلَبِ مُخَرِّجُوْنَ، وَبِطَرِيْقِهِ مُتَهَذِّبُوْنَ، وَبِمَذْهَبِهِ مُتَمَذْهِبُوْنَ.
>
> আমাদের মাযহাবের চারজন মুহাম্মাদ : মুহাম্মাদ ইবনে নছর রহ., মুহাম্মাদ ইবনে জারীর রহ., মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা রহ. ও মুহাম্মাদ ইবনে মুনযির রহ. মুজতাহিদের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অনুসারী ছিলেন, শাফেয়ী মাযহাবের উছূল ও কাওয়ায়েদ অনুযায়ী বিধান আহরণ করতেন।
>
> যদিও অনেক মাসআলায় তাঁরা শাফেয়ী রহ.-এর সাথে মতবিরোধ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তাঁর অনুসরণ করেছেন। বিষয়টি বুঝে নিন।
>
> জেনে রাখুন, তাঁরা শাফিয়ী মাযহাবের মধ্যে গণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাফেয়ী রহ.-এর উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ীই 'তাখরীজ' করেন। তাঁরা শাফেয়ী রহ.-এর পথ-পদ্ধতির অনুসারী এবং তাঁর ফিকহ ও মাযহাব অবলম্বনকারী।[৪৪৭]

মোদ্দাকথা, কোনো ইমামের ফিক্হ অনুসারে আমল করলে ইলমী গবেষণা করা যাবে না বা ওই অনুসৃত ইমামের সাথে কোনো বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা যাবে না—এমন ধারণা ভুল। যার মাঝে যতটুকু ইজতিহাদী যোগ্যতা আছে, তিনি ততটুকু গবেষণা করতে পারেন এবং নিজ ইমাম থেকে ভিন্ন মতও গ্রহণ করতে পারের। তাঁর গবেষণায় যদি প্রমাণিত হয়, ইমামের মত দুর্বল, তাহলে অন্য ইমামের মত গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। এই বিরোধিতার কারণে তিনি অনুসৃত মাযহাব থেকে বের হয়ে যাবেন না।

৪৪৭.তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, সুবকী ৩/১০২-১০৩

আর এই ভুল ধারণার মূল হলো– তাকলীদের স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সহীহ জ্ঞান না রাখা। তাই নিম্নে তাকলীদের স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে পড়লে তাকলীদের বিষয়ে অনেক সংশয় নিরসন হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

তাকলীদের স্তর-বিন্যাস

একটি বাস্তব ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, সকল মানুষ কুরআন-সুন্নাহর সমান পর্যায়ের জ্ঞান রাখে না। কেউ বেশি, কেউ কম। জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ কোনো মানুষের এতে দ্বিমত নেই। তো কুরআন হাদীসের ইলমের ক্ষেত্রে সকল মানুষকে ৫টি স্তরে ভাগ করা যায়।

১. সাধারণ মানুষ, যারা কুরআন-সুন্নাহ বোঝা তো দূরের কথা, আরবী ভাষাটাও বুঝে না, যেমনটা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবস্থা।

তাদের জন্য কোনো আলেমের অনুসরণ করা ছাড়া শরীআতের বিধি-বিধান পালন করার অন্য কোনো উপায় নেই।

২. সাধারণ পর্যায়ের আলেম, যারা আরবী জানেন এবং কুরআন হাদীসের অর্থ বুঝেন। কিন্তু হাদীসশাস্ত্র ও উছূলে ফিকহ শাস্ত্র-এর জ্ঞান রাখে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ স্তরের আলেমদের জন্যও তাকলীদ না করে উপায় নেই। কেননা উলূমুল হাদীসে পারদর্শী না হওয়ার কারণে কোন রাবীর হাদীস দলীলযোগ্য, কার হাদীস সমর্থক হিসাবে উল্লেখযোগ্য, আর কার হাদীস দলীল বা সমর্থক কোনোভাবেই পেশ করা যায় না—তা বোঝার যোগ্যতা তাদের নেই। এমনিভাবে হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, হাসান, যঈফ, মাওযূ, মারূফ, মুনকার, গরীব, শায ইত্যাদি স্তর নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখেন না। অর্থাৎ কোন হাদীস থেকে বিধান আহরণ করা যাবে আর কোন হাদীস থেকে করা যাবে না- তা তারা জানেন না।

আর ইলমুল ফিকহে বিশেজ্ঞতা না থাকায় কুরআন হাদীস থেকে দলীল-প্রমাণের নিয়মনীতি তাদের জানা নেই।

বলাই বাহুল্য, বর্তমানের গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেম এই স্তরেরই।

৩. মধ্যম স্তরের আলেম, উলূমুল হাদীসে ভালো জ্ঞান রাখেন, কিন্তু উছূলুল ফিকহে পারদর্শিতা অর্জন করেননি। আদিল্লায়ে শরইয়্যা তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে আহকাম ইসতেম্বাত করার যোগ্যতা অর্জন করেননি।

বর্তমানে এই স্তরের আলেম অর্থাৎ উলূমুল হাদীসে পারদর্শী মুহাদ্দিসের সংখ্যা খুব একটা পাওয়া যায় না। যাই হোক, উলূমুল ফিকহে দৈন্যের কারণে তাদেরও কর্তব্য, তাকলীদ করে আমল করা।

৪. উলূমুল হাদীসের পাশাপাশি উছূলে ফিকহেও জ্ঞান রাখেন। কিন্তু ইজতিহাদ করার জন্য যেসব বিদ্যার প্রয়োজন, সেগুলোর ইলম তাদের নেই। তারা মাযহাবের উছূল ও নীতিমালা বুঝেন, দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করতে পারেন। দলীলের আলোকে কোনো কোনো মাসআলায় অনুসরণীয় ইমামের সাথে মতবিরোধ করতে পারেন। কিন্তু সরাসরি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই।

এই যুগে এই স্তরের আলেমের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ইজতিহাদী যোগ্যতা না থাকার কারণে তাদেরও তাকলীদ করতে হবে। তবে, দলীল-প্রমাণ গবেষণার যোগ্যতা থাকায় আপন ইমামের দলীলাদি পর্যালোচনা করে তাঁর থেকে ভিন্ন মতও গ্রহণ করতে পারেন।

এই চার স্তরের উপরে হলো মুজতাহিদ আলেম, যারা সরাসরি আদিল্লায়ে শরইয়্যা থেকে হুকুম-আহকাম আহরণ করতে পারেন।

এই যোগ্যতা অর্জন করা যদিও অসম্ভব না, কিন্তু বাস্তবতা হলো বহু যুগ থেকে এই স্তরের আলেম তৈরি হচ্ছে না। সালাফের যুগে এমন যোগ্য আলেমের পরিমাণ একেবারে কম ছিল না। তবে তাঁদের অনেকেই নিজেদের নামে মাযহাব প্রতিষ্ঠা না করে, আপন উস্তাযের দিকে নিজেকে সম্বন্ধ করতেন বা নিজ এলাকায় যে ইমামের মাযহাব প্রচলিত তাঁর তাকলীদ করেই আমল করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর অনেক শিষ্য এবং প্রসিদ্ধ চার

মাযহাবের ইমামগণের শিষ্য ও অনুসারীদের মধ্যে অনেক আলেম এই স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তাঁরা আপন উস্তাযের মাযহাব বা নিজ এলাকায় প্রচলিত মাযহাবের সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন এবং সে অনুযায়ী মানুষকে ফতোয়া দিতেন। এটাকে তাঁরা নিরাপদ মনে করতেন। তবে, ইজতিহাদী যোগ্যতা থাকায় বিভিন্ন মাসআলায় স্বীয় ইমামের সাথে এখতেলাফও করেছেন।

✽ ✽ ✽

দশম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস থেকে শিক্ষা

উপরে মাযহাবের যে ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। এখানে আমাদের বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো–

এক. সালাফের যুগের আহলে হাদীস এ যুগের গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন না।

দুই. সব যুগেই মুজতাহিদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

তিন. মুজতাহিদ হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই বড় বড় আহলে হাদীস ইমাম মুজতাহিদ হতে পারেননি।

চার. নিজে নিজে ইজতিহাদ না করে, ফকীহের ফিকহের আলোকে আমল করাই শ্রেয়। তাই ইজতিহাদের যোগ্য অনেক মুহাদ্দিস ফকীহের ব্যাখ্যা অনুসারে আমল করতেন।

পাঁচ. মুহাদ্দিসীনে কেরামকে গাইরে মুকাল্লিদ গণ্য করা ধোঁকা, প্রতারণা এবং তাঁদের উপর অপবাদ। তাঁরা আহলে হাদীস ছিলেন এবং প্রকৃত আহলে হাদীস ছিলেন। ইলমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় গুণাবলি অর্জন করে আহলে হাদীস হয়েছিলেন। জালিয়াতি করে নিজেদেরকে আহলে হাদীস রূপে পরিচয় দিতেন না।

ছয়. হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ, যাঁরা ছিলেন গুণে-জ্ঞানে আহলে হাদীস তাঁরা তাকলীদ করতেন, ফকীহদের মূল্যায়ন করতেন। যারা ফিকহের আলোকে শরীআত পালন করে তাদের নিন্দা করতেন না। সাধারণ মানুষ ও অযোগ্যদের ইজতিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন না।

চতুর্থ অধ্যায়

ইজতিহাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুজতাহিদের পরিচয়

মুজতাহিদ হওয়া কি এতই সহজ?

পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস উল্লিখিত হয়েছে–

> نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ، حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.
>
> অর্থাৎ আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন, যে আমার থেকে কোনো হাদীস শুনেছে, অতঃপর তা মুখস্থ করেছে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কারণ ফিক্হের অনেক বাহক তার চেয়ে বড় ফকীহের নিকট তা পৌঁছে দেয় এবং ফিক্হের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়।[৪৪৮]

এই হাদীসে 'ফিকহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস, আর ফকীহ মানে মুজতাহিদ। যেহেতু 'ফিকহে'র অন্যতম উৎস হাদীস, সেহেতু হাদীসকেই 'ফিকহ' বলা হয়েছে। সুতরাং 'ফিহকের বাহক' মানে হাদীসের বাহক অর্থাৎ মুহাদ্দিস। তাই وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ এর অর্থ হলো– অনেক মুহাদ্দিস মুজতাহিদ নয়।

আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন–

> أَيْ غَيْرِ مُسْتَنْبِطٍ عِلْمَ الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيْقِ الْاِسْتِدْلَالِ، بَلْ يَحْمِلُ الرِّوَايَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ اسْتِدْلَالٌ.

৪৪৮.জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৩০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৫৯০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৭

হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেক মুহাদ্দিস এমন আছেন, যাঁরা বিধান আহরণ করতে পারেন না। তারা শুধু হাদীস বর্ণনা করতে পারেন।[৪৪৯]

লক্ষ করুন, এ হাদীসে নবীজীর সম্বোধনের প্রথম পাত্র হলেন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন ও হাদীস শিখেছেন এবং যাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন আরবী ভাষার অতি উঁচু মানের সাহিত্যিক, তাঁদের সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা হলো, তোমাদের অনেকেই ফকীহ নও। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন অনেকই আছো, যাদের ইজতিহাদ করে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণ করার মতো যোগ্যতা নেই।

অতএব বোঝা গেল, কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি হুকুম-আহকাম জানার জন্য শুধু আরবী ভাষার বড় সাহিত্যিক হওয়া বা অনেক বড় মুহাদ্দিস হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং আরবী ভাষার বড় সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি ফকীহ তথা মুজতাহিদও হতে হবে। অর্থাৎ আদিল্লায়ে শরইয়্যা : কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে বিধান আহরণ করার উসূল ও কাওয়ায়েদ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হতে হবে এবং শরীআতের মেযাজ ও রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে।

মুজতাহিদ হওয়ার কিছু শর্ত

আলী রাযি. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম–

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ: أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟

আমাদের সামনে যদি এমন কোনো মাসআলা উপস্থিত হয়, (কুরআন ও হাদীসে) যার সমাধান নেই; আদেশ বা নিষেধ

---

৪৪৯. ফয়যুল কাদীর, ৪/১৭, ৪৪০৯

কিছুই পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী করার হুকুম দেন? (তখন আমাদের করণীয় কী?)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تُشَاوِرُونَ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ.

ফকীহ ও আবেদদের সাথে পরামর্শ করবে।[৪৫০]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উছমানী (হাফিযাহুল্লাহ ওয়ারাআহু) বলেন–

এই হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণ করবেন, তার মধ্যে দুটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে :

এক. ফকীহ হওয়া। এ শর্তের গুরুত্ব তো একেবারে স্পষ্ট। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহর মর্ম সে-ই বুঝবে, যার কুরআন-সুন্নাহর বিস্তৃত ও গভীর ইলম আছে, হুকুম-আহকাম ইস্তেম্বাত করার জন্য যে উছূল ও নিয়মনীতি কুরআন-সুন্নাহয় বিবৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি আছে এবং যে কুরআন ও হাদীসের চর্চায় নিজের পুরো যিন্দেগি ব্যয় করে শরীআতের মেযাজ ও প্রকৃতি বোঝার পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছে।

দুই. আবেদ হওয়া তথা ইসলামের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। কেননা যে লোক নিজের বাস্তব জীবনে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের বাছবিচার করে না, যার দিনরাতের কাজকর্ম ইসলামী অনুশাসনের অনুগামী হয় না সে কিছুতেই দ্বীনের রুচি ও মেযাজ ধারণ করতে পারবে না।

হুকুম-আহকাম ইস্তেম্বাত করার উদ্দেশ্য মূলত হক ও সত্য অনুসন্ধান করা। আর কুরআনুল কারীমের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, হক বোঝা ও হক

৪৫০.মুজামে আওসাত, তবারানী, হাদীস ১৬৪১

(قال الهيثمي: رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ.)

চেনার গুণটি আল্লাহ তাআলা তাকেই দান করেন, যে হকের সম্মান করে, হকের উপর আমল করে। ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

> হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহের মালিক।[৪৫১]

এই আয়াত স্পষ্টরূপে বলে দিয়েছে যে, হক ও বাতেলের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য অবশ্যই 'তাকওয়া'য় সজ্জিত হতে হবে। তাকওয়ার গুণ না থাকলে এই অমূল্য সম্পদ অর্জন করা সম্ভব নয়।[৪৫২]

---

৪৫১. সূরা আনআম (৮), আয়াত ২৯

৪৫২. এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য কোনো পথ বের করে দেবেন।
–সূরা তালাক (৬৫) : ২

আয়াতের বক্তব্য হলো, যে-কোনো সংকট থেকে উত্তরণের উপায় হলো তাকওয়া। তাকওয়া হলো দ্বীনী ও দুনিয়াবী সব ধরনের সমস্যা থেকে বের হওয়ার মাধ্যম। ইলমের বিষয়ে, আমলের বিষয়ে, আহকামের বিষয়ে কোনো সমস্যা উত্তাপিত হলে এর সমাধানের পথ হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। তাকওয়া সঙ্গে থাকলে আল্লাহ তাদেরকে সমাধান দিয়ে দেবেন। সুতরাং এই আয়াতও প্রমাণ করে, হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে, ইজতিহাদ করে এর সঠিক সমাধান বের করার জন্য প্রয়োজন তাকওয়া অনুসারী হওয়া। তাকওয়া ব্যতীত সহীহ ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۵﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ =

মোটকথা, কুরআনুল কারীমের এই আয়াত এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীস পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের যিন্দেগিতে নতুন নতুন যত সমস্যা দেখা দেবে, শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সেসবের সমাধান সে-ই পেশ করতে পারবে যে যুগপৎ ফকীহও হবেন এবং ইবাদগুযার মুত্তাকীও হবেন।[৪৫৩]

আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বাণী থেকে জানা গেল, ইজতিহাদের যোগ্য হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে, তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া। বাস্তব জীবনে তাকওয়ার অনুশীলন করা। ইবাদত, আকাইদ, মুআমালাত, মুআশারাত ও সিয়াসাত তথা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামের অনুশাসনকে আঁকড়ে থাকা। সুতরাং যারা ইলমী খেয়ানত করে, সাধারণ মানুষের সাথে ধোঁকা-প্রতারণার আচরণ করে, মিথ্যা ও জালিয়াতির জাল বিস্তার করে, এরপরও মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করে, তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও রাসূলের আইনের বরখেলাফ করে।[৪৫৪]

= আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা (সত্যকে) সুস্পষ্ট করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের (সরল পথের) দিশা দেন। –সূরা মায়েদা (৫) ১৫-১৬

আয়াতে বলা হয়েছে, শান্তির পথ, আলোর পথ ও সিরাতে মুস্তাকীমের দিশা পান তারাই যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টভাজন জীবন যাপন করে।

সুতরাং দ্বীনের বিধান পালন করার ক্ষেত্রে যত বেশি অগ্রসর হবে, তত বেশি ঐশী নূরের অধিকারী হবে, সঠিক বিষয় তার সামনে তত বেশি উদ্ভাসিত হবে। শরীআতের আহকামের পাবন্দি না করে কেউ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে, কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি এমন বিষয়ে আল্লাহপ্রদত্ত নূর ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সরল পথের দিশা পাওয়া যাবে না। তাই এমন ব্যক্তির পক্ষে মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করা ভুল ও বেআদবী।

৪৫৩. ইসলাম আওর জিদ্দত পছন্দি, পৃ. ৫৯-৬০

৪৫৪. এ দেশের গাইয়ে মুকাল্লিদ ফিরকার দাবিদার মুজতাহিদদের এহেন হীন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা অবগতির জন্য মাওলানা আবদুল মতিন ছাহেবের 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' বইটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে বিধি-বিধান আহরণের জন্য হাদীস শরীফে দ্বিতীয় যে বিষয়টির বাধ্যবাধকতা সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা হলো, ফকীহ তথা মুজতাহিদ হওয়া। এ সম্পর্কে দুটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য হলো, নব উদ্ভাবিত বিষয়াদির শরয়ী সমাধান পেশ করার জন্য ফকীহ হতে হবে। ফকীহ না হলে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। হাদীসশাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণও এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন। এরপর বলেছেন–

كَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ.

ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসটির এই ব্যাখ্যাই করেছেন। আর তাঁরা হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্য অন্যদের চেয়ে বেশি বুঝেন।[৪৫৫]

আর প্রথম হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, 'ফিক্‌হের অনেক ধারক বাহক নিজে ফকীহ নয়'। অর্থাৎ অনেক মুহাদ্দিস এমন আছেন যারা মুজতাহিদ হতে পারেনি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, যিনি মুহাদ্দিস হবেন তিনি যেমন প্রচুর পরিমাণ হাদীসের হাফেয হবেন, তেমনি আরবী ভাষায় পারদর্শী হবেন। নবীজীর এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, আরবী ভাষা জানেন এমন অনেক মুহাদ্দিসের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন হয়নি। আবু ইসহাক ইবরাহীন ইবনে ইউসুফ ইবনে কুরকুল রহ. (৫৬৯ হিজরী) বলেন–

تَسْلِيْمُ التَّأْوِيْلِ لِأَهْلِ الْفَهْمِ وَالْفِقْهِ لَازِمٌ، فَهُمْ أَحَقُّ بِالتَّأْوِيْلِ، وَأَهْدى إِلَى السَّبِيْلِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব ফকীহ ও মুজতাহিদের উপর সোপর্দ করা আবশ্যক। কেননা, 'ফিক্‌হের অনেক বাহক তার চেয়ে বড় ফকীহের নিকট তা পৌঁছে দেয় এবং ফিক্‌হের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়' এই হাদীস

৪৫৫.জামে তিরমিযী, ৯৯০ নং হাদীসের আলোচনা (بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ)

থেকে বুঝে আসে, ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসের ব্যাখ্যার বেশি উপযুক্ত এবং তাঁরা এ বিষয়টিতে অধিক পারদর্শী।[৪৫৬]

সুতরাং স্পষ্ট যে, ফকীহ বা মুজতাহিদ হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া এবং লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে আরও অনেক গুণ ও যোগ্যতার সমাহার ঘটতে হবে। সে গুণগুলোর দিকে ইশারা করার জন্য ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ.-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, ইজতিহাদ করে ফতোয়া দেওয়ার জন্য শর্ত হলো– প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, নির্ভরযোগ্য ও ধার্মিক হওয়া।

এরপর তিনি মুজতাহিদের জ্ঞানগত যোগ্যতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইজতিহাদ করার জন্য শর্ত হলো–

ثُمَّ يَكُونُ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعِلْمُهُ بِهَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِأُصُولِهَا وَارْتِيَاضٍ بِفُرُوعِهَا. وَأُصُولُ الْأَحْكَامِ فِي الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: الْعِلْمُ بِكِتَابِ اللهِ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ مَعْرِفَةُ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ: مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا، وَعُمُومًا وَخُصُوصًا، وَمُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا، وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا.

وَالثَّانِي: الْعِلْمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتَةِ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَطُرُقِ مَجِيئِهَا فِي التَّوَاتُرِ وَالْآحَادِ، وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَى سَبَبٍ أَوْ إِطْلَاقٍ.

وَالثَّالِثُ: الْعِلْمُ بِأَقَاوِيلِ السَّلَفِ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، لِيَتَّبِعَ الأَجْمَاعَ، وَيَجْتَهِدَ فِي الرَّأْيِ مَعَ الِاخْتِلَافِ.

---

৪৫৬. মাতালিউল আনওয়ার আলা ছিহাহিল আছার ১/১৫৩

وَالرَّابِعُ: الْعِلْمُ بِالْقِيَاسِ الْمُوجِبِ، لِرَدِّ الْفُرُوعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا إِلَى الأُصُولِ الْمَنْطُوقِ بِهَا، وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، حَتَّى يَجِدَ الْمُفْتِي طَرِيقًا إِلَى الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ النَّوَازِلِ، وَتَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ.

فَهَذَا مَا لَا مَنْدُوحَةَ لِلْمُفْتِي عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الأَخْلَالُ بِشَيْءٍ مِنْهُ.

শরয়ী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া। শরয়ী আহকাম এমনভাবে জানা যে, উছূল ও মূলনীতিসমূহের সম্যক জ্ঞান রাখবে এবং উছূলগুলোর সাথে বিধি-বিধানের যোগসূত্র ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

আহকামে শরইয়্যার উছূল হলো চারটি :

এক. কিতাবুল্লাহর ইলম এমনভাবে অর্জন করা তথা কুরআন মাজীদের মুহকাম ও মুতাশাবিহ, উমূম ও খুছূছ, মুজমাল ও মুফাস্‌সার, নাসেখ ও মানসূখ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা। (অর্থাৎ উলূমুল কুরআন শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।)

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। প্রমাণিত হাদীস ও অপ্রমাণিত হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া। প্রমাণিত হাদীসগুলোর সনদের অবস্থা জানা, এগুলো কি মুতাওয়াতির সূত্রে প্রামাণিত, না খবরে ওয়াহিদ। এরপর কোন্ হাদীসের বিধান সবার জন্য আর কোনটির হুকুম বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য, তাও ভালোভাবে বোঝা। (অর্থাৎ হাফিযুল হাদীস হওয়া এবং উছূলে হাদীস ও ফিকহে হাদীস সম্পর্কে পূর্ণ পারদর্শী হওয়া।)

তিন. সালাফে ছালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের আমল ও বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, যেন ইজমায়ী বিধানগুলোতে ইজমার অনুসরণ করতে পারে আর এখতেলাফী বিষয়গুলোতে ইজতিহাদ করে কোনো একটা মত নির্ধারণ করতে পারে।

চার. কিয়াস ও ইজতিহাদের উছূল ও নিয়মনীতির জ্ঞান রাখা। যাতে করে কুরআন হাদীসের দ্ব্যর্থহীন হুকুমসমূহ এবং ইজমায়ী মাসআলাগুলোর উপর কিয়াস করে অজানা বিধানাবলির হুকুম জানতে পারে এবং নব-উদ্ভাবিত সমস্যাবলির সমাধান বের করতে পারে।

মুজতাহিদের জন্য এসব জ্ঞানের যোগ্যতা অর্জন না করে কোনো উপায় নেই, এর কোনো কিছুতে ত্রুটি থাকার অবকাশ নেই।[৪৫৭]

এখানে ইমাম খতীব বাগদাদী রহ. যে শর্তসমূহ উল্লেখ করেছেন তা শুধু তাঁর একার বক্তব্য নয়, হাদীস ও ফিকহের অন্যান্য ইমামগণেরও একই বক্তব্য। বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে। অন্তত ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর 'ইলামুল মুআক্কিয়ীন' ও আরবের প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (হাফিযাহুল্লাহু ওয়া-রাআহু)-এর 'আসারুল হাদীসিশ শরীফ'-এ সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ অধ্যয়ন করলেও এ সংক্রান্ত অনেক ইমামের আলোচনা পেয়ে যাবেন।

বি. দ্র. : মুজতাহিদ হতে হলে উল্লিখিত বিদ্যাসমূহের জ্ঞান লাভ করার জন্য অবশ্যই বিজ্ঞ উস্তাযের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করতে হবে। খতীব বাগদাদী রহ. বলেছেন–

وَلَا بُدَّ لِلْمُتَفَقِّهِ مِنْ أُسْتَاذٍ يَدْرُسُ عَلَيْهِ، وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ مَا أَشْكَلَ إِلَيْهِ، وَيَتَعَرَّفُ مِنْهُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ، وَمَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ.

যে মুজতাহিদ হতে চায় তার জন্য উস্তাযের অতি প্রয়োজন, যার নিকট সে (ফিকহ ও উছূলে ফিকহ) অধ্যয়ন করবে, যার থেকে মুশকিল বিষয়গুলোর সমাধান করবে, ইজতিহাদের নিয়মনীতির জ্ঞান লাভ করবে এবং ইজতিহাদের সঠিক ও বেঠিক পদ্ধতির নির্ণয় করবে।[৪৫৮]

৪৫৭.আলফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/৩৪৬-৩৪৭

৪৫৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৬৭

এ সম্পর্কে আরও অনেক উদ্ধৃতি পেশ করা যেত। কিন্তু এখানে বেশি দলীলের প্রয়োজন নেই। কেননা বিষয়টি স্বীকৃত যে, কোনো বিদ্যাই শিক্ষক ছাড়া অর্জন হয় না। চিকিৎসাবিদ্যার শুধু বইপত্র পড়ে কেউ চিকিৎসক হতে পারে না। এমনকি অভিজ্ঞ চাষীর পেছনে চলাফেরা না করে কেউ ভালো করে হালচাষও করতে পারবে না।

মুজতাহিদের জন্য নিম্নে যে পরিমাণ হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরি

মুজতাহিদ হওয়ার জন্য উল্লিখিত চার শর্তের দ্বিতীয় শর্তটির একটি অংশ হলো হাফেযুল হাদীস হওয়া। কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধি-বিধান আহরণ করতে হলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি দরকার তা হলো, কুরআন সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এবং হাদীস শরীফের হাফেয হওয়া। একজন মুজতাহিদের জন্য কী পরিমাণ হাদীস স্মৃতিতে থাকতে হবে, এ প্রসঙ্গে দুইজন ইমামের বক্তব্য লক্ষ করুন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বক্তব্য

একদা জনৈক ব্যক্তি ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়ালজামাআ আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে জিজ্ঞেস করল, কেউ একলক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে কি ফকীহ (মুজতাহিদ) হতে পারবে? আহমদ রহ. বললেন, না।

সে প্রশ্ন করল, দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে?

আহমদ রহ. উত্তর দিলেন, না।

লোকটি বলল, তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে?

আহমাদ রহ. এবারো জবাব দিলেন, না।

লোকটি তখন প্রশ্ন করল, চার লক্ষ হাদীসের হাফেয হলে?

قَالَ الإِمَامُ بِيَدِهِ: هٰكَذَا وَحَرَّكَهَا _أَيْ لَعَلَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ فَقِيْهًا مُجْتَهِدًا يُفْتِي النَّاسَ.

এবার আহমদ রহ. হাত নাড়িয়ে ইশারা করলেন, তখন হয়তো মুজতাহিদ হতে পারবে।[৪৫৯]

৪৫৯.ইলামুল মুআক্কিঈন ১/৪৫; আসারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ১৯৯

এখানে চার লক্ষ হাদীসের কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া রহ. উল্লেখ করেছেন, আহমদ রহ. বলেছেন, ফকীহ্ হওয়ার জন্য নিম্নে পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করতে হবে। আবু আলী যরীর রহ. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে প্রশ্ন করলাম, ফতোয়া দেওয়া জায়েয হওয়ার জন্য একজন আলেমের কী পরিমাণ হাদীস মুখস্থ থাকতে হবে?

يَكْفِيهِ مِائَةُ أَلْفٍ এক লক্ষ হাদীস যথেষ্ট হবে?

তিনি বলেছেন— لَا -না।

বললাম— مِائَتَا أَلْفٍ দুই লক্ষ হাদীস?

বলেছেন— لَا-না।

জিজ্ঞেস করলাম— ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفٍ তাহলে তিন লক্ষ হাদীস?

উত্তর দিয়েছেন— لَا-না।

প্রশ্ন করলাম— أَرْبَعُمِائَةَ أَلْفٍ চার লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে?

তখনো একই উত্তর— لَا-না।

অবশেষে প্রশ্ন করলাম— خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ পাঁচ লক্ষ হাদীস যদি মুখস্থ করে তাহলে কি ফতোয়া দিতে পারবে?

এবার বলেছেন— أَرْجُو আশা করা যায়।[৪৬০]

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর বক্তব্য

দশলক্ষ হাদীসের হাফেয ইমামুল জারহ ওয়াততাদীল ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো– কেউ একলক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে ফতোয়া দিতে পারবে?

তিনি বললেন, না।

(বর্ণনাকারী বলেন,) জিজ্ঞেস করলাম, দুইলক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে?

জবাব দিলেন, না।

বল্লাম, তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে?

উত্তর দিলেন, না।

৪৬০.আলমুসাওয়াদা ফী উছূলিল ফিকহ, পৃ. ৩৪১

অবশেষে প্রশ্ন করলাম, পাঁচলক্ষ হাদীস হিফয করলে?

ইবনে মাঈন রহ. তখন বললেন– أَرْجُوْ (তাহলে আশা করি ফতোয়া দিতে পারবে।)[৪৬১]

সংশয় ও নিরসন

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. যে পরিমাণ হাদীস মুখস্থ থাকার কথা বলেছেন, সে পরিমাণ হাদীস যদি কম্পিউটারে থাকে বা এই পরিমাণ হাদীসের কিতাবাদি যদি কারও সংগ্রহে থাকে, তাহলে কি মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না?

এই প্রশ্নের জবাব অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। খতীব বাগদাদী রহ. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর বক্তব্যটি উল্লেখ করার পর বলেন–

> وَلَيْسَ يَكْفِيهِ إِذَا نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا أَنْ يَجْمَعَ فِي الْكُتُبِ مَا ذَكَرَهُ يَحْيَى، دُونَ مَعْرِفَتِهِ بِهِ، وَنَظَرِهِ فِيهِ، وَإِتْقَانِهِ لَهُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْفَهْمُ وَالدِّرَايَةُ، وَلَيْسَ بِالإِكْثَارِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الرِّوَايَةِ.
>
> নিজেকে মুজতাহিদের আসনে দাঁড় করানোর জন্যে ইবনে মাঈন রহ. যে সংখ্যক হাদীসের কথা বলেছেন, সে পরিমাণ হাদীসের কিতাবাদি জমা করলেই চলবে না। বরং পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে সেগুলোর সনদ ও মতন তথা সূত্র ও বক্তব্য বুঝতে হবে। কারণ সনদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি বোঝা এবং মতনের মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করাই হলো ইলম। শুধু প্রচুর পরিমাণে হাদীস জমা করার নাম ইলম নয়।[৪৬২]

অর্থাৎ ইবনে মাঈন রহ. যে বলেছেন পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকতে হবে, এর দ্বারা শুধু হাদীসের মতন ও সনদ হিফয করা উদ্দেশ্য নয়। বরং

---

৪৬১. আলজামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি ২/১৭৪; আসারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ১৯৯

৪৬২. আলজামি ২/১৭৪

সনদসহ হাদীস হিফয করা এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা, বর্ণনাকারীদের হালাত, সুনির্দিষ্টভাবে তাদের স্তর নির্ণয়, হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি থাকা এবং হাদীসে মর্ম ও উদ্দেশ্য সম্পকে সম্মক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। এ সবই ইবনে মাঈন রহ.-এর বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

হাফেযুল হাদীস হলেই কি মুজতাহিদ হয়ে যায়?

লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করা মুজতাহিদের একটি মাত্র শর্ত, পূর্ণ একটি শর্ত নয়, এক শর্তের একাংশ। শুধু এই আংশিক শর্ত পাওয়া গেলেই কেউ মুজতাহিদ হয়ে যায় না, এর জন্য আরও অনেক শর্ত প্রয়োজন, যেগুলো অর্জন না করলে ইজতিহাদ করা যাবে না। তাই তো আমরা দেখতে পাই, সালাফের যুগের মুহাদ্দিসগণ লক্ষাধিক হাদীসের হাফেয হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করতেন না; বরং কোনো মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করতেন। উপরে এ ধরনের বহু মুহাদ্দিসগণের নাম এবং অনেক মুহাদ্দিসের ঈষৎ পরিচয় পড়ে এসেছেন। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু ঘটনা ও কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। বুঝতে পারবেন মুজতাহিদ হওয়া কত কঠিন।

❊ ❊ ❊

চারটি ঘটনা

এক.

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., আবু খায়সামা রহ. ও খালাফ ইবনে সালেম রহ.সহ এক জামাত মুহাদ্দিস হাদীস শরীফের মুযাকারা করছেন। এমন সময় এক মহিলা, যে মায়্যেতকে গোসল করাতো, তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করল, ঋতুবতী নারী কি মায়্যেতকে গোসল করাতে পারবে?

বর্ণনাকারী বলেন–

فَلَمْ يُجِبْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ، فَأَقْبَلَ أَبُوْ ثَوْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: عَلَيْكَ بِالْمُقْبِلِ.

তখন কেউ কোনো জবাব দিলেন না। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে রইলেন। ঠিক তখনই ফকীহ আবু ছাওর রহ. তাঁদের নিকট আসলেন। তাঁরা বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর।

মহিলা আবু সাওর রহ.-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, ঋতুবতী নারী মায়্যেতকে গোসল করাতে পারবে। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযি.কে বলেছেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই।

অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাযি. বলেছেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

আবু ছাওর রহ. বলেন, ঋতুবতী নারীর জন্য যখন জীবিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা জায়েয, তখন মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা উত্তমরূপেই জায়েয হবে।

এভাবে যখন আবু ছাওর রহ. মাসআলা বললেন এবং এর স্বপক্ষে দুটি হাদীস পেশ করলেন। তখন উপস্থিত মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলতে লাগলেন–

نَعَمْ، رَوَاهُ فُلَانٌ، وَنَعْرِفُهُ مِنْ طَرِيْقِ كَذَا، وَخَاضُوا فِي الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ.

হাঁ, হাদীসটি অমুক অমুক রাবী বর্ণনা করেছেন এবং এই এই সনদে আমরা তা জানি। এভাবে তাঁরা আবু ছাওর রহ. যে হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন সে হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও সূত্রের মুযাকারায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

তখন মহিলাটি বলল–

فَأَيْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنَ؟

এতক্ষণ আপনারা কোথায় ছিলেন?[৪৬৩]

লক্ষ করুন, যেসব মুহাদ্দিস ওই মজলিসে হাদীসের মুযাকারা করছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., যার সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন দশলক্ষ হাদীসের হাফেয।

ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তায ইলালুল হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন, 'দুনিয়াতে যত হাদীস আছে, প্রায় সব হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এর জানা ছিল।'

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন–

كُلُّ حَدِيْثٍ لَا يَعْرِفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، فَلَيْسَ بِحَدِيْثٍ.

যে হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন জানেন না, তা কোনো হাদীসই নয়।

দেখুন, কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন! অধিকন্তু, ঘটনাটি থেকে স্পষ্ট যে, আবু ছাওর রহ. যে হাদীস থেকে মাসআলা বের করে মহিলাকে সমাধান দিয়েছেন, সে হাদীস তাঁদের জানা ছিল এবং এর একাধিক সনদ তাঁদের মুখস্থ ছিল।

তো এসব মুহাদ্দিসের হাদীসটির ব্যাপারে অবগতি ছিল এবং তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন আরবী ভাষার বড় সাহিত্যিক। তা সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত হাদীস থেকে বিধানটি আহরণ করতে পারলেন না। এতে কি প্রতীয়মান হয় না, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য শুধু হাদীস জানাই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য হাদীসের হাফেয হওয়ার পাশাপাশি আরও বহু ইলমে পারদর্শী হতে হবে?

৪৬৩.আল-মুহাদ্দিসুল ফাছিল পৃ.৫৪-৫৫; আল-ফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/১৬৫; আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ.২০০-২০১

দুই.

বিখ্যাত তাবেয়ী আমাশ রহ. (৬১-১৪৮ হিজরী) হলেন অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. (৮০-১৫০ হিজরী)-এর বিশিষ্ট উস্তায। একদা আমাশ রহ.-এর মজলিসে আবু হানীফা রহ.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি এর জবাব দিলেন। (আমাশ রহ. এ মাসআলার কোনো দলীল তালাশ করে পাচ্ছিলেন না। তাই) আবু হানীফা রহ.-কে প্রশ্ন করলেন, এ মাসআলা তুমি কোথায় পেয়েছ? আবু হানীফা রহ. তখন বলতে লাগলেন–

* আপনি আমাদেরকে

عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ،
عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ،
عَنْ أَبِيْ إِيَاسٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ

এই তিন সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* আপনি عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।
* আপনি عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ حُذَيْفَةَ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।
* আপনি عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।
* আপনি عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।
* আপনি عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এভাবে আবু হানীফা রহ. আমাশ রহ. থেকে এ সম্পর্কে যে হাদীসগুলো শুনেছিলেন সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন। তখন আমাশ রহ. বললেন–

حَسْبُكَ، مَا حَدَّثْتُكَ فِي مِئَةِ يَوْمٍ، حَدَّثْتَنِيْ فِيْ سَاعَةٍ.

'যথেষ্ট। আমি তোমাকে শতদিনে যত হাদীস বর্ণনা করেছি তুমি এক মুহূর্তে তা আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছ।'

এরপর আমাশ রহ. বললেন–

مَا عَلِمْتُ أَنَّكَ تَعْمَلُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ.

অর্থাৎ আমি তো জানতাম না যে, তুমি এসব হাদীস থেকে এ মাসআলা আহরণ করেছ।[৪৬৪]

ঘটনাটি অন্যত্র আরও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর রহ. বলেন, একবার আমরা আমাশ রহ.-এর নিকট ছিলাম। তাঁর কাছে তখন আবু হানীফা রহ. বসে ছিলেন। আমাশ রহ.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো।

তিনি আবু হানীফা রহ.-কে বললেন– أَفْتِه، يَا نُعْمَانُ! –তুমি ফতোয়া দাও, হে নুমান।

আবু হানীফা রহ. মাসআলা বলে দিলেন।

আমাশ রহ. প্রশ্ন করলেন–

مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هٰذَا؟

তুমি এই মাসআলা কোন দলীলের আলোকে বলেছ?

আবু হানীফা রহ. বললেন–

لِحَدِيْثٍ حَدَّثْتَنَاه أَنْتَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

আপনি আমাদের একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। সে হাদীস থেকে আমি এ মাসআলা ইস্তেম্বাত করেছি।

এরপর আবু হানীফা রহ. আমাশ রহ. থেকে শেখা সে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তখন আমাশ রহ. বলেন–

أَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ، وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ.

প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার হলে তোমরা, আর আমরা হলোাম অষুধবিক্রেতা।[৪৬৫]

---

৪৬৪. মানাকিবে ইমাম আবু হানীফা, মুল্লা আলী কারী (আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যার শেষে মুদ্রিত) ২/৪৮৪; আবু হানীফা ওয়াআসহাবহুল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ২৭; আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ১২২-১২৩ (?)

৪৬৫. ফাযাইলে আবু হানীফা, ইবনে আবিল আউওয়াম, পৃ. ১০২; জামিউ বয়ানিল ইলমী ওয়াফাযলিহি ২/১৩১; আলফকীহ ওয়ালমুতাফাক্কিহ ২/১৬৯; কাশফুল আছারিশ শারীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা ১/৯৯

আমাশ রহ. হলেন বিজ্ঞ ও প্রথিতযশা মুহাদ্দিস। আরবী ভাষায়ও ছিলেন পারদর্শী। উপরন্তু, আবু হানীফা রহ. যে হাদীসগুলো থেকে মাসআলা আহরণ করেছেন সেগুলো তাঁর থেকেই শুনেছেন। এরপরও সে মাসআলাটি কোন্ হাদীসে আছে তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য শুধু হাদীস জানা যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য আরও অনেক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক?

তিন.

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর সাথেও আমাশ রহ.-এর অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। বিশ্‌র ইবনে ওয়ালীদ রহ. বলেন, আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, আমাশ রহ. আমাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি সমাধান বলে দিয়েছি। তিনি প্রশ্ন করলেন—

مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هٰذَا؟

এই মাসআলার দলীল কী?

বললাম—

لِحَدِيثٍ حَدَّثْتَنَاهُ أَنْتَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ لَهُ الْحَدِيثَ.

দলীল হচ্ছে ওই হাদীস যা আপনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এরপর আমাশ রহ.-এর বর্ণিত সে হাদীসটি বর্ণনা করি।

তখন আমাশ রহ. বললেন—

يَا يَعْقُوبُ! إِنِّي لَأَحْفَظُ هٰذَا الحَدِيثَ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَ أَبَوَاكَ، فَمَا عَرَفْتُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الآنَ.

আবু ইউসুফ! তোমার মা-বাবার মিলনের পূর্ব থেকেই এ হাদীস আমার মুখস্থ। কিন্তু তুমি বলার আগ পর্যন্ত এর ব্যাখ্যা আমি বুঝিনি।[৪৬৬]

---

৪৬৬. ফাযাইলু আবী হানীফা ওয়াআখবারুহু, ইবনে আবুল আউওয়াম, পৃ. ৩০৩; জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়াফাযলিহি ২/১৩০-১৩১

চার.

ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. বলেন, ইরাকে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও আরও অনেক মুহাদ্দিস একসাথে মজলিস করতেন। সে মজলিসে হাদীসের মুযাকারা চলত। এক একটি হাদীসের কয়েকটি সনদ পেশ করা হতো। তখন ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলতেন, হাদীসটি আরও এই এই সনদে বর্ণিত হয়েছে।

সনদের আলোচনা শেষ হলে আমি বলতাম, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কি আমরা সকলে একমত নই? তাঁরা বলতেন, হাঁ।

তখন আমি প্রশ্ন করতাম–

مَا مُرَادُهُ؟ مَا تَفْسِيْرُهُ؟ مَا فِقْهُهُ؟ فَيَبْقَوْنَ _أَيْ يَسْكُتُوْنَ مُفْحَمِيْنَ_ كُلُّهُمْ إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ.

হাদীসটির উদ্দেশ্য কী? এর ব্যাখ্যা কী? এ থেকে কী কী হুকুম জানা যায়? তখন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ব্যতীত সকলেই চুপ হয়ে থাকতেন।[৪৬৭]

❊ ❊ ❊

৪৬৭. মানাকিবুল ইমাম আহমদ, ইবনুল জাওযী : ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়াহাদীসুহুম, শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ রহ.-এর টীকা, পৃ. ৪৯

ছয়টি মন্তব্য

ইবনে আবদুল হাদী রহ. বলেছেন, শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন না

একটি হাদীস লক্ষ করুন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন-

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

যে জমি ভাগ করা হয়নি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শুফআ' করার অধিকার দিয়েছেন। যদি সীমানা নির্ধারিত (হয়ে জমি বণ্টন) হয়ে যায় এবং রাস্তা পৃথক হয়ে যায় তাহলে আর শুফআ করতে পারবে না।[৪৬৮]

অর্থাৎ যদি দুইজনের শরিকানা যমিন থাকে, আর একজন নিজের অংশ বিক্রি করতে চায় তাহলে অপর অংশীদারকে জানাতে হবে। সে যদি ক্রয় করতে রাজি হয়, অন্যত্র বিক্রয় করা যাবে না। অংশীদারকে না জানিয়ে কারও কাছে বিক্রয় করা হলে, অংশীদার তা জানার পর এই বেচা-কেনা বাতিল করে নিজে খরিদ করার অধিকার পাবে। তবে বিক্রয়ের আগেই যদি ভাগ বাঁটোয়ারা করে প্রত্যেক অংশীদারদের হিস্সা পৃথক করা হয় এবং উভয় হিস্সার পথও আলাদা হয়ে যায়, এরপর একজন তার অংশ বিক্রি করে তাহলে আর শুফআ করা যাবে না। একজনকে না জানিয়ে নিজের অংশ বিক্রয় করলে অপরজন সে বেচা-কেনা বাতিল করতে পারবে না।

জাবের রাযি. থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর যমিনে শুফআ করার অধিক হকদার, যদি উভয় যমিনের পথ এক হয়। তাই (যমিন

৪৬৮. সহীহ বুখারী, হাদীস ২২১৩, ২২১৪

বিক্রয় করার সময়) প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য অপেক্ষ করা হবে।[৪৬৯]

প্রথম হাদীস থেকে বুঝে আসে, শুফআ করতে হলে বিক্রিত জমিতে অংশদারিত্ব থাকতে হবে। আর এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, শরিকানা থাকার দরকার নেই, বরং বিক্রয়কৃত জমির পাশে জমি থাকলেই পার্শ্ববর্তী যমিনের মালিকের জন্য শুফআ করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

এভাবে উভয় হাদীসের মাঝে বাহ্যত বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম হাদীসটি প্রসিদ্ধ এবং সবার নিকট সহীহ। দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল মালিক ইবনে সুলায়মান। বাহ্যত এই হাদীসটি প্রথম হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই ইমামুল জারহি ওয়াততাদীল শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. বলেছেন, 'এটি আবদুল মালিকের ভুল বর্ণনা। তিনি যদি এরকম আরেকটি ভুল হাদীস বর্ণনা করেন তার সকল হাদীস বর্জন করা হবে।'

তো আবদুল মালিকের হাদীসটি বাহ্যত প্রথম হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে শু'বা রহ. আবদুল মালিকের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অথচ ফকীহগণ উভয় হাদীসের মাঝে চমৎকার রূপে সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। ইমাম ইবনে আবদুল হাদী হাম্বলী রহ. (৭০৫-৭৪৪ হিজরী)

হাদীস দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন,[৪৭০]

---

৪৬৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৫১৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৪২১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪৯৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪২৫৩।

৪৭০. قال: واعلم أنَّ حديث عبد الملك حديثٌ صحيحٌ، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإنَّ في حديث عبد الملك: إذا كان طريقهما واحدًا، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشُّفْعة إلا بشرط تصرف الطرق.

فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع- كالبئر أو السطح أو الطريق- فالجار أحقُّ بصقب جاره، لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شُفْعة، لحديث جابرٍ المشهور.

এরপর বলেছেন–

وَشُعْبَةُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحُذَّاقِ فِي الْفِقْهِ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ إِذَا ظَهَرَ تَعَارُضُهَا. وَإِنَّمَا كَانَ إِمَامًا فِي الْحِفْظِ.

অর্থাৎ শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না যে, তিনি বৈপরীত্যপূর্ণ হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় করতে পারবেন। তিনি তো ছিলেন কেবল হাফেযুল হাদীস ইমাম।[৪৭১]

দেখুন ইবনে আবদুল হাদী রহ. স্পষ্ট বলেছেন, শু'বা রহ. ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না। অথচ তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিস। পূর্বে উদ্ধৃতিসহ উল্লিখিত হয়েছে, হাদীস জগতের সম্রাট সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন–

شُعْبَةُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ.

শু'বা ইবনে হাজ্জাজ হলেন মুহাদ্দিসগণের সম্রাট।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন–

كَانَ شُعْبَةُ أُمَّةً وَحْدَهُ فِي هٰذَا الشَّأْنِ.

ইলমুল হাদীসে শু'বা একাই এক উম্মত।

তিনি আরও বলেছেন–

وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ شُعْبَةَ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيْثِ، وَلَا أَحْسَنُ حَدِيْثًا مِنْهُ.

ولم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث، ولا احسن حديثا منه.

হাদীসের জগতে শু'বা থেকে উত্তম কেউ ছিলেন না, বরং সে যুগে তাঁর মতো কোনো মুহাদ্দিস ছিলেন না।

৪৭১. তানকীহুত তাহকীক ৪/১৭৫; আলইমাম ইবনু মাজাহ ওয়াকিতাবুহুস সুনান, পৃ. ৩০৪

ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন–

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَرَّحَ وَعَدَّلَ. أَخَذَ عَنْهُ هَذَا الشَّأْنَ: يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانِ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَطَائِفَةٌ.

অর্থাৎ শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. হলেন (ইলমুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ শাখা) আলজারহ ওয়াততাদীল শাস্ত্রের জনক। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এবং মুহাদ্দিসগণের এক জামাত তাঁর থেকে ইলমুল জারহ ওয়াত তাদীলের বিদ্যা অর্জন করেছেন।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেছেন, আলী ইবনু মাদীনী রহ. ফকীহ ছিলেন না

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হলেন ইলালুল হাদীসশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। তাঁর সামান্য পরিচয়ের জন্য এখানে মনীষীদের কয়েকটি বাণী পেশ করা হচ্ছে :

ইমাম বুখারী রহ.-এর দাদা উস্তাযগণের তবকায় সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দু'জন মুহাদ্দিসের একজন হলেন ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. (১৩৫-১৯৮ হিজরী)। তিনি বলেন–

عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হাদীসে ননবী সম্পর্কে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান।[৪৭২]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন–

مَا اسْتَصغَرْتُ نَفْسِي عِنْدَ أَحَدٍ، إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ.

৪৭২.তারীখে বাগদাদ ১৩/৪২১; তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত, নববী ১/৩৫১; তাহযীবুল কামাল, মিয্যী ৭/১৩; আলকাশেফ, যাহাবী ৩/৪৫০-৪৫১ (৩৯৩৭); তাযকিরাতুল হুফ্ফায, যাহাবী ২/১৪; তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার ৭/৩৫১

কোনো মুহাদ্দিসের সামনে আমি নিজেকে ছোট ভাবিনি। হা, আলী ইবনুল মাদীনীর কাছে আমার নিজেকে ছোট মনে হয়েছে।[৪৭৩]

হাফেয আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ফারহাযানী ও আরও একাধিক হাফেযুল হাদীস মুহাদ্দিসের বক্তব্য হচ্ছে–

أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِعِلَلِ الحَدِيْثِ: عَلِيٌّ.

আলী ইবনুল মাদীনী ছিলেন ইলালুল হাদীসশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ আলেম।[৪৭৪]

আবু উবায়দ আজুর্‌রী রহ. বলেন, ইমাম আবু দাউদ রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো–

أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَعْلَمُ أَمْ عَلِيٌّ؟

আহমাদ ইববে হাম্বল রহ. বড় আলেম, না আলী ইবনুল মাদীনী রহ.?

উত্তরে আবু দাউদ রহ. বলেছেন–

عَلِيٌّ أَعْلَمُ بِاخْتِلَافِ الحَدِيْثِ مِنْ أَحْمَدَ.

হাদীসশাস্ত্রে আলী ইবনুল মাদীনী রহ. আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে বড় আলেম।[৪৭৫]

এই ইবনুল মাদীনী রহ. সম্পর্কে হিজরী ৮ম শতাব্দীর বিজ্ঞ ও সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন–

৪৭৩.আলকামেল, ইবনে আদী ১/২১৩; তারীখে বাগদাদ ১৩/৪২১; আততাদীল ওয়াততাজরীহ, আবুল ওয়ালিদ বাজী ৩/১০৮৯; তবাকাতুল হানাবিলা, ইবনে আবু ইয়ালা ১/২২৮; সিয়ারু আলমিন নুবালা ১১/৪৬; মীযানুল ইতিদাল ৩/১৩৯

৪৭৪.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৯

৪৭৫.সুআলাতুল আজর্‌রী লিআবী দাউদ, ২/৩০৬ (১৯৩৯); তারীখে বাগদাদ ১৩/৪২১; আলকাশেফ, যাহাবী ৩/৪৫০-৪৫১ (৩৯৩৭); সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/৪৮; তবাকাতুশ শাফিইয়্যা, সুবকী ২/১৪৭

لَمْ يَكُنْ ابنُ المَدِينِيِّ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، وَإِنَّمَا كَانَ بَارِعًا فِي العِلَلِ وَالأَسَانِيدِ.

অর্থাৎ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ফকীহ ছিলেন না। তিনি তো ছিলেন কেবল ইলালুল হাদীসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ।[৪৭৬]

দেখুন, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হাফিযুল হাদীস ও ইলালুল হাদীসের দক্ষ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদ হিসাবে গণ্য হননি।

এরপরও যারা বলে, 'বর্তমানে হাদীস জানা সহজ, আর শুধু এ কারণেই মুজতাহিদ হওয়া সহজ' তাদের এই সমঝ ও জ্ঞানের উপর করুণা করা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে!

মাসআলা বলা আমাদের সাধ্যে নেই : ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.

আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হামীদ কূফী রহ. বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছে। তখন তিনি বলেছেন–

لَيْسَ هٰذَا مِنْ بَابَتِنَا، هٰذَا بَابَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

মাসআলা বলা আমাদের পরিধিতে পড়ে না। তা হলো আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর কাজ।[৪৭৭]

ঈসা ইবনে আবু বকর রহ. বলেছেন, খতীব বাগদাদী রহ. ফকীহ ছিলেন না

হাদীস ও তারীখের জগতে অতি পরিচিত একটি নাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী রহ.। 'তারীখে বাগদাদ' কিতাব তাঁকে আলেম ও সাধারণ সবার কাছে প্রসিদ্ধি দান করেছে। ইলমের ময়দানে খতীব বাগদাদীর মাকাম বোঝার জন্য দুটি

---

৪৭৬. ফতহুল বারী, ইবনে রজব ৭/১১৬ (باب من ركع دون الصف)

৪৭৭. ইবনুল জাওযীর 'মানাকিবুল ইমাম আহমদ' কিতাবের বরাতে শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আররাফউ ওয়াততাকমীল, টীকা, পৃ. ৩২৩।

মন্তব্য পেশ করছি। ইমাম আবু বকর ইবনে নুকতা হাম্বলী রহ. (৫৭৯-৬২৯ হিজরী) বলেন–

كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِيْنَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ.

যে কেউ ইনসাফ করবে সেই জানতে পারবে, খতীব বাগদাদীর পরের সকল মুহাদ্দিস তাঁর কিতাবসমূহের উপর নির্ভরশীল।[৪৭৮]

শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. বলেন–

صَارَ أَحْفَظَ أَهْلِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

অর্থাৎ তিনি ছিলেন স্বযুগে সারা দুনিয়ার সবচে' বড় হাফিযুল হাদীস।[৪৭৯]

এই খতীব বাগদাদী রহ. সম্পর্কে ফিকহের ইমাম ঈসা ইবনে আবু বকর সুলতান শারাফুদ্দীন আইয়ুবী রহ. বলেন–

وَالْخَطِيْبُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَا عَرَفَ الْفِقْهَ.

খতীব বাগদাদী রহ. ফকীহ ছিলেন না। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল না।[৪৮০]

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ফকীহ ছিলেন না

প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সুনানে নাসায়ীর লেখক ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন–

كَانَ هٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقَ جَمَعَا الحَدِيثَ وَالْفِقْهَ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيُّ يَعْرِفَانِ الحَدِيْثَ دُوْنَ الْفِقْهِ.

চারজন ইমামুল হাদীস ছিলেন একই যমানায়। (আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও আলী ইবনে মাদীনী রহ.।) তাঁদের

৪৭৮.আততাকঈদ লিমারিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়ালমাদানীদ ১/১৫৪; নুযহাতুন নাযার, পৃ. ৩।

৪৭৯.সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/২৭১।

৪৮০.আসসাহমুল মুছীব ফিররাদ্দি আলাল খাতীব, পৃ. ৮৯।

মধ্যে ইমাম আহমদ রহ. ও ইসহাক রহ. ছিলেন হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী। আর ইবনে মাঈন রহ. ও ইবনুল মাদীনী রহ. হাদীসের তো ইমাম ছিলেন, কিন্তু ফিকহের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না।[৪৮১]

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ইলালুল হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. যুগশ্রেষ্ঠ হাফেযুল হাদীস। নাসায়ী রহ. দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন, এঁরা দু'জন ফকীহ ছিলেন না। ইজতিহাদ করে বিধান আহরণ করতে পারতেন না।

এবার চিন্তা করুন, যারা বলে, 'কম্পিউটারের কল্যাণে হাদীস জানা সহজ হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে মুজতাহিদ হওয়া সহজ।' তাদের এ দাবি কত উদ্ভট ও আজগুবি! ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন না করার কারণে নিজের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীসটির বিধান তাঁরা বলতে পারলেন না! অথচ এ যুগের সালাফী আলেমদের দাবি হলো, কম্পিউটারের এত জ্ঞান যে, সে তার মধ্যে লুকায়িত হাদীসসমূহের বিধান বলে দিলে দিতে পারবে!

ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, আবদুর রায্যাক রহ. ফকীহ ছিলেন না; বরং মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ফকীহের সংখ্যা খুবই কম

ইমাম আবদুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম রহ. ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ., আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. প্রমুখ বড় বড় হাদীসবিশারদ ইমামের উস্তায। হাদীসশাস্ত্রে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আলমুসান্নাফ' নামে হাদীসগ্রন্থটির শুরুর কিছু অংশ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও কিতাবটির ছাপা কপি বিশাল বিশাল কলেবরে ১১ খণ্ড এবং হাদীস ও আছারের সংখ্যা ২১০২৩।

এই মহান ইমাম সম্পর্কে তাঁর শিষ্য আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মন্তব্য শুনুন। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ মুস্তামলী রহ. বলেন–

---

৪৮১. ইকমালু তাহযীবিল কামাল, মুগলাতাই ১২/৩৬৭।

سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: كَانَ لَهُ فِقْهٌ؟

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুর রায্যাক রহ. -এর কি ফিক্হ তথা ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল?

আহমদ রহ. বলেছেন–

مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

মুহাদ্দিসগণের মাঝে ফিক্হ খুব কমই পাওয়া যায়।[৪৮২]

ইমাম আহমদ রহ.-এর এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় জানা যায়।

এক. আবদুর রায্যাক রহ.-এর মতো বরেণ্য ইমাম ফকীহ ছিলেন না।

দুই. ফিকহের যোগ্যতা অর্জন করা অনেক কঠিন। তাই বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মধ্যেও ফিকহ ও ইজতিহাদের যোগ্যতা তেমন পাওয়া যায় না।

* * *

৪৮২.তবাকাতুল হানাবিলা, ইবনে আবী ইয়ালা ১/৩২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কম্পিউটার যখন মুজতাহিদ

কম্পিউটার কি কাউকে মুজতাহিদ বানাতে পারে?

যাদের কুরআন-সন্নাহর সঠিক সমঝ অর্জন করার সুযোগ হয়নি এবং সালাফের ইলম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা লাভ করার ফুরসত হয়নি, তাদের কেউ কেউ বলে বেড়ায়, বর্তমানে মুজতাহিদ হওয়া তেমন কঠিন কিছু না। পূর্বের মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদ করার জন্য লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করা জরুরি ছিল, কিন্তু আমাদের জন্য এত হাদীস মুখস্থ করা জরুরি নয়। কেননা কম্পিউটারের কল্যাণে সহজেই যেকোনো বিষয়ের হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

এই কথা প্রশ্নকারীর জ্ঞানের দৈন্য ও স্থূলতার প্রমাণ এবং ইজতিহাদের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার দলীল। কেননা–

এক. এ ধরনের অপলাপের ভিত্তি হলো– এই ভুল ধারণা যে, কোনো হাদীস জানা থাকলেই এর সকল বিধান জানা হয়ে যায়। অথচ হাদীস জানা আর হাদীস থেকে বিধান আহরণ করা—এক বিষয় নয়। ভিন্ন দুটি শাস্ত্র, দুই ধরনের যোগ্যতা। এই মাত্র পড়ে এসেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন–

مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

মুহাদ্দিসগণের মাঝে ফিক্‌হ তথা ইজতিহাদের যোগ্যতা খুব কমই পাওয়া যায়।

হাদীস জানা থাকলেই যদি ইজতিহাদ সহজ হয়ে যেত তাহলে যাদের বক্ষ লক্ষাধিক হাদীসের ধারক, তারা সবাই মুজতাহিদ হয়ে যেতেন। অথচ আহমাদ রহ.-এর বক্তব্য হচ্ছে, 'মুহাদ্দিসগণের মাঝে ইজতিহাদের যোগ্যতা

খুব কমই পাওয়া যায়'। সুতরাং বোঝা গেল হাদীস জানা সহজ হলেই মুজতাহিদ বনা সহজ হয়ে যায় না।

আগে আরও উদ্ধৃত হয়েছে, ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসের সামনে কোনো হাদীস পেশ করে যখন বলা হয়–

مَا مُرَادُهُ؟ مَا تَفْسِيْرُهُ؟ مَا فِقْهُهُ؟ فَيَبْقَوْنَ ـأَيْ يَسْكُتُوْنَ مُفْحَمِيْنَـ كُلُّهُمْ إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ.

হাদীসটির উদ্দেশ্য কী? এর ব্যাখ্যা কী? এবং এ থেকে কী কী হুকুম জানা যায়? তখন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ছাড়া সকলেই চুপ হয়ে থাকতেন।

হাদীস জানার পথ সহজ হলেই যদি ইজতিহাদ করা, হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করা সহজ হয়ে যেত, তাহলে মুহাদ্দিসগণের সামনে হাদীস পেশ করলে অবশ্যই তারা এ থেকে যাবতীয় হুকুম-আহকাম ইস্তেম্বাত করতে পারতেন। অথচ ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তায ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ.-এর পরিষ্কার বক্তব্য, মুহাদ্দিসীনে কেরামের সামনে হাদীস পেশ করা হলে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ব্যতীত অন্যরা হাদীসটির মাসআলা-মাসায়েল বের করতে পারতেন না।

পূর্বে ইমাম নাসায়ী রহ.-এর এই বক্তব্যও উল্লিখিত হয়েছে–

يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ يَعْرِفَانِ الحَدِيْثَ دُوْنَ الْفِقْهِ.

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হাদীসের তো ইমাম ছিলেন, কিন্তু ফিকহের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না।[৪৮৩]

তদ্রূপ, শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ. ও খতীব বাগদাদী রহ. সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য পড়ে এসেছেন যে, তাঁরা ফিকহের ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন না।

৪৮৩.ইকমালু তাহযীবিল কামাল, মুগলতাই ১২/৩৬৭

ওই ভাইদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা

যারা বলেন, কম্পিউটারের বদৌলতে হাদীস জানা সহজ হয়ে গেছে, তাই মুজতাহিদ হওয়া সহজ, তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা– এই সব ইমামের প্রত্যেকেরই লক্ষাধিক হাদীস ও আছার মুখস্থ ছিল। কম্পিউটার থেকে অনেক বেশি হাদীস তাদের বক্ষে সংরক্ষিত ছিল। শুধু হাদীস জানা থাকলেই যদি মুজতাহিদ হওয়া যেত, তাহলে তাঁরা মুজতাহিদ হতে পারলেন না কেন?

এসব ইমামের এটুকুন আকল-জ্ঞানও ছিল যা এই জড়পদার্থটার আছে? তবে কি এই জড়পদার্থটার এত জ্ঞান-বুদ্ধি যে, সে শুধু নিজেই মুজতাহিদ নয়; বরং সালাফী আলেমদেরও মুজতাহিদ বানিয়ে দেয়?

একটি মাত্র হাদীস থেকে কয়েক শ' শিক্ষা

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য একটি হাদীস লক্ষ করুন। আনাস রাযি. বর্ণনা করেন–

أَنَّ ابْنًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ صَغِيْرًا كَانَ، يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ ضَاحَكَهُ، فَرَآهُ حَزِينًا، فَقَالَ: مَا بَالُ أَبِيْ عُمَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَاتَ نُغَيْرُهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَقُوْلُ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ نُغَيْرٌ.

উম্মে সুলাইম রাযি.-এর ছোট একটি ছেলে ছিল। আবু উমায়র বলে ডাকা হতো। তার একটা 'নুগায়র' (ছোট পাখি) ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলে তার সাথে হাসা-হাসি করতেন। একদা নবীজী তাকে চিন্তিত দেখে বললেন, 'আবু উমায়রের কী হলো?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তার নুগায়রটা মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রসিকতা করে) বারবার বলতে রইলেন, 'হে আবু উমায়র! কেমন আছে তোমার নুগায়র?'[৪৮৪]

৪৮৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩০৭৭, ১২১৩৭; মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ১৪১৪

এই হাদীস থেকে আইম্মায়ে কেরাম প্রচুর শিক্ষা (ফায়দা) গ্রহণ করেছেন। আবদুল হাই কাত্তানী রহ. বলেন–

وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَزَادَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَلٰى مِائَةٍ، وَأَفْرَدَهَا فِيْ جُزْءٍ.

উলামায়ে কেরাম হাদীসটি থেকে অনেক হুকুম-আহকাম আহরণ করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের আলেম আবুল আব্বাস ইবনুল কাছ রহ. একশ'র বেশি হুকুম ইসতেম্বাত করেছেন এবং এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন।[৪৮৫]

আবু আবদুল্লাহ ইবনুল গাযী মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ রহ. (৯১৯ হিজরী) বলেন–

أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اِسْتَنْبَطَ مِنْهَا زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةِ فَائِدَةٍ.

কোনো কোনো আলেম এই হাদীস থেকে প্রায় তিনশ ফায়দা (শিক্ষা) আহরণ করেছেন।[৪৮৬]

আবুল হাসান আলী আলমিকনাসী রহ. বলেন, তাঁর কাছে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ছাব্বাগ মিকনাসী রহ. সম্পর্কে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে–

أَنَّهُ أَمْلٰى فِيْ مَجْلِسِ دَرْسِهِ بِمِكْنَاسَةَ عَلٰى حَدِيْثِ أَبِيْ عُمَيْرٍ «مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» أَرْبَعَمِائَةِ فَائِدَةٍ.

তিনি 'মিকনাসা'য় দরস দেওয়ার সময় এই হাদীস থেকে চার শ ফায়দা লিখিয়েছেন।[৪৮৭]

বলার অপেক্ষা রাখে না, চারশ ফায়দার সবগুলো হুকুম-আহকাম নয়। এতে অনেক আদব, শিষ্টাচার, চলাফেরা ও কথাবার্তার নিয়মনীতিও রয়েছে। শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ ওয়া রাআহু বলেন–

৪৮৫.আততারাতিবুল ইদারিয়া ২/১৫০

৪৮৬.প্রাগুক্ত

৪৮৭.নায়লুল ইবতিহাজ বিতাতরীজিদ দীবাজ, পৃ. ৪১০ (৫৪১); আততারাতিবুল ইদারিয়া ২/১৫০; নাফহুত তীব ফী গুছনি আন্দালুসির্ রাতীব ৬/২১৫; শাজারাতুন নূরিয যাকিয়্যা ফী তবাকাতিল মালিকিয়্যা ১/৩১৮

قَدِ اسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» أَرْبَعَ مِئَةِ فَائِدَةٍ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ كَثِيْرًا مِنْهَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ وَأَكْثَرُ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالآدَابِ.

অর্থাৎ কোনো কোনো আলেম ইসতেম্বাত করে এ হাদীস থেকে চারশ শিক্ষা বের করেছেন। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, এর থেকে অনেকগুলো শিক্ষা বিধি-বিধান সংক্রান্ত আর অধিকাংশ হলো আদব ও শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত।[৪৮৮]

এভাবে আইম্মায়ে কেরাম দেমাগ খাটিয়ে গবেষণা করে এক একটি হাদীস থেকে অনেক আদব ও বিধি-বিধান ইস্তেম্বাত করেছেন। আপনি কম্পিউটারের সামনে গেলে কম্পিউটার এ কথা হয়তো বলে দিতে পারবে, আপনার উদ্দিষ্ট হাদীসটি এই এই কিতাবে আছে। তবে, এটি একটি জড়পদার্থ। এ হাদীসে কী কী বিধান ও শিক্ষা আছে, কম্পিউটার কি তা বলতে পারবে? এ জড়পদার্থটার কি হাদীসের শিক্ষা ও বিধি-বিধান বোঝার মতো ন্যূনতম অনুভূতিটুকুও আছে?

দুই. উপরে চারটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। একটিতে এসেছে, আমাশ রহ.-এর সামনে আবু হানীফা রহ. একটি মাসআলা বললে আমাশ রহ.-এর দলীল উল্লেখ করতে বলেন। আবু হানীফা রহ. স্বয়ং আমাশ রহ. থেকে শোনা কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তখন আমাশ রহ. বললেন, এই হাদীসগুলো তো আমার জানা ছিল, কিন্তু এ সবের মধ্যে যে এই বিধান আছে তা তো আমি জানতাম না।

দ্বিতীয় ঘটনায় বলা হয়েছে, আবু ইউসুফ রহ. আমাশ রহ.-কে একটি মাসআলা বললে আমাশ রহ. তাকে বলেন, মাসআলাটির দলীল বল। তখন আবু ইউসুফ রহ. আমাশ থেকেই শেখা একটি হাদীস পেশ করেন। তখন আমাশ রহ. বলেন, তুমি বলার আগে আমার জানা ছিল না যে, এই হাদীসে এ মাসআলা আছে।

৪৮৮.আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ১৬৯

তৃতীয় ঘটনার সারকথা হচ্ছে, এক মজলিসে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. কতিপয় মুহাদ্দিসের সহিত হাদীসের মুযাকারা করছিলেন। এমন সময় জনৈক মহিলা তাদেরকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। কেউই এর সমাধান পেশ করতে পারেননি। বরং সবাই নিশ্চুপ হয়ে আছেন। এ অবস্থায় আবু ছাওর রহ. তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন মহিলা তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি ঝটপট মাসআলা বলে দেন এবং এর স্বপক্ষে দুটি হাদীসও উল্লেখ করেন। এবার মুহাদ্দিসগণ সে হাদীসদুটির সনদ নিয়ে মুযাকারা শুরু করে দেন। মহিলা তখন বললো, এতক্ষণ এ হাদীস কোথায় ছিলো?

অর্থাৎ এ হাদীস তো আপনাদের মুখস্থ ছিল। এর অনেক সনদ আপনারা জানতেন। কিন্তু আবু ছাওর বলার আগে হাদীসটি থেকে আপনারা আমাকে সমাধান দিতে পারলেন না কেন?

চতুর্থ ঘটনার সারকথা হলো– ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একসাথে হাদীসের মুযাকারা করতেন। অবশেষে ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহ. বলেতেন, এই হাদীস থেকে কী কী বিধান আহরিত হয়? তখন আহমদ রহ. ব্যতীত আর কোনো মুহাদ্দিস কথা বলতেন না।

এই যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ বক্ষে সংরক্ষিত হাদীস থেকে মাসআলা আহরণ করতে পারলেন না। আপন স্মৃতিতে ধারণকৃত হাদীসের ফিকহ ও বিধান উপলব্ধি করতে পারেননি। আর ওই বন্ধুদের দাবি, কম্পিউটার ইজতিহাদ করতে পারে! তাহলে তো বলতে হবে, আপনাদের জড়পদার্থটার মতো বোধ-বুদ্ধিও ওইসব ইমামগণের ছিল না!!

তিন. এই পুস্তিকায় নবীজীর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, হাদীসের অনেক বাহক হাদীস থেকে বিধি-বিধান আহরণ করতে পারবে না।

তো নবীজীর ভাষ্য অনুযায়ী হাদীসের ধারক-বাহক বোধসম্পন্ন অনেক মুহাদ্দিস হাদীস থেকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখবেন না। আর হাদীসের বিপরীত আপনাদের দাবি হচ্ছে, এই যন্ত্রটা শুধু নিজেই মুজতাহিদ নয়, বরং মুজতাহিদ তৈরি করে!

চার. এই হাদীসও পড়ে এসেছেন যে-

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা এভাবে ইলম উঠিয়ে নেবেন না যে, তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নেবেন; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন আর কোনো আলেম বাকি থাকবে না তখন মানুষ তাদের 'মুকতাদা' (অনুসরণীয়) বানাবে জাহেলদের। জাহেল লোকদের কাছে দ্বীনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে। তারা যোগ্য না হয়েও সে বিষয়ে সমাধান পেশ করবে। ফলে এরা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।[৪৮৯]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইলম সংরক্ষিত থাকে আলেমের সিনায়। যতদিন আলেম বিদ্যমান থাকবেন, ততদিন ইলম বিদ্যমান থাকবে। যেদিন কোনো আলেম জীবিত থাকবেন না, সেদিন ইলম অবশিষ্ট থাকবে না। ইলম বিদায় নেবে। তালাশ করে কোথাও ইলম পাওয়া যাবে না। এ হলো নবীজীর হাদীসের বক্তব্য। আর সালাফী আলেমগণ বলেন, ইলম হলো কাগজের পাতায়, কম্পিউটারের স্ক্রিনে! এসব হলো ইলমের ধারক, ইলমের খাযানা! এগুলো থাকবে তো ইলম থাকবে এবং মুজতাহিদ তৈরি হবে!

এটাই কি হাদীসের উপর আমল?

❊ ❊ ❊

৪৮৯.সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

সালাফী আলেমদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা

এক. সাধারণ মানুষ কি আপনাদের তাকলীদ করবে, না মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করবে?

সালাফী আলেমগণ আমাদেরকে দাওয়াত দেন আমরা যেন শরীআতের বিধি-বিধান পালন করার জন্য ফকীহের ব্যাখ্যার শরণাপন্ন না হই; বরং সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম আহরণ করে সে মোতাবেক আমল করি।

তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো– ইজতিহাদের দরজা যদিও বন্ধ না, তবে ইজতিহাদ করে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম আহরণ করার মতো যোগ্য ফকীহ আমরা হতে পারিনি। বরং উপরে একাধিক হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, অনেক মুহাদ্দিসও ফকীহ হবেন না। সুতরাং সর্বযুগেই ফকীহের তুলনায় সাধারণ মানুষের পরিমাণ হবে অনেক বেশি।

আর যারা ফকীহ নয় তাদের তো তাকলীদ করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্যই তারা কারও কারও তাকলীদ করতে হবে। কারও না কারও শিক্ষা ও নির্দেশনা মোতাবেক আমল করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের জন্য তারা কার তাকলীদ করবে? দাবিদার মুজতাহিদের, না যোগ্য মজতাহিদের?

অর্থাৎ যারা ফকীহ নয় তাদের জন্য দুইটা পথ :

এক. এ যুগের মুজতাহিদের শিক্ষা ও ব্যাখ্যার তাকলীদ করা।

দুই. উম্মাহর ইমামগণের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা মোতাবেক আমল করা।

গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের কথা হলো– উম্মাহর ইমামগণের নির্দেশনা অনুসারে আমল করা শিরক, নাজায়েয। এখন আমাদের সামনে পথ একটাই। তা হলো– আপনাদের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা। অর্থাৎ যোগ্য মুজতাহিদের তাকলীদ থেকে সরে এসে দাবিদার মুজতাহিদের তাকলীদ করা।

আপনারা কি আমাদেরকে উম্মাহর স্বীকৃত ইমামগণের ফিকহ ও ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরিয়ে এ যুগের দাবিদার মুজতাহিদদের অনুসারী বানাতে চাচ্ছেন?

আপনাদের নির্দেশনার অনুসরণ করলে শির্ক না হলে, উম্মাহর ইমামগণের নির্দেশনা অনুসারে আমল করলে শিরক হবে কেন?

দুই. যেসব সাধারণ মানুষ সালাফী আলেমগণের মাযহাব মানে, তাদের সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া কী?

সালাফী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু লোক এমন আছেন, যারা নিজেদেরকে মুজতাহিদ দাবি করেন, শরীআত মানার ক্ষেত্রে তাদের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেন, তাদের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ না করে মুজতাহিদ ইমামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন-হাদীস অনুসরণ করার নিন্দা করেন। উপরে 'মুজতাহিদজের পরিচয়' শিরনামের আলোচনাটি পড়ে থাকলে, বাস্তবে তারা মুজতাহিদ কি না, আশা করি আপনি নিজেই এ বিষয়ে ফায়সালা করতে পারবেন।

যাই হোক, গাইরে মুকাল্লিদ ফিরকার কিছু লোক হলেন মুজতাহিদ হওয়ার দাবিদার। বাকি অন্যূন নিরানব্বই ভাগ হলো সাধারণ মানুষ। ইজতিহাদ করতে পারে না।

প্রশ্ন হলো– এসব সাধারণ গাইরে মুকাল্লিদ, যারা মুজতাহিদ না, তারা আমল করবে কীভাবে?

বলাবাহুল্য, তারা দাবিদার মুজতাহিদদের বাতানো পদ্ধতিতে আমল করবে। এছাড়া তো তাদের জন্য আমল করার আর কোনো সুরত নেই। কাজেই গাইরে মুকাল্লিদের মধ্যে ন্যূনতম নিরানব্বই ভাগ মানুষ দাবিদার মুজতাহিদের নির্দেশনা অনুসারে আমল করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বেশি হলে শতকরা একজন হলেন মুজতাহিদ (?), আর বাকি সবাই হলো তাদের মুকাল্লিদ।

ঐ বন্ধুদের কাছে জানতে চাই, আপনারা সালাফের ইমামগণের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা অনুযায়ী আমল করলে হরেক রকমের ফতোয়া জারি করেন। যারা আপনাদের শিক্ষা ও মাযহাব অনুসরণ করে, তাদের ব্যাপারে আপনাদের ফতোয়া কী?

বলতে পারেন, আমরা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করি। আমাদের সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করে। তারা আমাদের তাকলীদ করে না।

এমন বললে, আপনাদের কাছে আমরা জানতে চাইব, উম্মাহর ইমামগণ কি কুরআন ও হাদীসের তাফসীর করেননি? ইমামগণ কি শরীআতের বাইরে নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী মানুষকে দ্বীনের কথা বলতেন? নাকি আপনারা বলতে চান, তাঁরা ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে গেছেন আর আপনারা সহীহ্ ও নীতিভিত্তিক ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে পারেন, তারা তো মাসআলার সাথে দলীলের উল্লেখ করতেন না। আমরা দলীল উল্লেখপূর্বক মাসআলা বলি।

এমন উত্তর দিলে বলব, এটা একটা ধোঁকা বৈ কিছু নয়। যারা দলীল বুঝে না তাদের সামনে দলীল উল্লেখ করা ও না করা—উভয়ই সমান। আপনারা যদি দলীলের ভুল তরজমা করেন, দলীলের ভুল ব্যাখ্যা করেন, যঈফ হাদীস দিয়ে দলীল দেন, যে দলীলের সাথে মাসআলার কোনো সম্পর্ক নেই এমন দলীল দিয়ে মাসআলা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেন বা দলীলের মাঝে কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেন, তাহলে সাধারণ গাইরে মুকাল্লিদ কি তা বুঝবে?

আপনারা তো এরকম আরও অনেক জালেয়াতি করেন। তারা কি তা ধরতে পেরেছে? মাওলানা আবদুল মতিন ছাহেব দা.বা. আপনাদের জালিয়াতির বহু দিক উন্মোচন করেছেন 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' বইয়ে।

তাছাড়া, স্বীকৃত বিষয় যে, আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করলেই এর থেকে মাসআলা বের হয়ে যায় না। বিধান আহরণের জন্য রয়েছে 'উছূলুল ফিকহ' নামে বিশাল এক শাস্ত্র। তা তো সাধারণ মানুষের জানা নেই। মাসআলা ইস্তিম্বাত করার জন্য যে উসূল ও নিয়মকানুন আছে, তারা এর কিছুই বুঝে না।

পূর্বে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ আপন স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীস থেকে বিধান আহরণ করতে পারেননি। কারণ দলীল

থেকে হুকুম বের করার জন্য যে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন, তাঁরা তা হাছিল করেননি। সুতরাং সাধারণ মানুষ, যারা আরবী ভাষাটাও বুঝে না, তাদের সামনে দলীল উল্লেখ করার মানে হলো প্রতারণার ফাঁদ পাতা।

চার মাযহাবের কোন্ মাযহাব আছে, যার মাসআলাগুলোর দলীল-প্রমাণ মাযহাবের সমৃদ্ধ ও বিশাল আকারের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান নেই? সকল মাযহাবের সব মাসআলার দলীল মাযহাবের বড় বড় কিতাবে সবিস্তারে উল্লেখ আছে। সাধারণ মানুষ সেগুলো কিছুই বুঝবে না। দলীল উল্লেখ করা বরং তাদের জন্য পেরেশানির কারণ। তাই দলীলের আলোচনা না করে শুধু মাসআলাগুলো বলা হয়।

মোটকথা, স্বীকৃত ও যোগ্য ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। সাধারণ মানুষ সে অনুযায়ী আমল করে। আপনাদের দাবি হলো, আপনারাও কুরআন ও হাদীসের তাফসীর করেন। আর সাধারণ গাইরে মুকাল্লিদ সম্প্রদায় সে অনুসারে আমল করে। আর কারও ব্যাখ্যা ও তাফসীর অনুযায়ী আমল করার নামই তো তাকলীদ।

তো যোগ্য ও স্বীকৃত মুজতাহিদের তাকলীদ করা শিরক হলে আপনাদের মতো দাবিদার মুজতাহিদদের মাযহাব মানা শিরক হবে না কেন?

কিন্তু আপনারা যখন দেখলেন সরাসরি আপনাদের তাকলীদের কথা বললে কেউ মানবে না, তখন 'হাদীসের উপর আমল কর' এই ধরনের নামে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন এবং যোগ্য ইমামদের থেকে সরিয়ে প্রতারকদের অনুসারী বানাচ্ছেন। (আল্লাহই আমাদের হেফাযতকারী।)

তিন. সালাফী আলেমগণ তাকলীদ করেন কেন?

সালাফীদের মধ্যে যারা মুজতাহিদ দাবি করেন, তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ করেন। তারা যেসব ক্ষেত্রে তাকলীদ করেন এর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. তাদেরকে যখন কোনো হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, এই হাদীস যে সহীহ, এর দলীল কী?

তখন তারা হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বা রাসূলের কোনো বক্তব্য পেশ করেন না, বরং কোনো আলেমের বরাত দেন। যেমন বলেন, আলবানী ছাহেব বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। আর আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্য কোনো আলেমের কথা গ্রহণ করার নামই তো তাকলীদ।

২. তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, ওই হাদীসটি যে যয়ীফ, এর দলীল কী?

তখনও তারা কোনো হাদীস পেশ না করে কোনো আলেমের নাম উল্লেখ করে বলেন, অমুক বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ। তাই এই হাদীস যয়ীফ। আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত অন্য কারও কথা মেনে নেওয়াই তো তাকলীদ।

৩. এমনিভাবে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, হাদীসটির অমুক রাবী (বর্ণনাকারী) যে ছিকাহ (বিশ্বস্ত) বা যয়ীফ (দুর্বল), এর প্রমাণ কী?

এখানেও তারা কোনো হাদীস পেশ করতে পারেন না, বরং কোনো ইমামের নাম নেন, অমুক ইমাম এ রাবীকে ছিকাহ বা যয়ীফ বলেছেন। এটাও তো ওই ইমামের তাকলীদ।

৪. অনেক বিষয়ে বাহ্যিক বৈপরীত্যপূর্ণ দুই বা ততোধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এ বিষয়ে দুই ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। এর সমাধান হবে কীভাবে?

তারা তখন কোনো হাদীস পেশ না করে কোনো ইমামের বক্তব্য দিয়ে সমন্বয় সাধন করেন। তো এখানেও ইমামের তাকলীদ করছেন।

৫. করণীয় ও বর্জনীয় কিছু বিধান আছে, যেগুলোকে কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে ফরয বা হারাম করা হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ বিধান এমন যেগুলো ফরয বা হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। এমনিভাবে করণীয় অনেক কাজ এমন আছে, যা ওয়াজিব, না সুন্নত, না মুবাহ—কুরআন হাদীসে

এসবের পরিষ্কার বিবরণ নেই। বর্জনীয় অনেক কাজ আছে, তা মাকরূহে তাহরীমী, না মাকরূহে তানযীহী, কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়নি।

তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয়, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধানটি সুন্নত বা মুবাহ না হয়ে ফরয হবে কেন? ওই হাদীসে আলোচিত বিষয়টি ফরয বা সুন্নত না হয়ে মুবাহ হবে কেন? সে হাদীসে বিবৃত মাসআলাটি মাকরূহ না হয়ে হারাম হবে কেন? অমুক হাদীসে বর্ণিত হুকুমটি হারাম না হয়ে মাকরূহ হবে কেন? এ ধরনের আরও প্রশ্নের জবাবে তারা কোনো হাদীস পেশ করতে পারেন না, বরং কোনো ইমামের মূলনীতি উল্লেখ করেন। এটাওতো ওই ইমামেরই তাকলীদ।

সারকথা, সালাফীদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসাবে প্রকাশ করেন, তারাও অধিকাংশ বিষয়ে কোনো না কোনো ইমামের তাকলীদ করেন।

চার. এ যুগের আহলে হাদীস কি সালাফের যুগেও ছিল?

সালাফীরা নিজেদের 'আহলে হাদীস' নামে প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন, সালাফের যুগ থেকেই 'আহলে হাদীস' চালু ছিল। এরপর কোথাও আহলে হাদীস শব্দ দেখলেই খুশি হয়ে যান এবং লাফ দিয়ে বলে ওঠেন, এই তো তিনি আহলে হাদীস ছিলেন। হাঁ, সালাফের যুগেও আহলে হাদীস ছিলেন, যারা গুণে-জ্ঞানে আহলে হাদীস ছিলেন। কিন্তু আহলে হাদীস ফিরকা ছিল না, সালাফী নামের আহলে হাদীস ছিলেন না। সে যুগের আহলে হাদীস আর গাইরে মুকাল্লিদ আহলে হাদীসের মধ্যে কোনো মিল নেই। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য এখানে তুলনামূলক কিছু দিক উল্লেখ করতে হচ্ছে :

১. সালাফের যুগে 'আহলে হাদীস' কোনো ফিরকা বা সম্প্রদায়ের নাম ছিল না; বরং এটা ছিল শাস্ত্রীয় অতি সম্মানিত একটি পরিভাষা। যাদের মধ্যে হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ গুণাবলির সমাহার ঘটত, কেবল তাদেরই

জন্য এই মহৎ উপাধি শোভা পেত। পিছনে 'আহলে হাদীসের পরিচয়' শিরোনামে সেসব মহৎ গুণাবলির কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আর বর্তমানের আহলে হাদীস হলো একটা ফিরকার নাম। এ দলে শামিল হতে হলে কোনো যোগ্যতার দরকার হয় না। আপনি বলবেন, আমি আজ থেকে উম্মাহর বরেণ্য কোনো ইমামের ব্যাখ্যা অনুসারে আমল করব না; বরং সালাফী আলেমের বাতানো তরিকায় আমল করব। ব্যস, আহলে হাদীস হয়ে যাবেন, যদিও হাদীস কাকে বলে? আহলে হাদীস কাকে বলে? তাও আপনি বলতে পারেন না।

২. এ যুগের আহলে হাদীসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাযহাব বর্জন করা। মাযহাব আর আহলে হাদীস একত্রিত হবে পারবে না।

সালাফের যুগে আহলে হাদীস ও মাযহাবের মাঝে কোনো বিরোধ ছিল না। তাই তো আমরা দেখেছি সালাফের যুগে যাঁরা আহলে হাদীস অভিধায় ভূষিত হতেন, তাঁরাও মাযহাবের অনুসরণ করতেন।

৩. সে যুগের আহলে হাদীস শাখাগত আমল নিয়ে সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করতেন না। আর এ যুগের আহলে হাদীসের প্রতীক ও বিশেষত্বই হচ্ছে, উম্মতের মাঝে ফেতনা-ফাসাদ ও কলহ-বিবেদ সৃষ্টি করা।

৪. সে যুগের আহলে হাদীস মাযহাব অনুসারে আমল করার কারণে ইমামদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন না। কারও ফিকহ অনুসারে আমল করা হয়, এ জন্য নিন্দাবাদ করতেন না। আর এ যুগের আহলে হাদীসের অন্যতম খেদমত (?) হলো, বিষোদগার করে সাধারণ মানুষের অন্তর থেকে আইম্মায়ে দ্বীন ও উলামায়ে ইসলামের ভক্তি ভালোবাসা উঠিয়ে দেওয়া।

৫. সে যুগের আহলে হাদীসের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁরা পরস্পর পর্যালোচনা করতেন। তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে পেরেশান করতেন না। আর এ যুগের আহলে হাদীসের নীতি হচ্ছে, তারা উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করেন।

সাধারণ মানুষের সাথে নিজের ইলম জাহের করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।

৬. সে যুগের আহলে হাদীসের সাথে ধোঁকা প্রতারণার ন্যূনতম সম্পর্ক ছিল না। আর এ যুগের আহলে হাদীসের ছলচাতুরী ও ধোঁকাবাজি ব্যতীত কথা চলে না। এতে তারা বেশ পারঙ্গম। মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব দা. বা.-এর 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' বইটি পড়ুন। তাঁদের জালিয়াতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়ে যাবেন।

দেখুন না, খোদ তাদের নামটাই কত বড় ছলনা! 'আহলে হাদীস' হলো হাদীসের জগতে উঁচুস্তরের মনীষীদের মর্যাদাসম্পন্ন খেতাব। আর তারা নিজেদের জন্য সে খেতাব ব্যবহার করছেন। অথচ নিশ্চিত যে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই হাদীস ও আহলে হাদীস কাকে বলে? তা-ই ভালো করে বুঝে না।

পাঁচ. ইংরেজ বেনিয়াদের উপনিবেশের পূর্বে কি আহলে হাদীস ফিরকার ইতিহাস পাওয়া যায়?

ইদানীংকালের আহলে হাদীসরা নিজেদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়েও কপটতার আশ্রয় নেন। তারা বলেন, সালাফের যুগ থেকেই আহলে হাদীসের মাযহাব চলে আসছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম আহলে হাদীস ছিলেন। কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে এও বলে দেন যে, সাহাবায়ে কেরামও আহলে হাদীস ছিলেন।

এরপর কী করেন? যেখানেই আহলে হাদীস শব্দ পান, সেখানেই নিজেদের মতলব সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় লেগে যান।

আচ্ছা, মুহাদ্দিসীনে কেরাম যদি বর্তমান ধারার আহলে হাদীস হয়েই থাকেন, তাহলে নিচের প্রশ্নগুলোর সমাধান দিন।

১. সারাবিশ্বে প্রসিদ্ধ মাযহাব আছে চারটি। সালাফের যুগ থেকে প্রত্যেক মাযহাবের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যাতে

মাযহাবের অনুসারীরা সে অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতে পারে। অথচ আহলে হাদীস মাযহাবের কোনো কিতাব পাওয়া যায় না।

হাঁ, ইংরেজদের উপনিবেশের পরে আহলে হাদীস ফিরকার বহু কিতাব প্রকাশ হয়েছে। বেনিয়াদের অভিশপ্ত কদমের পূর্বে বিশেষ ধারার আহলে হাদীসের কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। ইংরেজ বেনিয়াদের পূর্বে বর্তমান ধারার আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলে এ ধারায় কোনো কিতাব লিখিত হয়নি কেন? সালাফের যুগ থেকে যদি এই মাযহাব চালু থাকে, তাহলে সে মাযহাব অনুযায়ী রচিত এমন একটি কিতাব দেখান, যা ইংরেজদের উপনিবেশের আগে লেখা হয়েছে।

২. চারও মাযহাবের অনুসারী বড় বড় আলেমদের পরিচয় ও কীর্তি সম্পর্কে বিশাল ও বহু খণ্ডের অনেক কিতাব লিখিত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজ উপনিবেশের পূর্বের এমন কোনো কিতাব পাওয়া যায় না, যাতে সালাফী আহলে হাদীসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যারা মাযহাব অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকে নিন্দা করতেন এবং সাধারণ মানুষকে নিজে নিজে ইজতিহাদ করার নির্দেশ দিতেন।

সালাফের যুগ থেকে যদি আহলে হাদীস ফিরকার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, তাহলে সালাফের যুগের এমন একটি কিতাবের নাম বলুন, যা আধুনিক ধারার আহলে হাদীসের কীর্তি ও পরিচয় তুলে ধরেছে।

বাপ-দাদার 'ইত্তিবা' কি জায়েয?

সালাফী ভাইদের যখন এসব প্রশ্ন করা হয় এবং বলা হয়, আপনারাওতো তাকলীদ করেন এবং পূর্বপুরুষের অনুসরণ করেন, তখন তাদের কেউ কেউ 'ইত্তিবা' শব্দের আশ্রয় নিয়ে এসব যৌক্তিক প্রশ্নের অযৌক্তিক উত্তর দেওয়ার কোশেশ করেন। তারা বলেন, দলীল ছাড়া কারও কথা মেনে নেওয়ার নাম তাকলীদ আর দলীলসহ কারও কথা মানার নাম ইত্তিবা, তাকলীদ নয়। আমরা দলীল ছাড়া পূর্বপুরুষদের কোনো কথা মানি না। আমরা যার কথার দলীল পাওয়া যায় তার কথাই মানি।

সুতরাং আমরা তাকলীদ করি না, ইত্তিবা করি। পূর্বপুরুষের তাকলীদ করা হারাম, পূর্বপুরুষদের ইত্তিবা করা হারাম বা শিরক নয়।

তাদের খেদমতে আমাদের কয়েকটি আরয–

১. ইত্তিবা ও তাকলীদের এ পার্থক্য আপনারা নিজেদের পকেট থেকে সরবরাহ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ পার্থক্যের কোনো হদিস দেখাতে পারবেন না। দলীল ছাড়া; বরং দলীল পরিপন্থি অনুসরণের ক্ষেত্রে 'ইত্তিবা'র ব্যবহার হয়েছে খোদ কুরআন মাজীদে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

যখন ওদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন ওরা বলে, না, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েরই 'ইত্তিবা' (অনুসরণ) করব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। আচ্ছা! যখন তাদের বাপ-দাদা (দ্বীনের) কিছুমাত্র বুঝ-সমঝ রাখত না, আর তারা কোনো (ঐশী) হিদায়াতও লাভ করেনি, তখনও কি (তাদের ইত্তিবা করা উচিত)?[৪৯০]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্বপুরুষদের 'ইত্তিবা' করা হলো কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। এমনিভাবে সূরা লুকমানেও [আয়াত : ২১] পূর্বপুরুষদের 'ইত্তিবা' করার কারণে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের নিন্দা করেছেন। কাফেররা নবী ও রাসূলদের দলীল-প্রমাণের তোয়াক্কা না করে বাপ-দাদার আনুগত্য করত। সুতরাং উভয় আয়াতে 'ইত্তিবা' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে নবীগণের দলীলনির্ভর দাওয়াতের বিপরীত পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে।

---

৪৯০. সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭০

২. সবচেয়ে বড় কথা হলো, আইম্মায়ে মুজতাহিদের ইজতিহাদসমূহ দলীল ছাড়া নয়; বরং সবই দলীলসমৃদ্ধ। তাঁদের এমন কোনো মাসআলা নেই, যার পক্ষে শরীআতের কোনো দলীল নেই।

৩. আপনাদের মধ্যে মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করেন এমন দু'একজন ছাড়া বাকিদের দলীল বোঝার যোগ্যতা নেই। সুতরাং আপনাদের কথা যদি মেনে নেওয়া হয় যে, দলীলসহ ইমামের কথা মানার নাম ইত্তিবা, আর দলীলবিহীন কারও কথা মানার নাম তাকলীদ, তাহলে আপনাদের মধ্যে দু'চারজন মুজতাহিদ (?), যারা দলীলাদি বোঝার যোগ্যতা রাখেন, তারা ব্যতীত অন্য সবাইকে তো তাকলীদই করতে হবে। অন্যদের তো দলীল বোঝার কোনো যোগ্যতা নেই। সুতরাং গরিষ্ঠসংখ্যক সালাফী ইত্তিবা নয়, তাকলীদই করে।

ছয়. সালাফী আলেমদের কথা মানব, না আল্লাহর হুকুম মানব?

কুরআন মাজীদ প্রমাণ করে মাযহাবের ব্যাখ্যার আলোকে আমল করা জায়েয; বরং আবশ্যক, (দ্রষ্টব্য : পৃ. ৮৮-৯৯) আর সালাফী আলেমগণ বলেন, নাজায়েয। এখন আমরা কোনটা মানব? আপনাদের কথা না আল্লাহর নির্দেশনা?

সাত : আপনাদের আনুগত্য করব, না নবীজীর অনুসরণ করব?

হাদীস শরীফ থেকে প্রতিয়মান হয়, ঈমানের তাফসীর অনুসারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা জায়েয ও প্রশংসনীয় (দ্রষ্টব্য : ১০০-১১৭), আর আপনাদের মতে তা নাজায়েয ও নিন্দনীয়। এখন কোনটা সঠিক? আপনাদের কথা না নবীজীর হাদীস?

আট. এঁদের সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া কী?

আগে মাযহাবের ইতিহাস অধ্যায়ে বিস্তারিত গত হয়েছে যে, খায়রুল কুরূন থেকে মুসলিম উম্মাহ মুজতাহিদের নির্দেশনায় শরীআতের বিধান পালন করে আসছেন। যাদের মধ্যে যেমন আছে সাধারণ মানুষ, তেমনি

আছেন মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুজাদ্দিদ ও শরয়ী ইলমের সকল শাস্ত্রের ইমাম। এইভাবে শরীআতের আহ্কামের উপর আমল করা নাজায়েয হলে তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া কী?

নয়. সালাফের যুগের আহলে হাদীস ইমামগণ কি তাকলীদ করে শিরক করেছেন?

পেছনে মাযহাবের ইতিহাস অধ্যায়ে এও অতিবাহিত হয়েছে যে, শু'বা ইবনে হাজ্জাজ রহ., আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রহ., ওয়াকী ইবনে জার্রাহ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান রহ., আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী রহ.সহ বড় বড় মুহাদ্দিস, যাঁরা ছিলেন ওয়ারিসে নবী, সত্যিকারের আহলে হাদীস, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং হাদীস ও সুন্নাহর হেফাযতের জন্য জান কুরবান করেছেন, তারাও মুজতাহিদ ইমামের তাফসীর ও মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন। যুগ যুগের নায়েবে নবী উলামায়ে কেরামও কি সারা জীবন শিরক-বিদআতের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিলেন?

দশ. এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক?

মাযহাবের ইতিহাস আলোচনায় আরও পড়ে এসেছেন যে, খাইরুল কুরূন থেকে সর্ব যুগের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামও কারও না কারও তাকলীদ করেই শরীআতের বিধি-বিধান পালন করেছেন। ইবনুল কাইয়িম রহ. এও বলেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার থেকে অভিজ্ঞ আলেমের তাকলীদ করেছেন। তাদের আমল কি প্রমাণ করে না, মাযহাব অনুযায়ী আমল করা শুধু জায়েযই নয়; বরং আবশ্যক?

❊ ❊ ❊

ষষ্ঠ অধ্যায়

একটি পুস্তিকার খোলাসা

তুমি কুরআন-সুন্নাহর এমন গবেষণা করবে না, সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার সাথে যার সামঞ্জস্য নেই। অন্যথায় ইলমে নাফে (উপকারী ইলম) তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। কারণ ইলমে নাফে তো তা-ই, যা (আহলে ইলমের) বক্ষে সংরক্ষিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সালাফে ছালেহীন থেকে বর্ণিত।

–হাফেয ইবনে হাজার হাম্বলী রহ.

মাযহাব সম্পর্কে ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ.-এর পুস্তিকা

যারা চার মাযহাব বর্জন করে নিজে নিজে ইজতিহাদ করার দাবি করে অথবা স্বীকৃত চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো মাযহাব অনুসরণ করার কথা বলে, তাদের খণ্ডনে সহীহ বুখারীর প্রখ্যাত ভাষ্যকার, হাম্বলী মাযহাবের বরেণ্য মনীষী, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বিশেষ শিষ্য, হাদীস ও ফিক্‌হের উজ্জ্বল নক্ষত্র আবদুর রহমান ইবনে রজব হাম্বলী রহ. (৭৩৬-৭৯৫ হিজরী)

اَلرَّدُّ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

(যারা চার মাযহাবভিন্ন অন্য কোনো মাযহাব অনুসরণ করতে চায় তাদের খণ্ডন)

নামে একটি সারগর্ভ পুস্তিকা রচনা করেছেন। গুরুত্বের বিচারে পুরো পুস্তিকাই এখানে উল্লেখ করার দাবি রাখে। কিন্তু এতে আমাদের পুস্তিকার কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। তাই এই পুস্তিকাটি থেকে নির্বাচিত কিছু বক্তব্যের অনুবাদ এখানে পরিবেশন করা হলো।

ইমাম ইবনে রজব রহ. বলেন–

খায়রুল কুরূনে ইজতিহাদের অবস্থা[৪৯১]

أَمَّا الْأَحْكَامُ وَمَسَائِلُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَلَا رَيْبَ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، وَكَانَ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ كُلُّ مَنِ اشْتَهَرَ بِالْعِلْمِ وَالدِّيْنِ يُفْتِيْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ فِي هٰذِهِ الْمَسَائِلِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ مَنْ كَانَ يَشُذُّ مِنْهُمْ عَنِ الْجُمْهُوْرِ عَنْ إِنْكَارِ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ. ...

فَكَانَ ذٰلِكَ يُرِيْحُهُمْ عَنْ أَن يَّتَكَلَّمَ أَحَدُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ أَن يَّنْصِبَ نَفْسَهُ لِلْكَلَامِ، وَلَيْسَ هُوَ لِذٰلِكَ أَهْلٌ.

৪৯১. এই শিরোনামসহ সামনের সবগুলো শিরোনামই আমাদের পক্ষ থেকে সংযোজিত। –অনুবাদক

এতে কোনো সন্দেহ নেই, সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তী ইমামগণের মাঝে হালাল-হারাম সংক্রান্ত অনেক মাসআলায় এখতেলাফ হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগগুলোর অবস্থা এমন ছিলো যে, যারা (কুরআন-সুন্নাহর গভীর ও বিস্তৃত) ইলম ও ধার্মিকতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাদের প্রত্যেকই এসব মতবিরোধপূর্ণ বিধি-বিধানে যে মতটি হক মনে হতো সে অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। (অর্থাৎ তাকওয়া-তাহারত ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক আলেমই নিজ ইজতিহাদ অনুসারে মত প্রকাশ করতেন।)

তবে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের থেকে শুযূয ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করলে উলামায়ে কেরাম অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতেন। ...এ জন্য (বিস্তৃত ও গভীর) ইলম অর্জন না করে কেউ দ্বীনী বিষয়ে কথা বলতো না এবং যোগ্য না হয়ে কেউ নিজেকে মত প্রকাশকারী (মুজতাহিদ) দাবি করতো না। (অর্থাৎ সে যুগে ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন না করে কোনো আলেম দ্বীনী বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণা শুরু করে দিতেন না।)

এভাবে চলতে থাকলে দ্বীন আর দ্বীন থাকবে না

ثُمَّ قَلَّ الدِّيْنَ وَالْوَرَعُ، وَكَثُرَ مَنْ يَّتَكَلَّمُ فِي الدِّيْنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.

فَلَوِ اسْتَمَرَّ الْحَالُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، بِحَيْثُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُفْتِيْ بِمَا يَدَّعِيْ أَنَّهُ يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ، لَاخْتَلَّ بِهِ نِظَامُ الدِّيْنُ لَا مَحَالَةَ، وَلَصَارَ الْحَلَالُ حَرَامًا وَالْحَرَامُ حَلَالًا، وَلَقَالَ كُلُّ مَنْ شَاءَ مَا يَشَاءُ، وَلَصَارَ دِيْنُنَا بِسَبَبِ ذَلِكَ مِثْلَ دِيْنِ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا.

فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ ضَبَطَ الدِّيْنَ وَحَفِظَهُ، بِأَنْ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَئِمَّةً مُجْتَمَعًا عَلَى عِلْمِهِمْ، وَدِرَايَتِهِمْ، وَبُلُوْغِهِمُ الْغَايَةَ الْمَقْصُوْدَةَ فِي رُتْبَةِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ وَالْفَتْوَى، مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيْثِ. فَصَارَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يُعَوِّلُوْنَ فِي الْفَتَاوَى عَلَيْهِمْ، وَيَرْجِعُوْنَ فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ إِلَيْهِمْ.

এরপর তাকওয়া ও ধার্মিকতা হ্রাস পেয়েছে এবং দ্বীনের বিষয়ে এমন মুজতাহিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে, অথচ তারা (কুরআন-সুন্নাহর) যথাযথ জ্ঞান রাখে না। অধিক পরিমাণে এমন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা নিজেদেরকে মুজতাহিদ হিসাবে প্রকাশ করে, অথচ ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেনি।

ইসলামের প্রথম যুগের মতো এই শেষ যমানায়ও যদি প্রত্যেকে নিজের কাছে যা হক মনে হয় সে অনুযায়ী ফতোয়া দিতে আরম্ভ করে তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বীনের শৃঙ্খলায় ত্রুটি দেখা দিবে : হালাল হারামের ভেদাভেদ দূর হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের যা মন চায় তাই বলে বেড়াবে। তখন আমাদের ধর্মও ইহুদী ও খ্রিষ্টীয় ধর্মের ন্যায় (বিকৃত ধর্ম) হয়ে যাবে।

এ জন্য আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমত ও প্রজ্ঞায় দ্বীনের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফিক্হ ও হাদীসের ধারক-বাহকদের থেকে কতক ইমাম তৈরি করে দিয়েছেন, যাঁদের ব্যাপারে উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং ফতোয়া-প্রদানের যোগ্যতায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তাই সমস্ত মুসলমান ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের উপর নির্ভর করে এবং হুকুম-আহকাম জানার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হয়।

চার মাযহাব আল্লাহ তাআলার বিশেষ করুণা ও রহমত

وَأَقَامَ اللهُ مَنْ يَضْبِطُ مَذَاهِبَهُمْ، وَيُحَرِّرُ قَوَاعِدَهُمْ، حَتَّى ضُبِطَ مَذْهَبُ كُلِّ إِمَامٍ مِنْهُمْ، وَأُصُوْلُهُ، وَقَوَاعِدُهُ، وَفُصُوْلُهُ، حَتَّى تُرَدَّ إِلَى ذَلِكَ الْأَحْكَامِ، وَيُضْبَطَ الْكَلَامُ فِي مَسَائِلِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ لُطْفِ اللهِ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمِنْ جُمْلَةِ عَوَائِدِهِ الْحَسَنَةِ فِيْ حِفْظِ هَذَا الدِّيْنِ. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَى النَّاسُ الْعَجَبَ الْعُجَابَ، مِنْ كُلِّ أَحْمَقٍ مُتَكَلِّفٍ، مُعْجَبٍ بِرَأْيِهِ، جَرِيْئٍ عَلَى النَّاسِ، وَثَّابٍ. فَيَدَّعِيْ هَذَا أَنَّهُ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ، وَيَدَّعِيْ هَذَا أَنَّهُ هَادِي الْأُمَّةِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يَنْبَغِي الرُّجُوْعُ دُوْنَ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَالتَّعْوِيْلُ دُوْنَ الْخَلْقِ عَلَيْهِ.

وَلَكِنْ بِحَمْدِ اللهِ وَمِنَّتِهِ اِنْسَدَّ هَذَا الْبَابُ، اَلَّذِيْ خَطَرُهُ عَظِيْمٌ، وَأَمْرُهُ جَسِيْمٌ. وَتَحَسَّمَتْ هَذِهِ الْمَفَاسِدُ الْعَظِيْمَةُ. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَجَمِيْلِ عَوَائِدِهِ وَعَوَاطِفِهِ الْحَمِيْمَةِ...

সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা এমন মনীষীদের তৈরি করেছেন, যারা এসব ইমামের মাযহাব এবং মাযহাবের মূলনীতিসমূহ সংরক্ষণ ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এভাবেই প্রত্যেক মাযহাবের উছূল, কাওয়ায়েদ ও নীতিমালাসমূহ নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত আছে। ফলে হুকুম-আহকাম জানার জন্য এগুলোর দিকে নজর বুলালে সুচারুরূপে হালাল-হারামের সমাধান জানা যায়।

মাযহাবের অবয়বে দ্বীনের বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো-গোছানো থাকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আপন মুমিন বান্দাদের প্রতি বিশেষ মেহেরবানি এবং দ্বীনকে হেফাযত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম অনুগ্রহ। যদি মাযহাবের আদলে দ্বীনের হেফাযতের এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা না করা হতো তাহলে ওইসব আহাম্মক, কৃত্রিমতাকারী ও বড়ত্ব প্রদর্শনকারী, যারা নিজেদের মতামত নিয়ে তুষ্ট—তাদের থেকে মানুষ

অতি বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড দেখতে পেতো। তাদের একজন দাবি করতো, সে হলো ইমামকুল শিরমণি। অন্যজন দাবি করে বসতো, সেই এই উম্মতের রাহবার এবং এমন ব্যক্তিত্ব যে, সে ছাড়া অন্য কারও শরণাপন্ন হওয়া যাবে না এবং (আহকাম ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে) সে ব্যতীত অন্য কারও উপর আস্থা রাখা যাবে না।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার শোকর, তাঁর করুণা ও মেহেরবানিতে এসব ফেতনা-ফাসাদের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে, যার অশুভ পরিণতি ছিলো অতি মারাত্মক, অত্যন্ত ভয়াবহ। এটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া ও অনুকম্পা।

সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব মানা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই

وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ مِمَّنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ فَلَا يَسَعُهُ إِلَّا تَقْلِيْدُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ، وَالدُّخُوْلُ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ سَائِرُ الْأُمَّةِ.

অর্থাৎ যারা মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছেনি, তাদের জন্য এই ইমামগণের তাকলীদ করা এবং সমস্ত উম্মত যেভাবে তাঁদের অনুসরণ করছে, সেভাবে অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আহাম্মকের প্রশ্নের উত্তর

فَإِنْ قَالَ أَحْمَقٌ مُتَكَلِّفٌ: كَيْفَ يُحْصَرُ النَّاسُ فِي أَقْوَالِ عُلَمَاءِ مُتَعَيِّنِيْنَ؟ وَيُمْنَعُ مِنَ الْاِجْتِهَادِ، أَوْ مِنْ تَقْلِيْدِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ؟

কোনো লৌকিকতা প্রদর্শনকারী আহাম্মক যদি প্রশ্ন করে, সমস্ত মানুষকে কেন শুধু নির্দিষ্ট কয়েকজন (চার) ইমামের মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হবে? এবং কীভাবে ইজতিহাদ করতে অথবা (চার ইমামের বাইরে) অন্য ইমামের মাযহাব অনুসরণ করতে নিষেধ করা হবে?

قِيْلَ لَهُ: كَمَا جَمَعَ الصَّحَابَةُ النَّاسَ عَلَى حَرْفٍ مِنْ حُرُوْفِ الْقُرْآنِ، وَمَنَعُوا النَّاسَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِهِ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ، لِمَا رَأَوْا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، وَأَنَّ النَّاسَ إِذَا تُرِكُوْا يَقْرَؤُوْنَ عَلَى حُرُوْفٍ شَتَّى وَقَعُوْا فِي أَعْظَمِ الْمَهَالِكِ.

فَكَذَلِكَ مَسَائِلُ الْأَحْكَامِ وَفَتَاوَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَوْ لَمْ تُضْبَطِ النَّاسُ فِيْهَا بِأَقْوَالِ أَئِمَّةٍ مَعْدُوْدِيْنَ، لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ الدِّيْنِ، وَأَنْ يُعَدَّ كُلُّ أَحْمَقٍ مُتَكَلِّفٍ طَلَبَتْ الرِّئَاسَةَ نَفْسُهُ مِنْ زُمْرَةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ.

কেউ যদি এমন বলে, তাহলে এর জবাব হলো- (কুরআনুল কারীম সাত কেরাতে নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় সাত কেরাতের যেকোনো কেরাত অনুযায়ী পড়া বৈধ ছিলো। কিন্তু) সাহাবায়ে কেরাম যখন দেখলেন, মানুষকে নানা কেরাত অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দেওয়া হলে উম্মত গুরুতর ধ্বংসে পতিত হবে, তখন তাঁরা সমস্ত মুসলমানকে এক কেরাত অনুযায়ী তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এছাড়া অন্য কেরাত অনুসারে কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তদ্রূপ মাসআলা-মাসায়েল ও হালাল-হারামের বিষয়ে মুলিমদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইমামের মাযহাবে সীমাবদ্ধ না করা হলে দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং নেতৃত্ব সন্ধানী প্রত্যেক লৌকিকতাকারী আহাম্মক নিজেকে মুজতাহিদগণের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিবে। (যেমন বর্তমানে হচ্ছে।)

আরেকটি প্রশ্নের জবাব

যদি প্রশ্ন করা হয়, আবু হানীফা রহ., মালেক রহ., শাফেয়ী রহ. ও আহমাদ রহ. ছাড়া আরও অনেক ইমাম আছেন। তো এ চার ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না কেনো?

এর জবাব হলো–

قَدْ نَبَّهْنَا عَلَى عِلَّةِ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ أَنَّ مَذَاهِبَ غَيْرِ هَؤُلَاءِ لَمْ تَشْتَهِرْ وَلَمْ تَنْضَبِطْ، فَرُبَّمَا نُسِبَ إِلَيْهِمْ مَا لَمْ يَقُوْلُوْهُ، أَوْ فُهِمَ عَنْهُمْ مَا لَمْ يُرِيْدُوْهُ. وَلَيْسَ لِمَذَاهِبِهِمْ مَنْ يَذُبُّ عَنْهَا، وَيُنَبِّهُ عَلَى مَا يَقَعُ مِنَ الْخَلَلِ فِيْهَا، بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُوْرَةِ.

পূর্বে এর কারণের দিকে ইশারা করেছি। আর তা এই যে, চার ইমাম ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব প্রচলিত নয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত নয়। যে কারণে ওইসব ইমামের দিকে কখনো কখনো এমন মাসআলা সম্বন্ধ করা হয়েছে যা তাঁরা বলেননি, অথবা কখনো তাঁদের বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে তাঁদের মাযহাবের এমন বিজ্ঞ আলেমও বিদ্যমান নেই, যাঁরা এ মাযহাবের উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর সঠিক সমাধান পেশ করবেন এবং এতে যেসব ত্রুটি আছে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করবেন। (তাই এসব মাযহাব মোতাবেক আমল করা সম্ভব নয়।) এর বিপরীত প্রচলিত চার মাযহাবে এসব সমস্যা নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন

ইমাম আহমাদ রহ. ও অন্যান্য ইমামগণ নিজেরাই তো তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের থেকে অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়। তো যেখানে তাঁরাই তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে আমরা কেন তাঁদের তাকলীদ করতে যাবো?

এ প্রশ্নের জবাবে ইবনে রজব রহ. বলেন—

قِيْلَ: لَا رَيْبَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ، وَالْاِشْتِغَالِ بِهَا حِفْظًا وَكِتَابَةً، وَيَأْمُرُ بِالْاِشْتِغَالِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حِفْظًا وَفَهْمًا، وَكِتَابَةً وَدِرَاسَةً، وَكِتَابَةِ آثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ دُوْنَ كَلَامِ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَمَعْرِفَةِ صِحَّةِ ذَلِكَ مِنْ سَقَمِهِ، وَالْمَأْخُوْذِ مِنْهُ وَالْقَوْلِ الشَّاذِّ الْمَطْرُوْحِ مِنْهُ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَتَعَيَّنُ الْاِهْتِمَامُ بِهِ، وَالْاِشْتِغَالُ بِتَعَلُّمِهِ أَوَّلًا قَبْلَ غَيْرِهِ، فَمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ وَبَلَغَ النِّهَايَةَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فَقَدْ صَارَ قَرِيبًا مِنْ عِلْمِ أَحْمَدَ. فَهَذَا لَا حِجْرَ عَلَيْهِ وَلَايَتَوَجَّهُ الْكَلَامُ فِيْهِ.

إِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مَنْعِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذِهِ الْغَايَةَ، وَلَا ارْتَقَى إِلَى هَذِهِ النِّهَايَةِ، وَلَا فَهِمَ مِنْ هَذَا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِيْرَ، كَمَا هُوَ حَالُ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ، بَلْ هُوَ حَالُ أَكْثَرُ النَّاسِ مُنْذُ أَزْمَانٍ، مَعَ دَعْوَى كَثِيْرٍ مِنْهُمْ الوُصُوْلَ إِلَى الْغَايَاتِ، وَالْاِنْتِهَاءِ إِلَى النِّهَايَاتِ، وَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَرْتَقُوْا عَنْ دَرَجَةِ الْبِدَايَاتِ.

জবাব : এতে কোনো সন্দেহ নেই, ইমাম আহমাদ রহ. ফকীহগণের মতামতসমূহ লিখতে, মুখস্থ করতে ও এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বারণ করতেন। কুরআন-সুন্নাহর গবেষণা ও পঠন-পাঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকার এবং সাহাবা-তাবেয়ীনের আছার (কর্ম ও বাণী) লেখার তাকিদ করতেন। এগুলোর মধ্যে প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত এবং গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলির জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিতেন। সাহাবা-তাবেয়ীন ছাড়া অন্যদের কথা নিয়ে মশগুল হতে নিষেধ করতেন।

এসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বপ্রথম এসবের ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করা উচিত—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের ইলম অর্জন করবে এবং –ইমাম আহমাদ রহ. ইশারা অনুযায়ী– এই ইলমের শেষপ্রান্তে উপনীত হবে, সে তো ইলমের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ রহ.-এর প্রায় সমান হয়ে গেছে। সুতরাং তার জন্য ইজতিহাদ করা নিষেধ নয়। এমন যোগ্যতা অর্জন করে যিনি ইজতিহাদ করবেন, তিনি সমালোচনার পাত্র নন।

ইজতিহাদ করা নিষিদ্ধ তার জন্য, যে এ পর্যন্ত পৌঁছুয়নি এবং এমন উচ্চস্তরে সমাসীন হয়নি; বরং সামান্য পরিমাণ ইলম অর্জন করেছে। যেমন এ যুগের (হিজরী ৮ম শতকের) আলেমদের অবস্থা; বরং কয়েক যুগ ধরে অধিকাংশ আলেমের অবস্থা এমনই, যদিও অনেকেই সমস্ত ইলম অর্জন করার এবং ইলমের শেষপ্রান্তে উপনীত হওয়ার দাবি করছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশ প্রাথমিক স্তরই অতিক্রম করেনি।

(এ হলো ৮ম শতাব্দীর অবস্থা। এবার বর্তমানের- ১৫শত শতাব্দীর দাবিদার মুজতাহিদদের অবস্থা কেমন হবে তা আপনিই চিন্তা করুন।)

হে দাবিদার মুজতাহিদ! আপনি কি ইলমের প্রাথমিক স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন?

فَإِنْ قَبِلْتَ هٰذِهِ النَّصِيْحَةَ وَسَلَكْتَ الطَّرِيْقَةَ الصَّحِيْحَةَ، فَلْتَكُنْ هِمَّتُكَ حِفْظَ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ثُمَّ الْوُقُوْفَ عَلَى مَعَانِيْهَا بِمَا قَالَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا، ثُمَّ حِفْظَ كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفَتَاوِيْهِمْ وَكَلَامِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ، وَمَعْرِفَةَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَضَبْطِهِ بِحُرُوْفِهِ وَمَعَانِيْهِ، وَالْاِجْتِهَادِ عَلَى فَهْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ.

وَأَنْتَ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْغَايَةَ، فَلَا تَظُنَّ فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ بَلَغْتَ النِّهَايَةَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ طَالِبٌ مُتَعَلِّمٌ مِنَ الطَّلَبَةِ الْمُتَعَلِّمِيْنَ. وَلَوْ كُنْتَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ مَا عَرَفْتَ فِي زَمَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، مَا كُنْتَ حِيْنَئِذٍ مَعْدُوْدًا مِنْ جُمْلَةِ الطَّالِبِيْنَ.

তুমি যদি এ নছীহত কবুল কর এবং সঠিক পথের অনুসরণ কর তাহলে তোমার চেষ্টা যেন হয় কুরআন ও হাদীসের আরবী পাঠ মুখস্থ করা। এরপর সালাফে ছালেহীন ও উম্মাহর ইমামগণের ব্যাখ্যা অনুসারে কুরআন হাদীসের মর্ম অনুধাবন করা। তারপর সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুসলিম বিশ্বের ইমামগণের বক্তব্য ও ফতোয়া মুখস্থ করা। আর (হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হলে) তোমার উচিত, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বাণী ও ফতোয়া অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করা এবং তা বোঝার জন্য পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করা।

শোনো, এতটুকু ইলম অর্জন হয়ে গেলে তুমি ভেবো না, ইলমের সর্বোচ্চ আসনে তুমি পৌঁছে গিয়েছো; বরং এখনো তুমি একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থী। এই পরিমাণ ইলম নিয়ে তুমি যদি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর যমানায় হতে তাহলে তোমাকে তালেবে ইলম হিসাবেও গণ্য করা হতো না।[৪৯২]

---

৪৯২. আরবের বরেণ্য আলেম শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (হাফিযাহুল্লাহ ওয়া রাআহু) বলেন, হাফেয যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে (পৃ. ৬২৭-৬২৮) নবম তবকার হাফেযুল হাদীসগণের জীবনী আলোচনার শেষে বলেছেন–
'হে শায়েখ, তুমি নিজের প্রতি দয়া করো, ইনছাফকে আঁকড়ে ধরো। এসব ইমামের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ো না। তাঁদের দিকে সমালোচনা দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না। মনে করো না, তাঁরা আমাদের যমানার মুহাদ্দিসদের মতো। কখনো নয়, কিছুতেই সম্ভব নয়। এ যামানার (৬৭৩-৭৪৮হি.) বড় বড় মুহাদ্দিগণের মধ্যে একজনও নেই যিনি পারদর্শিতায় তাদের স্তরে পৌঁছে যাবে। =

কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা করার সঠিক পদ্ধতি

وَإِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ بِغَيْرِ مَا قَالَهُ السَّلَفُ _كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ إِمَامُكَ_، فَيَفُوْتَكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ. فَإِنَّ الْعِلْمَ النَّافِعَ إِنَّمَا هُوَ مَا ضُبِطَ فِي الصُّدُوْرِ، وَهُوَ عَنِ الرَّسُوْلِ أَوْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَأْثُوْرٌ.

এবং ইমাম আহমাদ রহ. যেমন ইশারা করেছেন, তুমি কুরআন-সুন্নাহর এমন গবেষণা করবে না, সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার সাথে যার সামঞ্জস্য নেই। অন্যথায় ইলমে নাফে (উপকারী ইলম) তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

= কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মুখে না বললেও প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় নিজের কর্ম ও অবস্থার দ্বারা তুমি প্রশ্ন করবে, ইমাম আহমাদ আবার কে? ইমাম ইবনুল মাদীনী আবার কে? আবু যুরআ ও আবু দাউদই-বা কোন জিনিস?

তুমি ধৈর্যের সাথে মুখ বন্ধ রাখো এবং বোঝেশুনে কথা বলো। জেনে রাখো, ইলম তো তা-ই, যা পূর্বসূরীদের থেকে এসেছে।

আর ফুকাহায়ে কেরাম! তো শোনো, হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের সাথে বর্তমানের মুহাদ্দিসের ব্যবধান যেমন, মুজতাহিদগণের সাথে তোমার ব্যবধান তেমন। তাদের সাথে আমার তোমার কোনো তুলনায় হতে পারে না। তবে জানা কথা, 'কেবল জ্ঞানীরাই জ্ঞানীদের জ্ঞানের কদর করেন।'

সামনে গিয়ে হাফেয আবু কবর ইসমাঈলী রহ.-এর জীবনীতে (পৃ. ৯৪৮) হাফেয যাহাবী রহ. বলেন, 'তিনি 'মুসনাদে উমর' নামে হাদীসের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটি আমি অধ্যয়ন করেছি। তা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। এই মহান ইমামের স্মৃতিশক্তি দেখে আমি হয়রান হয়ে গেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস করেছি, পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের নাগাল পাওয়া কিছুতেই সম্ভব না।'

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (হাফিযাহুল্লাহ ওয়া রাআহু) বলেন, এ হলো হাদীসশাস্ত্রের পারদর্শী ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর বক্তব্য, যিনি হিজরী ৮ম শতাব্দীর মানুষ, যে যুগটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো ইলমুল হাদীসের বড় বড় ইমাম দ্বারা, যার শুরুতে রয়েছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. আর শেষ দিকে আছেন ইলমের শান্ত ও নীরব সাগর ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ.। সুতরাং এর থেকে তুমি উপদেশ গ্রহণ করো। -আছারুল হাদীসিশ শরীফ, টীকা, পৃ. ৬৯-৭০ (-অনুবাদক)

কারণ ইলমে নাফে তো তা-ই, যা (আহলে ইলমের) বক্ষে সংরক্ষিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সালাফে ছালেহীন থেকে বর্ণিত।[৪৯৩]

هذا، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلى سَيِّدِنَا ومَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

* * *

৪৯৩.আর্‌রদ্দু আলা মানিত্‌তাবাআ গায়রাল মাযাহিবিল আরবাআ : মাজমূউ রাসাইলিল হাফেয ইবনে রজব ১/৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১-৪৭২ ও ৪৭৭-৪৭৮

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ISBN: 978-984-98982-7-6

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ইমেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com

পরিবেশক | মুসলিমুহ গ্রন্থ বিতান | মাকতাবা-১১, কওমী মার্কেট, ৩য় তলা
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০